নবপর্যায় ৫

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৩

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নবপর্যায় ৫

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা নবপর্যায় ৫ : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৩

সম্পাদক : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ○ সহকারী সম্পাদক : সুবিমল লাহিড়ী

সূচিপত্র

চিত্রসূচি :

মূল্য কুড়ি টাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অঙ্কিত

বিশ্বভারতী পত্রিকা
নবপর্যায় ৫ : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৩

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়) -কে লিখিত

১

১৮ নভেম্বর ১৯১৭

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

শরীরটা অনেকদিনের পুরাণো হয়ে গেচে বলে তাকে খাটাতে আর সাহস হয় না। এখনো সে চল্‌চে কিন্তু পুরণো গরুর গাড়ির চাকা যেমন চল্‌তে চলতে ক্যাঁ কোঁ করে কাঁদতে থাকে এরও সেই দশা। এ দেহটা কাজ করতে করতে অ্যাঁ ওঁ করচেই আর আমি তাকে ছুটি দিইনে বলে আমার উপর রাগ করচে। এই সকল কারণে, মন যখন চিঠির জবাব দিতে চায় মগজ তখন সাড়া দেয় না। কিন্তু তোমার মত মেয়ের সঙ্গে চিঠি লেখায় হার মান্‌ব এটা আমার সহ্য হয় না বলেই এখনো চিঠির জবাব পাচ্চ— কিন্তু মাঝে মাঝে লম্বা ফাঁক পড়ে যাচ্ছে। তুমি জিজ্ঞাসা করেচ আমার এত কি কাজ।[১] আমি তার একটা ফর্দ্দ দেই।

১। চিঠি	১০। জানলার কাছে বসে থাকা	১৯। চিঠি ছাড়া অন্য কিছু লেখা
২। চিঠি	১১। জানলার কাছে বসে থাকা	২০। সেই লেখা সংশোধন
৩। চিঠি	১২। জানলার কাছে বসে থাকা	২১। সেই লেখা পড়ে শোনানো
৪। চিঠি	১৩। জানলার কাছে বসে থাকা	২২। সেই লেখা কাগজে মোড়া
৫। চিঠি	১৪। জানলার কাছে বসে থাকা	২৩। সেই লেখা ডাকে পাঠানো
৬। চিঠি	১৫। ছাতের উপর বসে থাকা	২৪। সেই লেখা ছাপার অক্ষরে পড়া
৭। চিঠি	১৬। ছাতের উপর বসে থাকা	২৫। সেই লেখার সমালোচনা পড়া
৮। চিঠি	১৭। ছাতের উপর বসে থাকা	২৬। আরো সমালোচনা পড়া
৯। চিঠি	১৮। ছাতের উপর বসে থাকা	২৭। সেই লেখা সম্বন্ধে অনুতাপ করা

এই ত সাতাশ দফা[২] ফর্দ্দ দিলুম। শুনেচি তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, অঙ্ক কষতে পার। তুমি হয়ত হিসাব মিলিয়ে ঐ ২৭ থেকে ২টা রেখে ৭টা বাদ দিয়ে বল্‌বে আমি কেবল লিখি আর কুঁড়েমি করি। অর্থাৎ কাজ আর অকাজ এই দুটি মাত্র ভাগে আমার দিন বিভক্ত। আর এটাও তুমি নিশ্চয় সন্দেহ করবে, কাজের চেয়ে অকাজের অংশই বেশি— পৃথিবীতে যেমন স্থলের চেয়ে জল। কিন্তু আমার কুঁড়েমিটাকে তুমি যে তুচ্ছ বলে কাজের চেয়ে ছোট করে দেখ্‌বে এটা আমার সহ্য হবে না। রাত্রিতে পৃথিবী দেখা যায় না কিন্তু পৃথিবীটা থাকে, তেমনি আমার কুঁড়েমির মধ্যে আমার কাজটা অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু তবু সে থাকে। যা হোক এসব কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কেননা তর্ক করার চেয়ে তর্ক না করাতে অনেক পরিশ্রম বাঁচে— এই পরিশ্রম বাঁচানোর উপায় বের করাই আমার এখনকার সর্ব্বপ্রধান ভাবনা।

আজ এই পর্য্যন্ত। নীচের ঘরে বিস্তর লোক এসে জমেচে— তাদের প্রধান কাজ হচ্চে আমাকে কাজ করতে না দেওয়া এবং কুঁড়েমি করতেও বাধা দেওয়া। ইতি ২ অগ্রহায়ণ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এত অল্পেতেই তুমি আড়ি করতে প্রস্তুত, এটা ত বড় ভয়ের কথা। বিশেষত আমার মত অক্ষম এবং কুঁড়ে এবং ঢিলে লোকের পক্ষে। আমার যদি তোমার বয়স থাক্‌ত তা হলে দেখ্‌তুম চিঠি লেখায় তুমি কেমন আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে। তা হলে উল্টে আমিই বেশ পেট ভরে মনের সুখে তোমার সঙ্গে আড়ি করতে পারতুম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের কথাটা একবার শোনো— তুমি জন্মাবার[১] কয়েক বৎসর পরেই আমি পঞ্চাশ বছর পার হলুম। তাতেও একরকম চলে যাচ্ছিল, তারপরে তুমি আমাকে চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ করবার কয়েকমাস পরেই আমার শরীর গেল বিগ্‌ড়ে। শরীরকে দোষ দিই নে— অনেকদিন ওকে অনেক খাটিয়েচি— যত বেতন দিয়েচি তার চেয়ে কাজ আদায় করেচি ঢের বেশি— সুতরাং আজ ও যখন কাজে জবাব দিতে চায় তখন ওকে দোষ দিই নে। দোষ আসলে তোমার। তুমি সেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেইচ তখন না হয় আর ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেই জন্মাতে। ঢিলেমি করে তুমিই করলে দেরি-- অথচ আড়ি করবার বেলায় তোমার উৎসাহ। যাই হোক তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না, তোমার আড়ি বাঁচিয়ে চল্‌বার চেষ্টা করব। আড়িকে বড় ভয় করি।

ডাক্তার আমাকে বলেচে খুব ভাল মানুষের মত চুপচাপ করে পড়ে থাক্‌তে। কিন্তু মন যে দুরন্ত; কে আমাকে চুপ করিয়ে রাখ্‌বে বল দেখি ? তোমার বয়সী এবং তোমার চেয়ে ছোট বয়সের বন্ধু যারা আমার আছে যারা আমাকে গল্প করে শান্ত রাখ্‌তে পারত তাদের কাউকে ত হাতের কাছে পাই নে। তুমি ত আছ কাশিতে— আবার, আর কেউ কেউ আছে একেবারে সমুদ্রের ও পারে।[২] তোমার চেয়ে বড় বয়সের বন্ধু যারা আমার আছে তারা বিশেষ কিছু বল্‌তে চায় না, আমাকেই বলাতে চায়. আমার ডাক্তার এইসব লোকেদের সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করে দিয়েচে। বলেচে ওরা যে দেশে আছে সে দেশ থেকে যেন বাসা উঠিয়ে চলে যাই। কোথায় যাই বল দেখি ? তোমার ওখানে যাব মনে করি— কিন্তু যেতে হলে, শুধু মনে করা ছাড়াও আরো অনেক কিছু করতে হয়— এইজন্যেই পৃথিবীতে যেটুকু করা হয় তার চেয়ে করা হয় না অনেক বেশি। তোমার কাছে বসে গল্প শুন্‌ব সেটাও হয়ত আমার জীবনে সেই অসংখ্য না-হওয়ার ফর্দ্দের মধ্যে পড়ল। কিন্তু বলা যায় না— কোন্‌দিন হয়ত তোমার বাড়ির দরজায় দমাদ্দম ঘা মেরে চীৎকার করে বল্‌ব— "রাণু, রাণু, রবিবাবু এসেচে।"

ইতি ৮ ফাল্গুন ১৩২৪

তোমার প্রাচীন বন্ধু
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩

১০ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

ইষ্টেশন থেকে ফিরে এসেচি।[১] স্নান হয়ে গেছে। একটা বেজে গেল। তুমি আমাকে খাওয়ার পর শুতে বলে গেছ— বিছানা তৈরি আছে। শুতে যাবার আগে সেই আমার কোণের ডেস্কের সাম্‌নে বসে তোমাকে দু লাইন লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হয়েচি। ছেলেরা কে আমার ডেস্কের উপর দুটো কেয়াফুল রেখে গিয়েচে— আর, একটি ফুলের তোড়া দিয়ে গেচে হরিশ মালী।[২] আজ তাকে বারণ করে দিয়েছিলুম বলে সেই সাদা পাতা দিয়ে তোড়া সাজায় নি। লাল জবা এবং সাদা টগর ফুলে বেশ দেখ্‌তে হয়েচে। তোমরা গেছ চলে, আর এখান থেকে আমাদের হাওয়া নিয়ে গেছ— গাছের একটি পাতা নড়চে না গরমে সমস্ত আকাশটা যেন পৃথিবীর উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ধুঁকচে। অথচ রোদ্দুর নেই, আকাশ মেঘে ঢাকা,— জগৎটাকে মনে হচ্চে যেন জ্বরের রোগী কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। তারপরে যেমন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে তেমনি হয়ত বিকেলের দিকে বৃষ্টিবাদল হয়ে গরম কেটে যাবে। আমি কোথায় আছি কি করচি তা তুমি অনায়াসে কল্পনা করতে পারবে— কিন্তু এতক্ষণে গাড়ির মধ্যে তুমি যে কি করচ তা ঠিক চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি [নে]— তোমার চিঠি পেলে জান্‌তে পাব। আশা করচি লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে, গল্প করে, গাড়ির জান্‌লা থেকে পাহাড়গুলো দেখে তোমার দিন কেটে যাচ্চে। দেখ, তুমি আমাকে বলে দিয়েচ বলে আমি যথাসাধ্য খেয়েচি, শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করব, কিন্তু ঘুম হবে না, বিকেলে আজ কোনোমতেই চেঁচিয়ে বক্তৃতা করব না— রাত্রে সকাল সকাল শুতে যাব। কিন্তু তুমি যদি বেশ করে খেয়ে দেয়ে মোটা সোটা হয়ে না ওঠ, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। যাবার আগে তোমাকে একটু গান শুনিয়ে দিয়ে শুতে যাই—

ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু—
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু

ইতি ২৬ আষাঢ় ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেয়াফুলের কেশর চিঠির মধ্যে
একটু একটু পাবে।

৪

১৫ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

একটা রঙীন কাগজ জোগাড় করেচি। মনে কোরো না বৌমা[১] দিয়েচেন। তাঁকে যখন বলি, "মনে আছে ত, রাণু তোমাকে রঙীন চিঠির কাগজ আনিয়ে দিতে বলে দিয়েচে," তিনি কেবল হাসেন। তুমি ত জানই এইরকম সব গম্ভীর কথা বল্‌তে গেলে তিনি কোনোমতেই গম্ভীরভাবে নেন না। ঐ জন্যে তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েচি। যাই হোক্ এই কাগজের রং যদি তোমার পছন্দ হয় তা হলে কিছুদিন চালাতে পারব। কিন্তু তোমার চিঠির কাগজের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না।

আমার জন্য মন কেমন করতে দিয়োনা রাণু। আমি তোমার কথা কত ভাবি। তুমি সুখে থাকবে, সকল রকমে তোমার কল্যাণ হবে এই ইচ্ছা আমার মনে জেগে আছে। আমার মন ত তোমার কাছেই আছে। আমার মধ্যে যা ভাল তাই তোমার ভাল কামনা করচে। যিনি অন্তর্যামী হয়ে নিয়ত তোমার অন্তরে আছেন— তিনিই আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদকে এবং আনন্দকে তোমার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিচ্চেন।

পথের থেকে যে চিঠিটা লিখেছিলে[২] সেটা কাল পেয়েছিলুম তার উত্তর দিয়েচি। আজ যেটা কাশী থেকে লিখেচ সেটাতে ছোট বউ গাবলোর বউ[৩] প্রভৃতির মঙ্গল সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচি। তোমাদের কাশীতে গরম, এখানেও মন্দ গরম না। যদিও কাল খুব ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ রৌদ্রে সব শুকিয়ে গেছে।

এতক্ষণ দুপুর বেলায় তোমার পরামর্শমত খাবার পর অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে কাটিয়েচি। খানিকটা ঘুমিয়েচি খানিকটা বই পড়েচি। এমন সময় আমার ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজ্‌ল। অমনি ধড়ফড় [করে] উঠে পড়ে আমার সেই কোণে এসে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। আজ আমার ডেস্কের উপরকার ফুলদানীতে কেবল কদম ফুল সাজিয়ে দিয়ে গেচে— আমি চেষ্টা করব তোমাকে তার একটা ছবি এঁকে দিতে। এর আগের চিঠিতে তুমি আমাকে যে সব ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলে তার জবাব দেওয়া হয়নি, ভাল হোক্ আর মন্দ হোক্ এবার তার জবাব দিতে হবে।

একটা কথা তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিই। তুমি বলেচ কেউ আমাকে বয়েস জিজ্ঞাসা করলে সাতাশ বল্‌তে। আমার ভয় হয় পাছে লোকে সাতাশ শুন্‌তে সাতাশি শুনে বসে, আর সেইটেই সহজে বিশ্বাস করে বসে। সেইজন্যে, তুমি যদি রাজি থাক তাহলে আমি আর একটা বছর কমিয়ে বল্‌তে পারি। কেননা ছাব্বিশ বল্লে ওর থেকে আর কিছু ভুল করবার ভাবনা থাকে না।

এইবাব আমার বই লেখবার সময় এল। সেই সুভাকে[৪] নিয়ে পড়তে হবে। পিগ্‌মিদের গল্পটার[৫] থেকে লেখা শেষ করেচি। আমার সেই পঞ্চম ক্লাস মনে আছে ত? কেমন মজা? সেই সমরেশ জ্যোতিয আভাসরা[৬] তেমনি করেই চীৎকার করে— রাস্তা থেকে তাদের গলা শুন্‌তে পাওয়া যায়। ঐ ক্লাশটা আমার বেশ লাগে। থার্ডক্লাসের ছেলেরাও ক্রমে ক্রমে একটু একটু উন্নতি করচে। ইতি ৩১ আষাঢ় ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী
রবিদাদা

৫

১৭ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

আজ সকালে বুধবারের উপাসনা ছিল। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেই তোমার চিঠি[১] পেলুম। আমি ছোট চিঠি লিখেচি বলে তুমি নালিশ করেচ। কিন্তু একটা কথা তোমার ভেবে দেখা উচিত— তুমি বোলপুর ষ্টেশন থেকে বরাবর কাশী পর্য্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে নতুন নতুন দৃশ্যের ভিতর দিয়ে নানা কথায় তোমার চিঠি ভরেচ— আর আমি বেচারা চুপ করে সেই একটা কোণে বসে এমন কি লিখ্‌তে পারি যা তুমি জান না। আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হচ্চে, শোবার ঘর থেকে কোণের ডেস্ক, কোণের ডেস্ক থেকে ক্লাস, ক্লাস থেকে নাবার ঘর, নাবার ঘর থেকে খাবার ঘর, খাবার ঘর থেকে শোবার ঘর, শোবার ঘর থেকে কোণ, কোণ থেকে ছাদ, ছাদ থেকে আবার শোবার ঘর। এ সমস্তই তোমার জানা। আজ এখন সকাল নটা বেজেচে। আমার সামনে ফুলদানীতে বেলফুল, জবাফুল এবং একরকম বিলিতি হল্‌দে ফুলে তোড়া বেঁধে দিয়েচে। লাল সাদা

এবং হল্‌দেতে মিলে বেশ দেখতে হয়েচে। আমার ডান পাশের শেল্ফের উপর ছেলেরা একটা কেয়াফুল রেখে দিয়েচে তারই গন্ধে আমার কোণ ভরে গিয়েচে। আর লাবু,[২] লাবুকে মনে আছে ?— লাবু একটা ছোট রজনীগন্ধার মালা গেঁথে এনে দিয়েছে— সেটাও আমার ডেস্কের উপরে পড়ে আছে। পিঠের কাছে পশ্চিমের জান্‌লা খোলা আছে, সেইখান থেকে ঝুরঝুর করে হাওয়া আস্‌চে। এই পশ্চিমের হাওয়া কোথা থেকে আস্‌চে বল ত রাণু— কাশী থেকে কি ? কাশীতে এখন তোমাদের খুব গরম এবং গুমট— বোধহয় কিচ্ছু হাওয়া নেই। কিন্তু তুমি যে মাঝে মাঝে আমার কথা ভাবচ তোমার সেই ভাবনার হাওয়া বোধ হয় আমার পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে ঢুকে আমাকে পাখা করচে।

তুমি এখন অল্প অল্প করে পড়চ, তিনবার করে দুধ খাচ্চ শুনে খুসি হলুম। বৌমার মত মোটা হওয়া চাই। আর যাই কর, হিন্দী দোঁহা মুখস্ত করা একেবারে ছেড়ে দিয়ো। সেই তোমাদের "ছল ছল ছৈল সুছাম" এম্‌নি শুক্‌নো, যে ওর পরে তিন বাটি দুধ খেয়েও কিছু সুবিধে হবে না। বরঞ্চ তোমার 'লটি'কে তোমার হিন্দী গুরুজির কাছে ভর্ত্তি করে দিয়ো। ওর গাল দুটো এত ফুলো, যে, দোঁহা আওড়াতে আওড়াতে যদি একটুখানি রোগা হয় তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। ভক্তিকে বোলো তার বন্ধুর দল মোটের উপর ভালই আছে, কেবল দিনুবাবুর[৩] কাল জ্বর হয়েছিল আজ কুইনীন্ খেয়ে চুপ করে বিছানায় শুয়ে আছে। হাঁ, একটা কথা মনে রেখো— সন্ধ্যাবেলায় রোজ তোমাকে গান কিম্বা সেতার কিম্বা বীণা ঐ রকম কিছু একটা শিখ্‌তে হবে। বাবাকে[৪] বোলো একটা উপায় করে দিতে। ইতি ১লা শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

রাণু অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে

১

।আগস্ট ১৯১৭।

।কাশী।

প্রিয় রবিবাবু

আমি আপনার গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলো পড়েছি, আর বুঝতে পেরেছি কেবল ক্ষুধিত পাযাণটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা সেই বুড়োটা যে ইরাণী বাঁদীর কথা বলছিল, সেই বাঁদীর গল্পটা বললনা কেন ? শুনতে ভারী ইচ্ছে করে।

আপনি লিখে দেবেন। হ্যা ?

আচ্ছা জয়পরাজয় গল্পটার শেযে শেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল। না ? কিন্তু আমার দিদিরা বলে শেখর মরে গেল। আপনি লিখে দেবেন যে, শেখর বেঁচে গেল আর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হল। কেমন ? সত্যিই যদি শেখর মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার বড় দুঃখ হবে। আমার সব গল্পগুলোর মধ্যে মাষ্টারমশায় গল্পটা ভাল লাগে। আমি আপনার গোরা, নৌকাডুবি, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজর্ষি, বৌ ঠাকুরুণএর হাট, গল্প সপ্তক সব পড়েছি। কোন কোন জায়গায় বুঝতে পারিনি কিন্তু খুব ভাল লাগে। আপনার কথা ও ছুটির পড়া থেকে আমি আর আমার ছোটবোন কবিতা মুখস্ত করি। চতুরঙ্গ ফাল্গুনি ও শান্তিনিকেতন সুরু করে ছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না। ডাকঘর, অচলায়তন, রাজা, শারোদোৎসব এসবো পড়েছি। আমার আপনাকে দেখতে খু উ উ উ উ উ উব ইচ্ছে করে। একবার নিশ্চয় আমাদের বাড়িতে আসবেন। নিশ্চয় আসবেন

কিন্তু। না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি। আপনি যদি আসেন তবে আপনাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দেব। আমাদের পুতুলও দেখাব। ও পিঠএ আমাদের ঠিকানা লিখে দিয়েচি।

রাণু

[পরপৃষ্ঠায়]

235 Agast Kund
Benares city.

আমার চিঠির উত্তর শিগ্‌গির দেবেন।
নিশ্চয়।

২

[আগস্ট ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু

আপনি এতদিন আমাকে চিঠি দেননি বলে খুব রাগ হয়েছিল কিন্তু আপনার চিঠি[১] পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আমার ভাল নাম কি জানেন ? প্রীতি। বেশ সুন্দর নাম না। ইস্কুলে সবাই আমাকে প্রীতি বলে ডাকে। কিন্তু আপনি আমাকে রাণু রাণু বলেই ডাকবেন। আপনার ও নামটা সুন্দর লাগে কিনা তাই বলচি। আমার আরো নাম আছে শুনবেন। রাণী রাজা বাবা। সব নাম গুলোই বেশ। না ? আপনি যে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম[২] বলে একটা সুন্দর লেকচার দিয়েছিলেন না, সেটা ভারতী আর প্রবাসীতে বেরিয়ে ছিল। মা[৩] বাবজা বাবু[৪] আশারা[৫] সেটা পড়ে বল্লেন যে খুব সুন্দর হয়েছে। আমিও তাই পড়তে গেলাম কিন্তু কিচ্ছুই বুঝতে পারলাম না। বোধহয় সেটা খুব শক্ত। কিছুদিন আগে আমার খুব অসুখ করেছিল। এখন ভাল আছি। আপনি নিশ্চয় আমাদের বাড়ী আসবেন আমরা এ বাড়ী ছেড়ে যাবনা। এ বাড়ী আমাদের নিজের বাড়ী। ভাড়ার বাড়ী নয়।[৬] আপনি আসবার সময় আমাদের জানাবেন। আমি ইস্কুলের ছুটী নিয়ে আপনাকে ইষ্টিসানে আনতে যাব। এ চিঠির উত্তর শিগ্‌গির দেবেন যেন, হারিয়ে ফেলবেন না যেন। আমি কেমন সুন্দর ফুল আঁকা কাগজে চিঠি লিখেচি।

রাণু

আমাদের বাড়ীর ঠিকানা আবার লিখে দিচ্ছি।
235 Agast Kundo
Benares City

আপনি আর গল্প লেখেন না কেন।

৩

[সেপ্টেম্বর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু,

এবার আপনি ও বারের চাইতে শীঘ্র চিঠি দিয়েছেন। খবরের কাগজের অনেক জায়গায় আপনার নাম থাকে, সেখানে আপনার নামের আগে স্যার লেখা থাকে। আবার কোন২ জায়গায় কবিসম্রাটও লেখা থাকে।

আপনি খুব ভাল কবিতা লিখতে পারেন কিনা, তাই। আপনাকে রোজ অনেক লোককে চিঠি লিখতে হয় বুঝি ? কজন লোককে ? ছিঃ আপনি কুঁড়ে। আমি কিন্তু কুঁড়ে নই। আমরা যদি আপনার বাড়ির কাছে থাকতাম ত বেশ হত। আমি রোজ আপনার কাছে গিয়ে গল্প শুনতাম। আমিও আপনাকে বলতাম। আপনাকে দেখে আমার একটু ভয় করবে না। আপনি ত খুব সুন্দর দেখতে। আপনি বুঝি ভাবেন আমি আপনার ফটো দেখিনি। তাতে ত আপনাকে খুব সুন্দর লাগে। আমাদের শোবার ঘরের মাঝখানে আপনার একটা সুন্দর ফোটো আছে। মা আর একটা মাসিক পত্রতে আপনার একটা সুন্দর ফোটো পেয়েছিলেন সেটাও বাঁধিয়ে রেখেছেন। আপনি যদি নারদমুনির মত ঝগড়াটে হন[১] তবে নিশ্চয় আপনি নারদমুনির মত গানও গাইতে পারেন, বীণাও বাজাতে পারেন। আপনার যখন সুবিধে হয়, তখন আমাদের বাড়িতে আসবেন। আসবেন কিন্তু। প্রত্যেক বারেই ত আপনি লেখেন আসব, কিন্তু আসেন না। আমি এবার কেমন বাসন্তি রঙের কাগজে চিঠি লিখচি। খামটাও বাসন্তি। মিসেস্ বেসন্টএর[২] ফর্ষ্ট অক্টোবারে জন্মদিন কিনা, তাই ওঁর গর্লস্ স্কুলের মেয়েরা লক্ষীর পরিক্ষা[৩] অভিনয় করবে। আমার মা শেখাচ্ছেন। আশা ক্ষীরো, শান্তি[৪] রাণী কল্যাণী। জন্মাষ্টমীর দিন ওঁর ইস্কুলে বোর্ডিং হাউসের মেয়েরা তিনটী ছোট২ ড্রামা করিয়াছিল। আমি দেখতে পাইনি। আমার খুব অসুখ করেছিল। আজকে সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে। বিকেলে এত বৃষ্টি হয়েছিল যে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমি আর ভক্তি[৫] ওদের অভিনয় দেখতে যাব। আমরা যে অন্য স্কুলে পড়ি। আমাদের ইস্কুলের নাম C. H. C. Girls School. এবার আরবারের মত একটা মস্ত বড় চিঠি লিখবেন। ঠিকানা আর লিখে দেব না। ভুলে যাবেন না। এবার তবে শুতে যাচ্চি।

রাণু ॥

[একটি ছবি এঁকে]
মেয়েটির নাম মিনা।
একহাতে হাঁসকে খাওয়াচ্ছে
আর একটা হাত একটা
জিনিযে রেখেছে।
ছবিটা কেমন সুন্দর। আমি এঁকেচি।

আচ্ছা কৃপা করে ঠিকানা লিখে দিচ্চি। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তবে আর লিখতে পারবেন না।

235 Agust Kund.
Benares City.

8

[১৫ অক্টোবর ১৯১৭]

[কাশী]

প্রিয় রবিবাবু,

আমি এতদিন চিঠি দিইনি বলে রাগ করবেন না। আমার খুব অসুখ করেছিল কিন্তু এখন ভাল আছি। লক্ষীটি রাগ করবেন না। আজকে থেকে আমাদের পূজোর ছুটি সুরু হয়েছে। 31st Octoberএ খুলবে। আচ্ছা আপনার চিঠি লেখা ছাড়া আর কি কাজ।[১] আর কোই গল্পও লেখেন না। ইস্কুলেও যাননা। আমার আপনার চাইতে ঢের বেশী কাজ। সকালে নটা পর্য্যন্ত মাষ্টারমশায়ের কাছে পড়ি তারপর চারটে পর্য্যন্ত ইস্কুলে থাকি। ইস্কুল থেকে এসে পন্ডিতজীর কাছে হিন্দী পড়ি। আর রাত্রে লেখা, টাস্ক করি। আপনাকে দেখে বিশ্রী বলবনা।

ছবিতে তো আপনাকে সুন্দর করে আঁকে। আপনি নিশ্চয় ছবির চেয়ে বেশী সুন্দর। আমার বেশ একটী সুন্দর বন্ধু। না। আপনার বোধহয় কোন সুন্দর বন্ধু নেই। আপনাকে এসে কিন্তু আমাদের বাড়ীতে থাকতে হবে। আর কোথাও থাকতে পাবেন না। আচ্ছা আপনি পদ্মার উপর নদীতে নৌকায় থাকতেন না নদীর ধারে বাড়ীতে থাকতেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে করে। আজকে যে সোমবার তার আগের সোমবারে এখানে মিসেস্ এনি বেসেন্ট এসেছিলেন। তিনি থিওসিফিকল গর্লস্ স্কুলের যে নতুন বাড়ী তেরী [তৈরী] হচ্চে তার দরজা খুললেন। ভক্তি ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। শান্তি, আশা আগেই ওদের নতুন ইস্কুলে গিয়েছিল। আমার আর মার অসুখ করেছিল। কিন্তু তবুও আমরা দুজনে গেলাম। মিসেস্ এনি বেসেন্টএর সঙ্গে মিষ্টর্ ওয়াড়িয়া আর মিষ্টর আরেন্ডেলও[২] ছিলেন। অনেক ছেলে স্কাউট্ হয়েছিল। তারা সব প্রকাণ্ড ২ লাঠী নিয়েছিল। মিসেস্ বেসেন্ট বক্তৃতা দিলেন। আর কেমন মেয়েদের হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন। ছি, ছি, আপনি হাঁস আঁকতে যানেন না। আমি কেমন আঁকতে পারি। এবার একটা গল্প লিখবেন। আপনার গল্প পড়তে বেশ লাগে। ফিরে বারের চিঠিতে লিখবেন কিন্তু কবে আসবেন। আচ্ছা, আপনার হাঁসগুলোর সঙ্গে কি করে বন্ধুত্ব হল।[৩] তারা আপনাকে দেখে পালিয়ে যেত না। তারা নিশ্চয় আমার হাঁসটার চেয়ে সুন্দর ছিলনা। তাদের মধ্যে সকলেই কি শাদা ধব্‌ধবে ছিল। এবারে ছবি আঁকলাম না। আর বারে এঁকে দেব।

রাণু।

কেমন মজা আপনার নামো র দিয়ে সুরু আমারও নাম র দিয়ে সুরু ॥

৫

[অক্টোবর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু

আপনি এবার বেশ বড় চিঠি দিয়েচেন। আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। আপনার ভয় নেই আমি আপনার সঙ্গে আড়ি করবনা। কিন্তু আপনাকে আমার সব চিঠির উত্তর দিতেই হবে। আমারও আপনার ঠিকানা পষ্ট মনে আছে। আপনি কখন হাঁসের বাচ্চা দেখেছেন। তাদের কোলে করেছেন। আপনি আমাকে আপনার একটা সুন্দর ফোটো দেবেন। সেটা যেন খুব ছোট্টো আর বাঁধান হয়। বাঁধানটাও যেন খুব চকচকে হয়। আপনি যখন আমাদের বাড়ী আসবেন, তখন আমার ফোটো দেখাব একটা আমাদের চার বোনের। আমি আর ভক্তি একটা চেয়ারে বসে। আর আশা শান্তি চেয়ারের পেছনে দাড়িয়ে আছে। আর একটা ফোটো বাব্‌জা আর আমরা। বাব্‌জা একটা চেয়ারে বসে। ভক্তি বাব্‌জার কোলে বসে। আমি আর শান্তি দুজনে দু পাশে। আশা চেয়ারের পেছনে। আমার একটা আলাদা ফোটো আছে। আপনি এলে সেইটেও দেখাব। যিনি তুলেছিলেন তিনি বল্লেন আমার দিকে তাকাও। আমার ভারী রাগ হল। তাই সেই ফোটোটাতে বোধ হচ্চে যেন আমি রেগে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি যে লিখেচেন আপনার সময় কম তো কি কাজ? এবারে লিখবেন যে কি কাজ। আপনি আমাকে ছোট চিঠি লিখতে পাবেন না। এখানে পণ্ডিতজী[১] এসেছিলেন। উনি কাশীতে এসে পর্য্যন্ত রোজ আমাদের বাড়ীতে আসতেন। কেবল চতুর্থীর দিন উপোষ করেছিলেন বলে আসেননি। আর একদিন ওঁর গঙ্গা নেয়ে অসুখ করেছিল তাই আসেননি। উনি আপনার প্রায় সব গানই জানেন। পণ্ডিতজী আপনাকে গুরুদেব বলেন। আপনার অনেক গল্পও করেন। উনি বলছিলেন, আপনাকে উনি পৃথিবীর মধ্যে বেশী ভাল বাসেন। উনি বেশ সুন্দর গান করিতে পারেন। আমি 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' এই গানটা শিখেছি। এই গানটা আমার সব চাইতে বেশী ভাল লাগে। উনি কিছুতেই জল খাবার খেতে চাইতেন না। আমরা ধরেবেঁধে খাওয়াতাম। পণ্ডিতজী এখন বোধহয় বোলপুরে। তাঁকে আমার নমস্কার দেবেন। আচ্ছা, আপনি আমাকে বেশী ভালবাসেন, না পণ্ডিতজীকে? যদি পণ্ডিতজীকে বেশী তবে আপনার সঙ্গে আড়ি।

আচ্ছা আপনার নাইতে ভাল লাগে। আমার ভারী খারাপ লাগে। কিন্তু মা জোর করে নাইয়ে দিলেন। আপনি এখানে আসেননা কেন ? শিগ্‌গির২ আসবেন। আপনি ইচ্ছে করে দেরী করে আসেন। এবার আমি কি সুন্দর ছবি এঁকেছি। আপনাকেও আঁকতে হবে। আমি কি সুন্দর কাগজে প্রকাণ্ড চিঠি লিখেচি। আমার আপনার গান শুনতে খুব ইচ্ছে করে। আসবার সময় বলবেন।

রাণু।

শ্রীমতী রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)কে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র ও তাঁকে লেখা রাণুর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক পত্র 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'-র নবপর্যায় ১ [শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১] সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যায় উভয়ের আরও কয়েকটি পত্র সংকলিত হল। রাণু অধিকারীর মূল পত্রগুলি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলির প্রতিলিপি রাণু মুখোপাধ্যায় নিজেই প্রস্তুত করে তাঁকে দিয়েছিলেন, পরে আর-একটি প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এইগুলি সম্পাদনা করে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'-র পাঠ প্রস্তুত করেন ও সেগুলি ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৪-আষাঢ় ১৩৩৫ সংখ্যাগুলিতে মুদ্রিত হয়ে চৈত্র ১৩৩৬-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধির আশঙ্কায় বা অন্য কোনো কারণে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি পত্র বর্জন করেন, কতকগুলির কিছু-কিছু অংশ বাদ দেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে 'চিঠিপত্র'-এর পরবর্তী একটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত পত্রাবলির সম্পূর্ণ পাঠ ও অপ্রকাশিত চিঠিগুলির সঙ্গে রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-র পত্রগুলিও ছাপা হবে। রাণুর অধিকাংশ চিঠি তারিখহীন— রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ ও বিষয়ের সূত্র অবলম্বন করে সেগুলির কালানুক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ৭ অক্টোবর ১৮৯৪ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখবার ক্ষমতা আছে।' ইন্দিরা দেবীর সেই সময়ে লেখা চিঠি পাওয়া যায় নি, সুতরাং তাঁর 'চিঠি লেখবার ক্ষমতা'র প্রমাণ যাচাই করবার সুযোগ নেই— কিন্তু রাণুর চিঠিগুলো পড়লে পাঠকের নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হবে না, কী গুণে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'-র অপূর্ব চিঠিগুলি লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন। পত্রের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রে '[য]' অর্থাৎ 'যদ্দৃষ্টং' সংকেত-যোগে ভুল বানানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

টীকা

রবীন্দ্রনাথের পত্র :

পত্র ১ ॥ ১. দ্র রাণুর ৪-সংখ্যক পত্র।
২. হয়তো এই সাতাশ দফা ফর্দ থেকেই রাণুর মনে এসেছিল যে, রবীন্দ্রনাথের বয়স সাতাশ।

পত্র ২ ॥ ১. রাণুর জন্ম হয় কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে ৮ কার্তিক ১৩১৫ (২৪ অক্টোবর ১৯০৮)।
২. এইরূপই সাগরপারের এক বালিকা বন্ধু ছিলেন শিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের কন্যা রাচেল।

পত্র ৩ ॥ ১. রাণুর পিতা ফণিভূষণ অধিকারী অসুস্থ অবস্থায় সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ৪ জুন ১৯১৮ (২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫) তারিখে। প্রায় একমাস সেখানে থেকে তাঁরা কাশীর উদ্দেশে রওনা হন ১০ জুলাই বুধবার ২৬ আষাঢ় তারিখে। তাঁদের ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে স্টেশন থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লিখেছেন।
২. আশ্রমের প্রাচীনতম সেবক দ্বারী সর্দারের পুত্র।

পত্র ৪ ॥ ১. পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯)।

২. দ্র 'বিশ্বভারতী পত্রিকা,' নবপর্যায়, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১, রাণুর পত্র ১।
৩. রাণুর পুতুলদের নাম।
৪. রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পটি অনাথনাথ মিত্র ইংরেজিতে অনুবাদ করে সেপ্টেম্বর ১৯১০-সংখ্যা 'মডার্ন রিভিয়্যু'তে প্রকাশ করেন ও এটি এপ্রিল ১৯১৮-তে *Mashi and Other Stories* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। অক্টোবর ১৯১৮-তে প্রকাশিত *Stories from Tagore* গ্রন্থেও গল্পটি নেওয়া হয়। এই চিঠি থেকে স্পষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথ উক্ত অনুবাদটির কথা উল্লেখ করেছেন কিনা।
৫. এই সময়ে 'অনুবাদ-চর্চা' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ হয়তো এরই জন্য কোনো ইংরেজি বই থেকে পিগ্‌মিদের গল্প অনুবাদ করেছিলেন। রাণু শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে এইসব রচনার কথা জেনেছিলেন। সম্ভবত উক্ত গ্রন্থের ২৬-২৮ অনুচ্ছেদগুলির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. তৎকালীন পঞ্চম ক্লাস অর্থাৎ বর্তমান ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সমরেশ সিংহ, জ্যোতিষচন্দ্র রায় ও আভাসচন্দ্র সেন।

পত্র ৫ ॥ ১. ৪ ॥ টীকা ২ দ্রষ্টব্য।
২. ক্ষিতিমোহন সেনের দ্বিতীয়া কন্যা মমতা (দাশগুপ্তা)।
৩. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫)।
৪. রাণুর পিতা ফণিভূষণ অধিকারী।

রাণু অধিকারীর পত্র :

পত্র ১ ॥ এইটিই রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণুর প্রথম পত্র, যার উত্তর তিনি দেন ৩ ভাদ্র ১৩২৪ (১৯ আগস্ট ১৯১৭) তারিখে। দ্র 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ১।

পত্র ২ ॥ ১. রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত পত্র।
২. মাদ্রাজে গবর্মেন্ট-কর্তৃক অ্যানি বেসান্টকে অন্তরীণ করে রাখার প্রতিবাদে প্রবন্ধটি রচনা করে রবীন্দ্রনাথ ২৫ শ্রাবণ ১৩২৪ (১০ আগস্ট ১৯১৭) আলফ্রেড থিয়েটারে একটি জনাকীর্ণ সভায় প্রথম পাঠ করেন। ভাদ্র ১৩২৪-সংখ্যা ভারতী ও প্রবাসীতে প্রবন্ধটি ছাপা হয়।
৩. সরযূবালা অধিকারী।
৪. এঁর পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি।
৫. রাণুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী আশা (১৯০৩-১৯৭০)। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক আরিয়াম আর্যনায়কমের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়।
৬. দ্র 'ভানুসিংহের পত্রাবলী,' পত্র ১ : 'তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না— হয়তো তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব, কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর কোনো বাড়িতে চলে যাও ?'

পত্র ৩ ॥ ১. দ্র 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ২ : 'কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখি আমাকে দেখতে নারদ মুনির মতো— মস্ত বড়ো পাকা দাড়ি।'
২. অ্যানি বেসান্ট (১৮৪৭-১৯৩৩), থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী। কাশীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ ও গার্লস্ স্কুল তাঁর প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য সময়ে হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সভানেত্রী।
৩. "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" ফাল্গুন ১৩০৫-সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।
৪. ফণিভূষণ অধিকারীর দ্বিতীয়া কন্যা শান্তি, ইংরেজিতে এম. এ., রেল-ইঞ্জিনিয়ার কেশবলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়।
৫. রাণুর কনিষ্ঠা ভগিনী, গুজরাতি ব্যবসায়ী চিন্ময় প্যাটেলের সঙ্গে বিবাহ হয়।

পত্র ৪ ॥ ১. এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান সংকলনের ১-সংখ্যক পত্রটি লেখেন।
২. মিসেস বেসান্টের সহযোগী B. P. Wadia ও G. S. Arundale।
৩. এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য দ্রষ্টব্য 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ৪।

পত্র ৫ ॥ ১. ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মারাঠি সংগীত-শিক্ষক পণ্ডিত ভীমরাও হসুরকর শাস্ত্রী।

টীকা : প্রশান্তকুমার পাল

রসের ধারণা

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

[কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের "The Concept of Rasa" শীর্ষক প্রবন্ধের বাংলা ভাষান্তর। গোপীনাথ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত *Krishna Chandra Bhattacharyya –Studies in Philosophy* (Vol 1) গ্রন্থে এই প্রবন্ধটিকে কৃষ্ণচন্দ্রের (অপ্রকাশিত) রচনা হিসাবে নির্দেশ কবা হয়েছে। —শ্রীকল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য।]

শিল্প-সম্মত উপভোগ

১. ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে আলোচনা করা হয়েছে রসের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে— ইংরাজিতে যার সমার্থক শব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। অভিধা-গত অর্থে 'রস' বলতে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, এই দুটি জিনিসকে বোঝায়— এর এক অর্থ হল, নির্যাস এবং অপর অর্থ হল, যা আস্বাদন বা অনুভব করা হয়। রসের নান্দনিক ধারণা এই দুই অর্থেরই সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন এক অনুভূতির প্রতি ইঙ্গিত করে, সাধারণ বিচারে যা এক শাশ্বত অনুভূতি বা তার বিষয় অথবা অনুভব-যোগ্য এক চিরন্তন মূল্যবোধ। 'স্বরূপ' অবশ্য এক বৌদ্ধিক ধারণাবিশেষ, 'অনুভবের মূলীভূত স্বরূপ',— এই বাক্যাংশটি অবশ্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। 'স্বরূপ'কে এ ক্ষেত্রে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত 'সামান্য'র অর্থে গ্রহণ করা হয় নি। অন্যান্য কিছু মতবাদের মতো ভারতীয় শিল্পতত্ত্বে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে বিষয়ের/বস্তুর স্বরূপ বলে পরিচিত 'সামান্য'ই রস হিসাবে কিছুটা জটিল পথে অনুভূতির দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। যৌক্তিক 'সামান্য'কে কখনও জীবনের আদর্শের সঙ্গে একীকরণ করা হয়েছে এবং নান্দনিক স্বরূপকে বিবেচনা করা হয়েছে অনুভবযোগ্য এক আদর্শরূপে অথবা আদর্শের অনুভূতিরূপে। ভারতীয় ধারণায় রসকে এক সর্বোচ্চ ধারণা বা সর্বজনীন সত্যের সঙ্গে সমগোত্রীয় করা হয় নি অথবা রূপায়ণযোগ্য কিংবা রূপায়িত আদর্শের সঙ্গেও নয়। সম্পূর্ণভাবে অনুভূতির মধ্য দিয়েই এবং অনুভূতির মাপকাঠিতেই একে বোঝা যায়। যদি একে স্বরূপ বা আদর্শ বলা হয় তবে মনে রাখতে হবে তা কেবলই এক উপমা ছাড়া আর কিছু নয়। শিল্পের সাধারণ তত্ত্বে এবং বিশেষ কোনো শিল্পের প্রকৃত সমালোচনায় অবশ্য উপমার অধিক প্রয়োগে বিপদ আছে। নন্দনতত্ত্বে, অন্তত শুরু করার জন্য, কোনো অনুমান-ভিত্তিক প্রকল্প বা ধর্ম সম্বন্ধীয় স্বীকার্য গ্রহণ করবার দরকার নেই। শৈল্পিক অনুভবের কাছে যা মূল্যবান, বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তির কাছে তা নাও হতে পারে— অন্তত পক্ষে একই মাত্রায় যে নয়, তা বলা চলে এবং এ ব্যাপারে শেষ রায় দেওয়ার অধিকার অনুভবের।

২. রস বলতে বোঝায় হয় নান্দনিক উপভোগকে নয়তো যা ওইভাবে উপযুক্ত তাকে। এই ধারণার তাৎপর্য সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যাবে অন্যান্য অনুভবের প্রসঙ্গে নান্দনিক উপভোগের অভিমুখ লক্ষ্য করে। এখন ব্যাখ্যা করব যে শৈল্পিক আবেগ কেবলমাত্র অনেক অনুভবের মধ্যে অন্যতম নয়, বরং তা হল সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভব ; যেহেতু অন্যান্য অনুভবের তুলনায় তা সম্পূর্ণ নতুন এক পর্যায়ে বা স্তরে রয়েছে। কখনও কখনও অনুভবের স্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে তার সভ্যতার বিচারে অথবা তার ভিতরে কতখানি জ্ঞাত তার সাহায্যে কিংবা মানসিক বিবর্তনে এর অভ্যুদয় কোন্ পর্যায়ে তার ভিত্তিতে। অবশ্য অনুভবের তাৎপর্য অথবা বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে এ আমাদের খুব বেশি একটা সাহায্য করে না। মানসিকতার যে স্তরে ওই অনুভব রয়েছে, তা নির্ণয় করতে পারলেই সবচেয়ে ভালোভাবে এটা বোঝা সম্ভব।

৩. আমরা এখন শুরু করব বস্তুর/বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব এবং ওই অনুভবের প্রতি সহানুভূতি— এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। আমরা বলে থাকি যে বস্তু/বিষয়ের উপভোগ। "উপভোগ করা" এই সকর্মক ক্রিয়া ব্যবহারের যথার্থ তাৎপর্য কী ? অন্তত ভোক্তার কাছে এ কথা তো মনে হয় না যে বস্তু/বিষয় কেবল উপভোগের উপায় মাত্র। তার উপভোগ ও বস্তুর মধ্যে সে কোনো পার্থক্য বোধ করে না। এই অর্থে কর্তা ও কর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদ অনুভবের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হয়ে যায়। উপভোগের কর্তা বিষয়/বস্তুকে অচেতন ভাবে প্রভাবিত করে অথবা তার দ্বারা সে নিজে প্রভাবিত হয়। বস্তু/বিষয় এখানে তার কাছে শুধু একটা ঘটনা নয়, তার রয়েছে এক মূল্যবোধ, এক মনোজ্ঞ রূপ বা অভিব্যক্তি। বিষয়ীও এখানে বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ না ক'রে মনে করে বিষয় যেন তাকে আকৃষ্ট বা প্রভাবিত করে ফেলেছে।

৪. এর পর বিবেচনা করা যাক এমন একটা অনুভূতির যার প্রত্যক্ষ বিষয় হল অন্য এক অনুভূতি ; ধরা যাক, যার অস্তিত্ব ভিন্নতর মনে। এই অনুভূতির অনুভবকে শুধুমাত্র উপলব্ধি থেকে বিষয় হিসাবে পৃথক করা প্রয়োজন ; বিষয়ের সেখানে নিজস্ব কোনো আকর্ষণই নেই। অন্য কোনো ব্যক্তির অনুভবের বেলায় সমজাতীয় অনুভবের সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেলা চলে না। কোনো ব্যক্তিকে সহানুভূতি জানানোর অর্থ তার অনুভবটা উপলব্ধি করা— কেবল এই অর্থেই তার অনুভব আমার অনুভবের প্রত্যক্ষ বস্তু হয়ে উঠতে পারে। আমরা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করব সহানুভূতির যেহেতু অনুভূতির অনুভবের ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে পরিচিত ধরন।

৫. খেলনা পেয়ে খুশি এমন কোনো শিশুর আনন্দের আমি যখন অংশভাক্ হই, তখন ওই শিশুর মতো আমি ওই খেলনা-বিশেষেই আনন্দ বোধ করি না, আনন্দ বোধ করি তার উপভোগের মধ্যে। কোনো আনন্দের প্রতি সহানুভূতিও একজাতীয় আনন্দ কিন্তু প্রাথমিক আনন্দের চেয়ে তা আরও বেশি মাত্রায় স্বাধীন। খেলনাটির প্রতি নিজের অগোচরে আমি সানন্দ দৃষ্টি দিই না বা কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করি না। শিশুটির মতো আমি সেটিকে ওখানে দেখিও না, বড়োজোর কল্পনায় তা আনতে পারি। তার মতো আমি খেলনাটি পেয়ে মোহিত হই না বা খেলনার আকর্ষণে তাতে লিপ্ত হয়ে থাকি না। আমার সহানুভূতির বেলায় আমি যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তা কিন্তু নয়, কারণ এটা একটা ঘটনা যে আমি এ সত্ত্বেও শিশুটির আনন্দের দ্বারা প্রভাবিত হই যদিও বিষয়ের কোনো প্রভাব আমার ওপর নেই। বিশেষ একটি শিশুর অনুভূতির দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া যেন একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার যা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। এমন-কি, এ ক্ষেত্রেও শিশুর অনুভব এবং আমার অনুভবের মধ্যে পার্থক্যের বোধ আমি হারাই না, যেভাবে ওই শিশু তার নিজের অনুভব ও বস্তুর মধ্যে বিভেদ বোধ হারিয়ে থাকে।

৬. এই যে স্বাধীনতা তারই জন্য অনুভূতির অনুভবকে— সহানুভূতি যার একটা প্রকার বিশেষ— ধরা হয় বস্তু/বিষয়ের অনুভবের তুলনায় উচ্চতর স্তরের। এর পরে আমাদের দেখতে হবে শৈল্পিক উপভোগ আরও উচ্চতর পর্যায়ে পড়ে কিনা। এ কথা প্রায় অবিসংবাদিত যে এর অন্তত কিছুটা সহানুভূতির স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বলা যায় যে বস্তুর সৌন্দর্যকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করছি বলে মনে করি সে সৌন্দর্য বস্তুতেই দেখা যায়, ঠিক যেমন ভীষণ-দর্শন কোনো বস্তুকে দেখে ভয়ের উদ্রেক হয়। প্রশ্ন করা যেতে পারে, এইরূপ উপভোগ এবং সাধারণ ভয়ের মতো বস্তু-সাপেক্ষ অনুভূতির পার্থক্য কোথায় ? পূর্বোক্তটি কী ভাবে উচ্চতর স্তরের, অন্তত সহানুভূতির স্তরের ? প্রথমে বিচার করা প্রয়োজন কেমন করে কোনো অনুভূতির সম-সংবেদন অনুভবের বস্তুকে প্রভাবিত করে। সহানুভূতির ক্ষেত্রে যে বস্তুর অনুভবের প্রতি সমবেদনা জানানো হচ্ছে, সেই বস্তুর ওপর বাস্তবিকই তার কোনো প্রভাব নেই। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কিছুতে ভয় পায় তখন ওই বস্তুর রূপ তার কাছে ভয়ংকর হলেও, যে ওই ভয়ের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে, তার কাছে কিন্তু তা হয় না। সমবেদী যদিও নিজে ওই অভিব্যক্তিকে সেখানে দেখতে পান না, কিন্তু সচেতনভাবে কিছুটা অনুরূপ

জিনিসকে সেখানে প্রক্ষেপ করার চেষ্টা করে থাকেন, কল্পনা করে নেন যেন তাকে তিনি সেখানে দেখতে পাচ্ছেন। যে রূপ বা দৃষ্টিভঙ্গি সচেতনভাবে কল্পনা করা হয়ে থাকে তার সঙ্গে যা আপাতদৃশ্যমান, তার একটা প্রভেদ রয়েছে। দৃশ্য বস্তু নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম অবস্থায় এর বিশেষণ রূপে উপস্থাপিত, অথচ কল্পিত বস্তু বিষয়-বিচ্ছিন্ন রূপে প্রতিভাত, যা বিষয়ের উপর সঞ্চরমাণ বা বিষয়কে অতিক্রম করে প্রোজ্জ্বল। বস্তুত সহ-সংবেদী অনুভূতির স্বাধীনতা বিষয়/বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয় কোনো নির্দিষ্ট বিষয়/বস্তু থেকে অভিব্যক্তির এই বিচ্ছিন্নতার রূপ আশ্রয় ক'রে— অভিব্যক্তি এ ক্ষেত্রে অতল নিরালম্ব অবস্থায় বিরাজিত।

৭. সচেতনভাবে আরোপিত না হলেও শিল্পীসুলভ মানসিকতার কাছে বস্তুর সৌন্দর্য তার গুণ বা বিশেষণরূপে প্রতিভাত হয় না, যেমন কিনা ভীত ব্যক্তির কাছে ভয়ের দিকটা হয়ে থাকে। তার উপস্থাপনা এক চঞ্চল লোকোত্তরী অভিব্যক্তির প্রকাশে-- সমবেদনার ক্ষেত্রে সমবেদ্য বস্তুর উপর সচেতন আরোপের সঙ্গে তা তুলনীয়। সৌন্দর্যকে জ্ঞাতসারে আরোপ করা হয় না বরং ধরে নেওয়া হয় যে তা দেখা যাচ্ছে— এইখানেই বাস্তবিক এক প্রভেদ রয়েছে। কিন্তু সৌন্দর্যকে বস্তুর বিশেষণ বা গুণ রূপে প্রকাশ করা হয় না বলে বস্তু-চেতনার স্বতঃ-ক্রিয়া (reflex) থেকে তা ভিন্ন। এই কারণে নান্দনিক উপভোগকে বস্তু-চেতনার উপরে স্থান দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, সহমর্মিতার উপরের স্তরে তার স্থান কি না।

৮. আমরা দেখিয়েছি যে সহমর্মিতার লক্ষ্য যে বস্তু/বিষয়, তার দ্বারা ওই ভাব যদিও প্রভাবিত হয় না, তবু ওই জাতীয় বিশেষ অনুভূতির দ্বারা তা সীমাবদ্ধ এবং অনুভূতির মূলে যে ব্যক্তি তার দ্বারাও তা প্রভাবিত। সহানুভূতির বেলায় নৈর্ব্যক্তিক ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্নতা এলেও ব্যক্তিগত বিষয় থেকে তা আসে না যদিও যে বিষয়কে কেন্দ্র করে সহানুভূতির প্রকাশ তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু এরকম এক অনুভূতি সম্ভব যা মূলত সহানুভূতির প্রতি সমবেদনাবোধ। উদাহরণস্বরূপ, সন্তানের কষ্টে মাতার অনুভূতির প্রতি কেউ সমবেদনা প্রকাশ করতে পারেন। ঠিক যেমন বস্তুবিশেষের প্রতি কোনো ব্যক্তির অনুভূতির জন্য আমি যখন সহমর্মিতা বোধ করি তখন সেই বোধ ওই বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি অন্য কারো সহানুভূতি যখন আবার আমার সমবেদনা আকর্ষণ করে, তখন ওই প্রথম অনুভূতির কোনো প্রভাব আমার ওপর পড়ে না। এইভাবে সহানুভূতির পুনরাবৃত্তির স্তরে ওই অনুভূতিকে বিচ্ছিন্ন এক হৃদয়াবেগ রূপে কল্পনা করা চলে, নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়রূপে তার বৈশিষ্ট্য থেকে তখন আলাদাভাবে তাকে অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায় যে তার অন্য-নিরপেক্ষ এক নিজস্ব মূল্য রয়েছে। কোনো অনুভূতির প্রতি সহজ সমবেদনার বেলায় অনুভূত বিষয়ে শুরু থেকেই থাকে এক নিরাসক্ত প্রকাশ— নিরাসক্তির জন্যই যাকে অবাস্তব মনে করা হয়। এই পুনরাবৃত্ত সহানুভূতির ক্ষেত্রে বিষয়/বস্তুর প্রকাশ শুধু বিচ্ছিন্নই নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণও বটে ; তার এক সুস্পষ্ট, স্বাধীন, বাস্তব সত্তা রয়েছে, নির্দিষ্ট বস্তু যার এক জাতীয় প্রতীক মাত্র। বিশেষ বিষয়ের থেকে পুরোপুরি বিমুক্ত বলে এর আছে এক প্রকার শাশ্বত বাস্তবতা, এক প্রকৃত চিরন্তন মূল্যবোধ।

৯. সৌন্দর্যকে এইরূপ এক শাশ্বত মূল্যবোধ রূপে মনে করি বলে নান্দনিক উপভোগ এ ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্ত অনুভূতির স্তরের— যা সহানুভূতির প্রতি সহমর্মিতা। বস্তুর সৌন্দর্য যতটা কল্পিত বরং তার চেয়েও অধিকতর মাত্রায় পরিদৃষ্ট ; তাই অনুভবের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা নির্দিষ্ট অনুভবযোগ্য বস্তু অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নয়। একে যে বস্তুর গুণ বা বিশেষণরূপে দেখা যায় না অথচ পাশাপাশি এক ভিন্নতর বস্তু হিসাবেও প্রতিভাত হয় না— এ থেকেই এমন এক বাস্তবতার নির্দেশ মেলে যেখানে বিষয়/বস্তু হয় কোনোভাবে বিশেষণ নয়তো স্বাধীনতা-বিহীন। অবশ্য যেহেতু এ কথা বলার কোনো অর্থ হয় না যে বিষয়/বস্তু সৌন্দর্যের একটি গুণ, তাই বিষয়/বস্তুর বিশেষণত্বকে এক বিচিত্র সম্পর্ক

হিসাবে জানতে হবে— সে সম্পর্ক হল প্রতীকীভূত বিষয় ও প্রতীকের সম্পর্ক, অনেকটা যা তুলনীয় অনুভবের রাজ্যে শব্দ ও তার অর্থের যৌক্তিক সম্পর্কের সঙ্গে।

১০. সাধারণ সহানুভূতি অপেক্ষা নান্দনিক উপভোগ তাই উচ্চতর স্তরের ; ওই সহানুভূতি আবার প্রাথমিক বিষয়ানুভূতির তুলনায় আরও এক উচ্চতর পর্যায়ের সৃষ্টি করে থাকে। শৈল্পিক আবেগকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্ষরিক ভাবে ধরা হয় সহানুভূতির প্রতি সমবেদনা। উদাহরণস্বরূপ, আমি এইরকম কল্পনা করতে পারি যে একজন বৃদ্ধ সস্নেহে তাঁর নাতিকে একটি খেলনা নিয়ে খেলতে দেখছেন। এখানে খেলনাতে শিশুর আনন্দ এবং ওই আনন্দের প্রতি সহানুভূতি-জনিত দাদুর আনন্দের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে, আবার আমার কল্পনার আনন্দ আর-এক পৃথক শ্রেণীর। যদিও শিশুর মতো বৃদ্ধ খেলনায় মগ্ন হয়ে থেকে আনন্দলাভ করেন না, তবু তাঁর অনুভূতি শিল্পসম্মত প্রকৃতির নয়— তখনও পর্যন্ত তা কেবল বিশেষ এক শিশুর অনুভূতি প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত এবং নির্বাচিত আগ্রহ মাত্র। আমার কল্পনা-ভিত্তিক আনন্দের অবশ্য এইরকম কোনো ব্যক্তিগত রঙ নেই। আমি আগ্রহী শিশুটির অনুভূতিতে, যার প্রতিফলন ঘটেছে তার দাদুর হৃদয়ে এক চিরন্তন আবেগানুভূতি অথবা মূল্যবোধরূপে। ওই অনুভূতির সারবস্তুকে উপভোগ করে তার মধ্যে আমি ডুবে যাই এ অনেকটা শিশুর খেলনায় মত্ত হওয়ার মতো যদিও আমি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমার স্বাধীনতাকে হারাই না। আমার অনুভব এবং শিশুর অনুভবের পার্থক্য আর আমি বোধ করি না, যেমন কিনা বৃদ্ধ তাঁর নিজের এবং শিশুর অনুভবের ক্ষেত্রে করে থাকেন। আমার ব্যক্তি-সত্তা যেন অনেকটা দ্রবীভূত হয়ে পড়ে— শিশুর ন্যায় আমি ওই বস্তুটিতে বাঁধা পড়ি না। স্বাধীনতার সঙ্গে আমি তখন হয়ে উঠি নৈর্ব্যক্তিক।

১১. উপরের উদাহরণে আমার নান্দনিক উপভোগ হল অপর এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুভূতি, তাও আবার তৃতীয় কোনো বিশেষ ব্যক্তির অনুভূতির জন্য। কিন্তু যে ব্যক্তিদের জন্য আমার সমবেদনা, তার মধ্যে এক অথবা উভয় জনই কাল্পনিক হতে পারেন। চিন্তা করা যাক এমন এক ক্ষেত্রের যেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাল্পনিক। নান্দনিক দিক থেকে আমি কল্পনা করতে পারি রাস্তায় জনৈক দরিদ্র নিরাশ্রয় বালককে যে আমার কাছে সুন্দর কেবল এক নোংরা শিশু হিসাবে নয়, বরং অন্য কোনো লোকের প্রিয়জন হিসাবে। আমি কল্পনা করে নিই যে ওই শিশুর মা যদি বেঁচে থাকেন, তাঁর কাছে ওই শিশু কতখানি হত। এখানে মা এক কল্পিত ব্যক্তি। যেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কাল্পনিক— এর উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক যে, শিশুটি যখন আর পৃথিবীতে নেই তখনও মা তাঁর শিশুর খেলনাগুলিকে সযত্নে গুছিয়ে রাখেন। ওই খেলনাগুলি তাঁর চোখে সমান মূল্যবান যেন শিশুটি জীবিত অবস্থায় ওইগুলি নিয়ে খেলা করছে। শিশুর অস্তিত্ব এখানে কাল্পনিক হলেও মায়ের হৃদয়াবেগ কিন্তু বাস্তব অথবা ব্যক্তিগত এবং আমার কাছেই তা একমাত্র অস্তিত্বশীল কারণ আমার কল্পনায় ওই আবেগ একটি সুন্দর শিল্পের বিষয়বস্তু। আবার উভয় ব্যক্তিই কল্পিত হতে পারেন যেমন নাটকের কোনো চরিত্রকে যখন কল্পনা করে থাকি। চরিত্রটি এখানে সেই কল্পিত তৃতীয় জন অথবা প্রাথমিক বিষয়ী, কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে সহানুভূতিজ্ঞাপক দ্বিতীয় জনটি কে ?

১২. কোনো বস্তু বা বিষয় সঠিক না কাল্পনিক তা মনে করার পেছনে এক ধরনের পার্থক্য বোধ কাজ করে। প্রথম ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি কল্পনা করছেন তাঁর প্রকৃত অনুভূতির কাছে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যেমন কিনা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কল্পনায় সুস্বাদু খাদ্যের থালা। পরবর্তীক্ষেত্রে আবেগানুভূতি যখন মূর্তি পরিগ্রহ করে তখন তা নিজেই হয়ে ওঠে কাল্পনিক ; বাস্তব অনুভূতিসম্পন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি যে ভাবে কল্পনা করবেন, বিষয়কে সেই অনুযায়ী চিন্তা করা হয়ে থাকে। এখন নাটকের চরিত্রের বেলায় আমি অবশ্য সত্যকারের ব্যক্তি বলে না ভাবলেও সেখানে ধরে নিই যে ওই চরিত্রটিকে প্রকৃত ব্যক্তিরূপে কেউ কল্পনা করে নিয়েছেন এবং এই কাল্পনিক "কোনো একজন ব্যক্তির" প্রতি আমি দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে সহানুভূতি দেখাই। কল্পিত দ্বিতীয় ব্যক্তি কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তি নন,

তিনি যে-কোনো একজন ব্যক্তি মাত্র। ব্যক্তি-বিষয়ক ধারণার একটা সাধারণ মূল্য তাঁর আছে ; এখানে এই ধারণাতে কেবল অনুভূতির প্রকাশ রয়েছে, বুদ্ধির নেই। নান্দনিক অর্থে আমি যখন চিন্তা করি তখন আমার দ্বারা এই ব্যক্তির একটা অনুভব হয়, কিন্তু তা কোনো চিন্তা নয়। অনুভূত ব্যক্তির সাধারণ রূপকে আধা-রূপকথার ভঙ্গিতে বলা হয় "সাধারণ হৃদয়" (Heart universal)। শিল্পের মধ্যে প্রকাশিত প্রত্যেকটি অনুভূতিই এই "সাধারণ হৃদয়ে" প্রতিফলিত অথবা এর দ্বারা সহানুভূত এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এই অনুভূতি সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করেন তখন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বা একান্ত নিজস্ব হৃদয়কে এই সর্বব্যাপ্তির সঙ্গে একাত্ম করে নেন। শৈল্পিক উপভোগ কেবলমাত্র উপভোক্তার স্বার্থে উপভোগ নয়— এর মধ্যে রয়েছে আত্মসচেতনতার বিসর্জন এবং সেইসঙ্গে যে অনুভূতির আস্বাদন করা হয়— অর্থাৎ যা তৃতীয় ব্যক্তির অনুভূতি, তাকে বিশেষ ব্যক্তির প্রসঙ্গ থেকে বিযুক্ত করে ওই সাধারণ হৃদয়ের মধ্যে এক শাশ্বত মূল্য দান।

১৩. প্রাকৃতিক বস্তুর সৌন্দর্য আস্বাদনের বেলায় কি আমরা এই জাতীয় ত্রি-ব্যক্তিক বা ত্রি-স্তরীয় অনুভূতির (চিন্তামূলক, সহানুভূতিমূলক এবং প্রাথমিক) পরিকল্পনা বজায় রাখতে সক্ষম হই ? এখানেও আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তিকে কাল্পনিক ধরতে পারি যা বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে এক অলক্ষ্য ব্যবধান গড়ে তোলে। কেবল এখানে এই তৃতীয় জন স্মৃতি থেকে লুপ্ত, বিশেষ কোনো কল্পিত ব্যক্তি নয়, যে-কোনো ব্যক্তিই সেখানে উদ্দিষ্ট— অনেকটা পূর্বোক্ত নাটকের চরিত্রের মতো। যখন কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তারিফ করি, তখন প্রথমত কল্পনা করে নিই এক বিশেষ প্রাথমিক অনুভূতির— যেমন আনন্দ, দুঃখ অথবা ভয়— যা নির্ভর করে বিষয়ের আনন্দময়, বেদনাঘন অথবা শঙ্কাজনক প্রকাশের উপর। এ অনুভূতি জনৈকের অনুভূতি, অনির্দিষ্ট তৃতীয় ব্যক্তির অনুভূতিরূপে কল্পিত। পূর্বে-বর্ণিত দ্বিতীয় ব্যক্তির ধারণার প্রকৃতির মতো তা এখানে অনির্দেশ্য, অনুভবযোগ্য বা চিন্তনীয় নয়। এর তাৎপর্য হল যে তৃতীয় ব্যক্তি আমার সম্পর্কে উদাসীন, আমি তার প্রকৃতিতে যতটা, তার থেকে তার ব্যক্তিস্বরূপে কম আগ্রহী। এই অনুভূতিকে পরবর্তী পর্যায়ে আদর্শায়িত করা হয় এইভাবে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা তা অনুভূত অথবা ওই ব্যক্তির "সাধারণ হৃদয়ে" তা প্রতিফলিত। শেষে আমি অর্থাৎ প্রথম জন ওই আদর্শায়িত অনুভূতিকে আমার প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে দেখি।

১৪. এ কি শুধুই এক কৃত্রিম বিশ্লেষণ ? আমরা দেখিয়েছি যে বস্তুর/বিষয়ের সৌন্দর্য কেবল একটা তথ্য নয়, এ হল বস্তু/বিষয়ের একটি গুণ (যেমন বর্ণ), কিন্তু এর একটা প্রকাশ বা মূল্য রয়েছে। অবশ্য এই প্রকাশ প্রাথমিক অনুভূতির স্বতঃক্রিয়ার মতো নয়, একে বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম বা এর বিশেষণ রূপেও দেখা যায় না— এ যেন উপরের স্তরে সঞ্চরমাণ অথবা অতিশায়ী কোনো জ্যোতিতে ভাস্বর। সেইসঙ্গে সমবেদনার স্বতঃপ্রকাশ রূপে তা নিরালম্বভাবে উপস্থাপিত হয় না ; নান্দনিক অনুভূতির কাছে এর এক যথার্থ শাশ্বত মূল্য রয়েছে। কোনো বিষয়ের সৌন্দর্য বলতে বোঝায় তিনটি বৈশিষ্ট্যকে, যা নিছক বহিরঙ্গ তথ্য থেকে পৃথক— এগুলি হল, প্রকাশ, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং শাশ্বতভাব। এই তিনটিকে বিষয়ের মধ্যে বোঝা যায় যথাক্রমে প্রাথমিক অনুভূতি, সমবেদনামূলক অনুভূতি এবং মননধর্মী অনুভূতির প্রক্ষেপরূপে। এই অনুভূতিগুলিকে তিনজন ব্যক্তির অনুভূতি হিসাবে বুঝতে হবে, অবশ্য একই ব্যক্তির মধ্যেও সব-কয়টি থাকতে পারে— যেমন, একই সময়ে নান্দনিক উপভোক্তার কাছে তিনটি ভিন্ন আবেগস্তর। যেহেতু অনুভূতির শেষ স্তরে অন্যদুটিও অনুস্যূত তাই আমরা নান্দনিক উপভোগকে কেবল বহু অনুভূতির অন্যতম রূপ হিসাবে দেখি না, বরং দেখি একে এক সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতিরূপে।

১৫. রসের উপলব্ধি অথবা নান্দনিক তাৎপর্যকে সম্পূর্ণভাবে আবেগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়— বৌদ্ধিক ধারণা বা আদর্শের একেবারে উল্লেখ না করেও। নান্দনিক অর্থে আনন্দের স্থান বা তাৎপর্য আমরা নির্দেশ করেছি— অনুভূতির স্তর বা পর্যায়ের ঠিক কোন্‌খানে এর স্থান তা নির্ণয় ক'রে। ভারতীয় ধারণার বিশিষ্ট স্বাদ ঠিক কোথায় তার আরও কিছুটা বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। নান্দনিক উপভোগকে

শুধুমাত্র তত্ত্ব বা তথ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত বলেই মনে করা হয় না ; একে দেখা হয় এক শাশ্বত মূল্যবোধের উপলব্ধি রূপেও, স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নান্দনিক তাৎপর্যের সঙ্গে একাত্ম রূপে। ঠিক কী অর্থে এই উপলব্ধি অথবা একাত্মতাকে বোঝা যায় ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের সর্বাগ্রে প্রাথমিক অনুভূতি এবং সমবেদনার কয়েকটি দিক নিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

১৬. আমরা উল্লেখ করেছি যে প্রাথমিক অনুভূতির বেলায়, যেমন কোনো বস্তু বা বিষয়কে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপভোগের ক্ষেত্রে, অনুভব এবং অনুভূত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে যায় ; বস্তুর তখন প্রকাশ ঘটে এবং অনুভূতির ব্যক্তি-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তবুও বস্তু-নিমগ্ন অনুভূতির যে ভ্রান্ত ঐক্যবোধ, তা দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। একটি হল নৈর্ব্যক্তিক, অপরটি ব্যক্তিসাপেক্ষ। নৈর্ব্যক্তিক দিকে আত্মবোধের অবসান হয়, বিষয় কেবল পরিলক্ষিত হয় তার প্রকাশের বিশেষণরূপে। কিন্তু বিষয়ীর পক্ষে পরিলক্ষ্যের অথবা নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবের কোনো প্রয়োজন নেই ; সে তার অনুভবের মানসিকতা বজায় রাখলেও পরিলক্ষিত বিষয় তার নির্দিষ্টতা হারিয়ে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়— অনেকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট জগৎ যেমন মৃদু আলোয় ভাসতে ভাসতে বিলুপ্তির আড়ালে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। এ হল ব্যক্তিগত দিক। বিষয়ী আত্মবিস্মৃত হওয়ার পরিবর্তে আমরা এখানে দেখি বিষয় ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে বিলুপ্ত হচ্ছে। একে বুঝতে হলে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আয়ত্তাধীন কোনো বিষয়কে অনুভবের চেষ্টা এবং তার প্রকৃত অনুভবের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? যখন কোনো ব্যক্তি কেবল অনুভবের চেষ্টা করেন তখন বাস্তবিকপক্ষে অনুভূতির শুরু হলেও সর্বদাই এইরকম একটা বোধ থাকে যে অনুভব শেষপর্যন্ত সম্ভব নাও হতে পারে। এই অনিশ্চিতির অভিজ্ঞতাই প্রাথমিক স্তরে অনুভূতির অবাস্তব চরিত্রটিকে গঠন করে। সার্থক উপভোগের জন্য বিষয়কে নিজের অনুভূতিতে দ্রবীভূত করতে হলে এই অবাস্তব অনুভবের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। এখানে অনুভব ব্যক্তি সাপেক্ষে বাস্তব-বিষয়কে গ্রাস করেই এর অস্তিত্ব।

১৭. বিষয়ানুভূতির দুই দিকের অনুরূপ দুই জাতীয় সহানুভূতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। যদিও সহানুভূতির বেলায় সহানুভাবক (যে সহানুভূতি প্রদর্শন করে) এবং সহানুভূত (যে ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়)— এদের মধ্যে পার্থক্য কখনও নষ্ট হয় না, দুজনে শুধুই পাশাপাশি বিরাজ করে না। সমবেদী, হয় অপর ব্যক্তির হৃদয় দিয়ে অনুভব করে অথবা নিজের হৃদয়ের মধ্যে অপর ব্যক্তিকে অনুভব করে। প্রথম ক্ষেত্রে আমি অন্য ব্যক্তির জন্য অনুভব করি, মনে করি যে তার থেকে আমার বিযুক্ত থাকাটা অন্যায় হবে, নিজেকে ভুলতে চেষ্টা করি, এমন ভাবে অনুভব করি যেন আমিই সেই অনুভবকারী অন্য ব্যক্তি যার সঙ্গে এক অর্থে আমি একাত্ম। পরবর্তী ক্ষেত্রে যতক্ষণ অন্য ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র মনে করা হয় ততক্ষণ তার প্রতি আমার সহানুভূতি অবাস্তব এবং তার অনুভূতি কেবল এমন একটা বিষয় যা আমি নিজের বলে বোধ করতে পারি না। প্রথম ক্ষেত্রে আমি বিচ্ছিন্নতার বিরোধী, অপর ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্যের। উভয় ক্ষেত্রেই আমি স্বাধীনতা লাভে আগ্রহী— প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটিয়ে, নিজেকে বাইরে মেলে ধরে এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে আত্তীকরণ ঘটিয়ে, ভিতরে আকর্ষণ করে, তার অনুভূতিকে নিজের বলে মনে করে। এই অনুসারে আমরা এই দুই জাতীয় সহানুভূতির একটিকে বলতে পারি বিস্তারমূলক এবং অপরটিকে একাত্মধর্মী।

১৮. অনুরূপভাবে নান্দনিক উপভোগের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে অভিন্নতার দুটি বিকল্প পথ রয়েছে— বিস্তার বা সৃজনধর্মী এবং একাত্মধর্মী বা সূক্ষ্মতামূলক। বস্তু/বিষয়ের মধ্যে যা উপভোগ করা হয় তা হল তার সৌন্দর্য, যাকে আমরা গ্রহণ করেছি এক শাশ্বত স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্য হিসাবে— এই মূল্যের সঙ্গে বিষয়/বস্তুর সম্পর্ক প্রতীক রূপে। নান্দনিক ক্ষেত্রে এই প্রতীকায়নের কাজ দুধরনের। বস্তু/বিষয় অর্থাৎ প্রতীক নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতি বজায় রাখতে সক্ষম এবং মূল্যকে প্রকাশ করা সম্ভব বিষয়োত্তর তাৎপর্যরূপে, অথবা এর বস্তু-চরিত্র নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য প্রতীকায়িত হয় এক

সূক্ষ্ম ভাবের আকারে, স্বপ্নের মতো হৃদয়াকাশে যা স্থান কালের গন্ডির বাইরে ভাসতে থাকে। উপভোক্তা উভয়স্থলেই শাশ্বত মূল্যবোধের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেন। কিন্তু প্রথম স্থলে বস্তু/বিষয়ের মধ্যে তিনি অবাধে প্রবেশ করেন এর অনচ্ছতা অতিক্রম করে এবং নিজেকে দেখেন এর আত্মারূপে, এর বাস্তবতার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ; অন্যস্থলে তিনি বস্তু/বিষয় থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নেওয়ায় তা দ্রবীভূত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়— এর কঠিন বহিরাবরণ তখন শিথিল হয়ে স্খলিত হয়ে পড়ে— মনে হয় যেন এর বিমুক্ত আত্মাকে অনুভব করা যাচ্ছে এবং উপভোগের সঙ্গে তা একাত্ম হয়ে গেছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুভব এক নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার— বিষয়ের সঙ্গে অবিজড়িত এক মূল্যবোধে বিবর্তিত। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিষয়ীর বিযুক্তি কোনো অবাস্তব অনুভূতির সূচনা করে না ; মূল্যবোধ বা বিষয়ের প্রাণকেন্দ্রকে টেনে এনে ধীরে সুস্থে উপভোগ করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে সংস্পর্শ সত্ত্বেও স্বাধীনতা রয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উপভোগ সম্ভব।

১৯. ভারতীয় শিল্পকলা মূলত সূক্ষ্মতামূলক অথবা প্রকৃতিগতভাবে মননধর্মী— এর চরিত্র গতিময় সৃজনাত্মক নয়। ভারতীয় শিল্পতত্ত্বে যে নান্দনিক তাৎপর্যকে বিষয়ীগত পরমতত্ত্ব অথবা রস রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে তা নৈর্ব্যক্তিক পরমতত্ত্ব অথবা সৌন্দর্য নয়।

সুন্দর এবং কুৎসিত

২০. সুন্দর এবং কুৎসিতের অনুভূতির পার্থক্য আগের অংশে দেখাই নি। এই দুই ধরনের অনুভূতি যে এক সাধারণ মান বা পর্যায়ে পড়ে তখন তাই নিয়েই প্রধানত ব্যস্ত ছিলাম। বর্তমান অংশে আমার চেষ্টা হবে কুৎসিতের অনুভূতির বিশেষ চরিত্রটিকে তুলে ধরার এবং কুৎসিতের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল নান্দনিক মূল্যবোধকে ব্যাখ্যা করার।

২১. পূর্ববর্তী অংশের মতো এখানেও আমি সেই প্রশ্নটি বাদ রেখেছি যে বিষয়ের মধ্যে কী থাকলে তাকে সুন্দর অথবা কুৎসিত আখ্যা দেওয়া যায়। আকারগত বৈশিষ্ট্য যেমন অনুরূপতা বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য— যেগুলিকে সচরাচর সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী বলা হয়ে থাকে— সেগুলি যে শুধুমাত্র সংজ্ঞার প্রয়োজনে অ-পর্যাপ্ত, তাই নয়, এগুলিতে এক নান্দনিক বোধের পূর্বানুমান থাকে যা থেকে এর বিশেষ অর্থ প্রতীয়মান হয়। একটা কথা হল, সৌন্দর্যের একটি প্রধান উপাদান বিষয়ীর চেতনায় তার সংযোগ। সেখানে নৈর্ব্যক্তিক আকারগত উপাদানই সব কথা নয়। এ ছাড়া আনুরূপ্য অথবা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বলতে কী বোঝায় ? যে-কোনো জ্যামিতিক সর্বসমতা তো সুন্দর নয় ; কোন্ বিশেষ সর্বসম আকার সুন্দর তা নির্ভর করে শিল্পীর স্বতঃজ্ঞানের (intuition) উপর এবং তার পূর্বশর্ত হল শৈল্পিক চেতনা। অনুরূপভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য : এর সবখানি নির্ভর করে ঐক্যজ্ঞাপক বলে শিল্পী কী বোধ করছেন তার উপর। সাধারণভাবে বহিরঙ্গ প্রকৃতি, যা কিনা শিল্পীর বিশেষ বোধ বা চেতনা থেকে ভিন্ন, তা কোনো অর্থই বহন করে না। কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে কোনো কোনো আকারকে সবসময় সুন্দর বলে মনে হয়। এটা অবশ্য প্রকরণের ব্যাপার, যা বিশেষ শৈল্পিক অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়। সেইজন্য আমার কাছে সৌন্দর্যের নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতি বিষয়ে সাধারণ তাত্ত্বিক আলোচা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এর অর্থ এই নয় যে বিষয়ের মধ্যে নান্দনিক অনুভূতি-নির্ণায়ক কোনো কিছুর অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করছি। বস্তুত আমি বিশ্বাস করি যে নান্দনিক মনোভাব স্বয়ং সুন্দর বা কুৎসিতের সৃষ্টি করে না, কেবল তাকে আবিষ্কার করে মাত্র। সেইসঙ্গে আমার ধারণা এই যে, একজনের কাছে কোনো বিষয় যখন আকর্ষণীয় মনে হয় না, তখন ওই একই বিষয়ে, অপর কোনো ব্যক্তি, যার মধ্যে আগে থেকেই সেই মনোভাব রয়েছে, নান্দনিক মূল্য খুঁজে

পেতে পারেন। এমন বিষয়ও আছে যা জোর করে, সকলের না হলেও অনেকের চিত্তে, এই ভাব সঞ্চার করতে সক্ষম। একই সঙ্গে আমি এই মত পোষণ করি যে নান্দনিক অনুভূতি ছাড়া কোনো নৈর্ব্যক্তিক নান্দনিক গুণকে আবিষ্কার করা যায় না। অর্থাৎ নিছক বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুসন্ধান নয়, একমাত্র এই জাতীয় অনুভূতির সাহায্যেই আমরা বিষয়/বস্তুর সৌন্দর্য অথবা কদর্যতাকে বিশ্লেষণ করতে পারি। এই বিশ্লেষণ আবার বিশেষ স্বতঃজ্ঞানের আকারে কেবল আংশিক ভাবেই করা চলে, কোনো নৈর্ব্যক্তিক সূত্রের সাহায্যে একে নিঃশেষে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং পূর্ববর্তী অংশের মতো এখানেও আমি মানসিক ধারণার বিশ্লেষণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব।

২২. সকল প্রকারের অনুভূতি বলতে বোঝায় বিষয় ও বিষয়ীর একাত্মতা ; বিষয়ের চিন্তাকে বিষয়ানুভূতি থেকে পৃথক করা যাক। প্রথমোক্তটির তাৎপর্য হল বিষয় থেকে বিযুক্তি, আর পরবর্তীটি হল এর সঙ্গে অভিন্নতা। চিন্তার ক্ষেত্রে এই সংযোগ বা অভিন্নতা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে, আবার অনুভূতির বেলায় এই বিচ্ছিন্নতা এক শূন্যতা অথবা বিষয়ীর অপ্রাকৃত অবস্থাকে বোঝায়। যখন তা বিষয়ে পূর্ণ তখন বিষয়ী তাকে বাস্তব বলে বোধ করে, বিষয় তখন তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত বা একাত্ম। যা চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর তা কিন্তু অনুভূতিতে প্রকৃত একাত্মতা।

২৩. সকল অনুভূতিতেই বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতার বোধ হয়ে থাকে। বিষয় থেকে স্বাতন্ত্র্যেরও কি কোনো বোধ জন্মে ? প্রাথমিক অনুভূতির স্তরে তা হয় না। বাস্তবিক এক অর্থে বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্যবোধই বেদনার অনুভূতি, কিন্তু প্রাথমিক অনুভূতির স্তরে খুব স্পষ্টভাবে এই পার্থক্যের প্রতীতি হয় না। সমবেদনামূলক অনুভূতির স্তরে সহানুভূতির বিষয় থেকে পার্থক্যের ব্যাপার বাইরে থেকে স্পষ্ট বটে কিন্তু প্রাথমিক অনুভূতির স্তরে একাত্মতা বজায় থাকে। এই অবস্থায় দু ধরনের মনোভাবের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় না : একাত্মতাবোধ এখানে শুধুই অনুস্যূত এবং বহিরঙ্গ পার্থক্যানুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিজড়িত। চিন্তামূলক অনুভূতির রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যের বোধ উভয়ই সুস্পষ্ট। বিষয়ী স্বাধীনভাবে বিষয়ের সঙ্গে মিলিত হয় এবং বিষয়ের একটা প্রবণতা থাকে বিষয়ীর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার। এইটাই অভিন্নতা। বিষয় এক নির্দিষ্ট প্রকাশের মধ্যে, একধরনের নৈর্ব্যক্তিক মনের মধ্যে আদর্শায়িত হয় এবং বিষয়ী বিষয়কে সম্পূর্ণ আত্মস্থ ক'রে আনন্দের মধ্যে বাস্তবতা বোধ করে। সেইসঙ্গে ঐক্যবোধের ব্যাপারটাও চলতে থাকে। সেখানে বিষয়ের সেই দিকগুলিই জেগে থাকে যা পূর্ণ তথ্য হিসাবে আদর্শের গণ্ডিতে বদ্ধ নয়। সব সময় এইরকম একটা বোধ থাকে যেন যে আনন্দের সূত্রপাত হয়েছে তাকে উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই যে উপভোগের অক্ষমতা-বোধ (যা কোনো আদর্শ-নিষ্ঠ তথ্য নয়) তা হল বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্য। তখনও পর্যন্ত তা নান্দনিক স্তরের অনুভব, কারণ যে ঐক্য ইতোমধ্যে অনুভূত তা আদর্শায়ন বা উপভোগ ব্যতীত এর সৃষ্টি হত না।

২৪. যদি এই অভিন্নতাবোধকে উপভোগ আখ্যা দেওয়া যায় তবে ভিন্নতাবোধকে বেদনা বলে ধরতে হয়। কারণ দুধরনের অনুভূতিই শৈল্পিক বা মননের স্তরে রয়েছে। এখন উপভোগ ও বেদনা শুধুই পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না, একে অপরের অধীন— এই অধীনতা অনুভূতির রাজ্যে এক অনন্য সম্পর্ক। বেদনা যখন উপভোগের অধীন, তখন আমাদের সৌন্দর্যচেতনা হয়। যখন উপভোগ বেদনার অধীন, তখন আসে কুৎসিতের এবং তার সমগোত্রীয়ের ধারণা।

২৫. দুঃখ-চেতনার শিল্পগত দিক নিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। কোনো বিয়োগান্তক কাহিনী ভালোভাবে বর্ণিত হলে তা চোখে জল আনে বটে কিন্তু তবু এ থেকে এক রমণীয় উপভোগও আসে। এখানে বেদনা উপভোগের অধীন। বেদনা-বোধ প্রকাশ্যে তখনও থাকে এবং বস্তুত সেই অনুভব আরও নিবিড় যদিও প্রথম পর্যায়ে বিষয়ীর তুলনায় সে অনুভব হয়তো তীব্রতর নয়। ওই পর্যায়ে বিষয়ীর কাছে দুঃখের মধ্যেও কিছু কিছু ভাবান্তর আসে— প্রায়ই দুঃখানুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অনুভূতির

এমন সংমিশ্রণ ঘটে যে সে নিজেও তা স্বীকার করতে লজ্জিত বোধ করে। কিন্তু মনন-ধর্মী বিষয়ী শুদ্ধ সর্ব উপাধি-বর্জিত দুঃখের মধ্যে আত্মনিমগ্ন থাকে। এর অর্থ এই নয় যে শুধুই সে দুঃখচেতনার অনুধ্যান করে এবং তার বস্তুগত পরিমণ্ডল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী থাকে। এ সম্ভব হত একমাত্র যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্মায়নের বেলায়। পরিমণ্ডলের চিন্তা তার আছে, সেইসঙ্গে আছে সেই পরিস্থিতিও যা তার অনুভূতি সঞ্চার ক'রে তাতে মূল্যবোধের সংযোজন ঘটায়। এখানে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এবং পরিবেশের পার্থক্য যদিও রয়েছে, সে পার্থক্য অনেকটা অগ্নিশিখা এবং তার দীপ্তি বা বিচ্ছুরিত আলোকের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু দুঃখের বেলায় মূল বিষয়ীর নিকট কেবল দুঃখ এবং তার নান্দনিক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশই উপস্থাপিত হয় না, অন্য সকল অনুভূতি এবং সেইসঙ্গে তার পরিবেশটিও চলে আসে যার সঙ্গে দুঃখবেদনার সুরের কোনো মিল নেই। আমি এগুলিকেই বলেছি 'উপাধি'। নান্দনিক অর্থে উপভোক্তা যখন দুঃখের বেদনাদায়ক অনুভূতি চিন্তা করেন তখন তা এই জাতীয় উপাধি-বর্জিত। কোনো ব্যক্তির পক্ষে নান্দনিকভাবে দুঃখের উপলব্ধির অর্থ দুঃখকে অনুভব করা, চিন্তা করা নয়। যদিও একে এক শুদ্ধ শাশ্বত মূল্য হিসাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে, যেমন কিনা ব্যক্তি নিজেও অনুভব করতে পারে না। আমি অনুভবের বিশিষ্ট অধিকারী বলছি এই কারণে যে যদিও মূল দুঃখী ব্যক্তির অপেক্ষা যিনি তা নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁর কাছে এক মহত্তর অথবা গভীরতর বেদনাবোধ (যদিও তা তীব্রতর নয়) রয়েছে, তবু প্রথমোক্ত জনের ন্যায় শেষোক্ত জন তাঁর স্বাধীনতা হারান না। বরং অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও তাঁর নিজের কাছে বেদনার মধ্য দিয়ে যে ভাব আসে তা যেন অধিকতর বাস্তব। সুতরাং যেখানে শিল্পগতভাবেও বেদনার উপলব্ধি ঘটে না, সেখানেও এটা কোনো বর্জনীয় অশুভমাত্র নয়, এর পবিত্রতা ও গভীরতার একটা নিজস্ব ভাবগত মূল্য রয়েছে।

২৬. কিন্তু দুঃখের শিল্পীসুলভ মনন এক উপভোগ বিশেষ। দুঃখ এখানে সুগভীর বেদনারূপে অনুভূত হলেও তখনও তা উপভোগের বস্তু থাকে এবং এই অর্থে তা এর অধীন। অনুভূত বস্তু হিসাবে তা উপভোগের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে এতেই রূপান্তরিত হয়ে যায়। মননমূলক অনুভবের ক্ষেত্রে এটা তখনও স্বতন্ত্র। উপভোগের মধ্য দিয়ে দুঃখের শুদ্ধ অনুভব হতে থাকে। এই যে অন্তঃস্থ বা অধীনস্থের সম্পর্ক তাকে কেবল অভিজ্ঞতার বিষয় হিসাবেই গ্রহণ করা চলে। বিশদভাবে একে শুধু ব্যাখ্যা করা যায়, এর সঙ্গে বিরোধ অসম্ভব। সেই কারণে যে-কোনো ধরনের প্রাথমিক অনুভূতি বিশুদ্ধ উপভোগের বিষয় এবং এর অধীনস্থ। যেখানে প্রাথমিক অনুভূতি নিজেই একজাতীয় উপভোগ, সেখানে তার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে চিন্তনধর্মী অনুভূতিতে, সে বিলুপ্তি অধীনতার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

২৭. কিন্তু যে-কোনো অনুভূতি যদিও নান্দনিক অর্থে আনন্দের তুলনায় নিম্নস্তরের, তবু সর্বক্ষেত্রে এটা হওয়ার প্রয়োজন নেই। সেটা নির্ভর করে বিষয়ীর দিক থেকে কত গভীর শৈল্পিক উপলব্ধি ঘটেছে তার ওপর। আমার বিশ্বাস, শিল্পচেতনা সকল প্রকার অনুভূতিকে গ্রাস করতে বা আত্মস্থ করতে সক্ষম। অধিকাংশ অনায়ত্ত অনুভূতিকে তা নিজের আয়ত্তে আনতে পারে, সব বেদনাদায়ক অনুভূতিকে উপভোগে রূপান্তর ঘটাতে সমর্থ। বস্তুত বহুক্ষেত্রে তা প্রদত্ত অনুভূতিতে পরিবর্তন ঘটায় না বা ঘটাতে অপারগ— হয় সেই শক্তি নেই বলে, নয়তো চিত্তের যে স্বচ্ছতা এর জন্য আবশ্যক তার অভাবে। শৈল্পিক অনুভূতি প্রকাশ করে ভাবের এক নতুন গভীরতা। প্রাথমিক অনুভূতি বা সহানুভূতির স্তরের তুলনায় চিন্তার স্তর আরও গভীরে। কিন্তু চিন্তনের স্তরেও বিভিন্ন গভীরতা রয়েছে এবং কোনো প্রাথমিক অনুভূতি এক স্তরের শৈল্পিক চেতনায় অপরিবর্তিত থাকলেও অন্য গভীরতর স্তরে গিয়ে আনন্দে রূপায়িত হতে পারে। যেখানে কোনো প্রাথমিক অনুভূতি নান্দনিক মনোভাবের সাহায্যে পরিপক্ক হয় না, সেখানে আনন্দের মানসিকতা থাকলেও তা ওই অনুভূতির অধীন অবস্থায় থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে উপস্থাপিত অনুভূতি হল বেদনার, যা থেকে উদ্ভূত হয় এক ভিন্ন ধরনের নান্দনিক

আনন্দানুভূতির। তাই সদ্য-আলোচিত দুঃখ নিয়ে যখন শিল্পভাবনা করা হয় তখন বেদনা থেকে জন্ম নিলেও দুঃখ উপস্থাপিত হয় এক ভিন্নতররূপে। কিন্তু সেখানে বেদনা আনন্দের বিষয় আর এ ক্ষেত্রে আনন্দ বেদনার বিষয়। নান্দনিক মনোবৃত্তির আনন্দ এখানে নিজেই এক যন্ত্রণা যা বেদনাকে এক নতুন মূল্য দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বেলায় বেদনা বিরক্তির আকার ধারণ করে না। এই অর্থে আমি উপভোগকে বেদনার অধীন হিসাবে বুঝি। যখন কোনো নান্দনিক অনুভূতি প্রাথমিক অনুভূতিকে আত্মস্থ করতে অক্ষম হয়ে তার অধীন হয়ে পড়ে তখন তা এক কুৎসিতের বোধে পর্যবসিত হয়। কুৎসিতের এই অন্তর্নিহিত অর্থকে আবিষ্কার করতে হবে। এখানে প্রাথমিক অনুভূতি নান্দনিক চেতনার কাছে উপস্থাপিত হয়। তার অর্থ এর তখন উত্তরণ ঘটে মননের স্তরে, যা সবরকম উপাধি-বর্জিত রূপে এক পবিত্রতায় উন্নীত হয়ে সব-কিছু থেকে স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক অথবা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিষয় সুন্দরও থাকে না, কুৎসিতও নয়। একমাত্র যখন একে নান্দনিক অর্থে চিন্তা করা হয় তখনই তা সুন্দর অথবা কুৎসিত রূপে প্রতীয়মান। এইভাবে চিন্তা করলে ঘটনা নেপথ্যে চলে গিয়ে প্রাথমিক অনুভূতিজনিত প্রকাশ অথবা মূল্য স্ফুটতর হয়— পূর্ববর্তী অংশে বর্ণিত সহানুভূতিকে দুই মাধ্যমে দেখার মতো। নান্দনিক চেতনার কাছে উত্থাপিত প্রাথমিক অনুভূতি এইভাবে মননধর্মী অনুভবে নিজেকে রূপান্তরিত করে।

২৮. এর পরে যে নান্দনিক চেতনার কাছে তা উত্থাপিত হয় তার সঙ্গে মননধর্মী অনুভূতির একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নান্দনিক চেতনা হল নিজেই আনন্দ, শুধুমাত্র আনন্দের প্রত্যাশা নয়। আনন্দময় প্রত্যাশা অপেক্ষা করে থাকে সেই বিক্রিয়ার জন্য যার দ্বারা এক নতুন আনন্দানুভূতির অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু সেই বিক্রিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী নাও হতে পারে। নতুন অভিজ্ঞতা অনায়ত্ত হলে আনন্দময় প্রত্যাশা তিক্ততা বা বিরক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে ওই অনায়ত্ত অভিজ্ঞতায় এক অতিরিক্ত বেদনাদায়ক মূল্য সংযোজন করে যা বিকর্ষণধর্মী বা বিরক্তিকর। চিন্তনধর্মিতায় অভিজ্ঞতা স্বয়ং বিকর্ষক না হতে পারে, একমাত্র তখনই তা হয় যখন আনন্দের প্রত্যাশাটুকুও ব্যর্থ হয়।

২৯. যখন এইভাবে চিন্তনের স্তরে বিকর্ষণ ঘটে তখন নানা বিকল্প পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চেতনা নিজেকে রক্ষা করে চলে। চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে এনে এক স্বাভাবিক ব্যবহারিক মানসিকতা সোজাসুজি ফিরিয়ে আনা যেতে পারে অথবা এমন হতে পারে যে চেতনা চিন্তনের পর্যায়ে থাকলেও শৈল্পিক অনায়ত্ত অভিজ্ঞতাকে পাশ কাটিয়ে এমন এক চিন্তন স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়, যেখানে তা শৈল্পিক আখ্যা পাওয়ার মতো নয়। শৈল্পিক মনোবৃত্তিতে প্রথম যাকে গ্রহণ করা হল এক অনাকাঙ্ক্ষিত আনন্দধ্বংসী রূপে, তাকে দার্শনিক অথবা ধর্মীয় চিন্তায় মণ্ডিত করা যায়। নান্দনিক প্রত্যাশা হয়তো পেছনে পড়ে গেল কিন্তু জগতের বীভৎসতায় চেতনা আচ্ছন্ন হল। সাধারণ চেতনা তো এতটা শৈল্পিক নয় যে এক অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো বীভৎসতা সহ্য করার পক্ষে তা যথেষ্ট। বিকর্ষক অভিজ্ঞতাকে ঝেড়ে ফেলতে অথবা নিঃশঙ্ক প্রেমের বিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতা দিয়ে তাকে আনন্দে রূপান্তরিত করতে তা পারে না। তবু এমন চেতনাও আছে যেখানে আনন্দ এত গভীরভাবে অনুস্যূত যে বিকর্ষক অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাকে ধ্বংস করা যায় না। যার শৈল্পিকতা এতখানি শক্তিশালী যে বীভৎসতা উপস্থাপিত হলেও তাকে এক বিচিত্র পরম সৌন্দর্যে বিবর্তিত করতে সক্ষম। নান্দনিক চেতনা কদর্যতার অনুভূতিকে দুভাবে জয় করতে পারে। প্রথমত, হাস্যরসে রূপান্তর ঘটিয়ে— যার মধ্যে রয়েছে নিজেকে বিযুক্ত করার অথবা বিকর্ষক অভিজ্ঞতাকে ঝেড়ে ফেলার আনন্দ। কুৎসিতের অনুভূতি নিজেই এক চিন্তনধর্মী অনুভূতি কিন্তু শিল্পচেতনা গভীরতর স্তর আশ্রয় ক'রে এক মহত্তর ঔদাসীন্যের মনোভাবে পরম প্রশান্তিতে সেই কুৎসিতের চিন্তা করতে পারে। এই প্রশান্ত মানসিকতা আসে হয় সংস্পর্শ এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখার জন্য, নয়তো একে উড়িয়ে দিতে পারার শক্তির সচেতনতায়। আমি বলতে চাইছি, হাসির সেই বিস্ফোরক শক্তির কথা, যা হাস্যরসকে দুই দিকে নিয়ে চলে।

কুৎসিতের মোকাবিলা করার অপর নান্দনিক মনোভাব হল, যাকে আমি নির্ভীক প্রেমের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস বলে চিহ্নিত করেছি। শিল্পকলার জগতে কুৎসিতের সুন্দরে রূপান্তর ঘটানোর ব্যাপারটা সুপরিচিত। বস্তুত এর সাহায্যেই শিল্পের শিক্ষা সম্ভব হয়েছে। শিল্পী ছাড়া আর কেউ হয়তো এই মিথ্যা অভিমানের বেশি নিন্দা করবে না। আপাতকুৎসিত বিষয়কেও সুন্দর হিসাবে প্রতীয়মান করতে পারার জন্য রুচিকে শিক্ষিত করার প্রয়োজন অস্বীকার করে যে অভিমান, তা দুর্ভাগ্যবশত আজকের দিনে বড়োই সাধারণ। এই যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রত্যয় তা হল এক নান্দনিক প্রচেষ্টা যার সাহায্যে কুৎসিতের অনুভূতিকে উপভোগের গভীরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, এর সাহায্যে অসীমের প্রেক্ষাপটে আপাতকুৎসিতের মধ্যে সৌন্দর্যের উপলব্ধি করা যায়। এই প্রচেষ্টায় কুৎসিত যদিও কুৎসিতই থাকে তবু এক প্রত্যাশিত আনন্দের শিহরনে তা কম্পিত হয়, এক অস্ফুট সৌন্দর্যের আভাস তাতে মেলে। যখন নান্দনিক বিশ্বাস ক্রান্তদর্শন এবং প্রাপ্তিতে রূপায়িত হয় তখন চিরঞ্জয়ী সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে— যার মধ্য দিয়ে কুৎসিতেরও উত্তরণ হয় উপভোগের বিষয়ে। কুৎসিতের মধ্যে উপভোগের এই স্ফুরণকে ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব সাহস করে রস আখ্যা দিয়েছেন— বীভৎস রস। ভারতীয় শিল্পকলা এবং শিল্পতত্ত্বের প্রাণশক্তির পরিচয় মেলে এই স্বীকৃতির মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের "তীর্থযাত্রী" : পাঠভেদ ও সংশোধন

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নানা সময়ে বিষ্ণু দে-র লেখা থেকে জানা যায় : কেন হঠাৎ টি. এস. এলিঅট-এর "জার্নি অফ দ মেজাই" কবিতার অনুবাদে হাত দিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১] কবিতাটি উপলক্ষ মাত্র, গদ্যচ্ছন্দ-র ধরনই ছিল বিষ্ণু দে-র মূল সমস্যা। ১৯৩২-এ একটি চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> "পুনশ্চ" [প্রথম সংস্করণ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ] পড়ে'ই চঞ্চল হয়েছি। তা ছাড়া সাহায্যও পাচ্ছি না আপাতত আর কারো কাছে। তাই কিছুমাত্র অধিকার না পেয়েও আপনাকেই লিখ্‌ছি। কিছুকাল ধরে' আমার অনেক পদ্যই মিল্‌হীন হয়ে' যায়। সেটা নিয়মছাড়া অমিত্রাক্ষর বা মুক্তছন্দ কি যে তা জানি না— নিশ্চিত হয়ে' scan করতে পারি না বলে'।

চিঠির সঙ্গেই তিনি পাঠিয়ে দেন তাঁর করা এলিঅট-এর ওই কবিতার এক তর্জমা। মূল না-দেখেই ওই তর্জমায় খানিক রদবদল করেন রবীন্দ্রনাথ। তার পর বিষ্ণু দে-র কাছ থেকেই পেলেন মূল কবিতাটি। এবার তিনি নিজেই হাত দিলেন নতুন এক তর্জমায়। "তীর্থযাত্রী" নামে সেটি বেরল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত -সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায়।[২]

'পুনশ্চ'-র দ্বিতীয় সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৪০) সংযোজন-অংশে অন্যান্য কবিতার সঙ্গে যোগ হয় "তীর্থযাত্রী"। 'পরিচয়'-এর পাঠটি কিন্তু এখানে হুবহু ছাপা হয় নি। তার কিছু কিছু সংস্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বানান ও ছেদচিহ্নর তফাত বাদ দিয়ে মূল ফারাক হয় এই ক'টি চরণে :

(প্রথমে 'পরিচয়'-এর পাঠ, পরে 'পুনশ্চ'-র পাঠ দেওয়া হল)

চরণ ১ : কন্‌কনে ঠাণ্ডায় হোলো আমাদের যাত্রা
কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা

৫ : উটগুলোর ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যথা, মেজাজ চড়া
ঘাড়ে-ক্ষত, পায়ে-ব্যথা, মেজাজ-চড়া উটগুলো

৬ : তারা শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে

১৫ : কঠিন মুস্কিলে পড়া গেলো
কঠিন মুশকিল

১৬ : শেষকালে ঠাওরালেম চলব সারারাত
শেষে ঠাওরালেম, চলব সারারাত

১৮ : আর কানে কানে কেউ গান গেয়ে যাবে
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে

২৬ : দু'জন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেল্‌চে টাকার লোভে
দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে

২৯ : তাই চল্‌লেম আরো আগে
চললেম আরো আগে

৩২ : বলতেও পারো, ব্যাপারটা তৃপ্তি পাবার মতো বটে
বলা যেতে পারে, ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক

৩৭ : জন্ম একটা হয়েছিল নিশ্চিত
জন্ম একটা হয়েছিল বটে
৪৩ : এলেম আমরা ফিরে, আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়
এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়
৪৪ : কিন্তু আর স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধানের মধ্যে
আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে
৪৫ : যেখানে আছে সব অনাত্মীয় তাদের দেবদেবী আঁকড়ে ধরে
যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধ'রে

চরণ ২৬-এর দিকেই বিশেষ করে নজর দিতে বলি। আপাতদৃষ্টিতে বানানের তফাত ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ে না (তেমন তফাত তার আগের চরণেও আছে : সরাবখানা— শরাবখানা)। এ ক্ষেত্রে সমস্যা একেবারে মূলে। এলিঅট লিখেছিলেন[৩] :

"Six hands at an open door dicing for pieces of silver" (line 27)

বিষ্ণু দে-র অনুবাদের ওপর রবীন্দ্রনাথ যে কলম চালিয়েছিলেন তার পাণ্ডুলিপিতে আছে :

দ্বারে দেখি ছ'জন খেলোয়াড় পাশা খেলে টাকার লোভে

'পরিচয়'-এর জন্যে যে প্রেস কপি তিনি পাঠান তাতেও ছিল :

ছ'জন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলচে টাকার লোভে[৪]

ভুল করে 'পরিচয়'-এ "ছ'জন"-এর জায়গায় "দু'জন" ছাপা হয়ে যায়। 'পুনশ্চ'-র দ্বিতীয় সংস্করণে ওই পাঠের সংস্কার করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ সেটি খেয়াল করেন নি, মূলের সঙ্গে আর মিলিয়েও দেখেন নি। ফলে 'পুনশ্চ'-য় ও 'রচনাবলী'-র সব সংস্করণে এখনও অবধি "ছ'জন"-এর জায়গায় "দু'জন"/"দুজন" ছাপা হয়ে আসছে।

এলিঅট-এর ওই কবিতায় ছয় সংখ্যাটির পেছনে (ও 'জলযন্ত্র', ওয়াটার-মিল-এর ক্ষেত্রে) একটি বিশেষ স্মৃতি কাজ করেছে। নিজেই তিনি লিখেছেন সে-কথা (৩১ মার্চ ১৯৩৩) :

Why, for all of us, out of all that we have heard, seen, felt, in a lifetime, do certain images recur, charged with emotion, rather than others? ...*six* ruffians seen through an open window *playing cards* at night at a small French railway junction where there was a *water-mill*..[৫]

এলিঅট-এর ভাষ্যকাররা ওই চরণটির সূত্রে মথি ২৬ : ১৪-১৫ ও ২৭ : ৩৫-এর কথা বলেন। এর প্রথমটিতে আছে জিশুকে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে যুদা ইস্কারিয়োৎ-কে তিরিশটি রুপোর টাকা দেওয়ার খবর ; দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে : জিশুকে ক্রুশে গেঁথে দেওয়ার পর রোমান সৈন্যরা কীভাবে পাশার দান চেলে তাঁর জামা-কাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। এলিঅট কবিতাটি লিখেছিলেন অ্যাংলিকান ধর্মমণ্ডলীতে দীক্ষা নেওয়ার (জুন ১৯২৭) পরে, ছাপা হয় অগস্ট ১৯২৭-এ।[৬] এর মূল বিষয়বস্তু যেমন বাইবেল থেকে নেওয়া, তেমনি 'রুপোর টুকরো' ও পাশার দান চালা-র বিম্বও সেখান থেকেই আসে।

ভবিষ্যতে 'পুনশ্চ' ও 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-তে "দুজন"-এর বদলে "ছজন" ছাপাই সব দিক দিয়ে ঠিক হবে। ভুলটা 'পরিচয়'-এর, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে "ছ'জন"-ই ছিল।

এইসঙ্গে আর-একটি কথাও বলা দরকার। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র "কাব্যের মুক্তি" প্রবন্ধটি প্রথম ছাপা হয়েছিল 'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যায়। তার শেষ বাক্যটি ছিল গদ্যেই ("...শূন্যগর্ভ মায়ার মধ্যে তার সৃষ্টি আরও শূন্যময় !")। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন 'স্বগত' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)-য় ওই প্রবন্ধটির শেষে "তীর্থযাত্রী" কবিতাটি যুক্ত হয়।[৭] তার নিচে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : "টি-এস্ এলিয়ট্-এর ইংরেজী কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ"।

সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু 'পুনশ্চ'-র দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠটি ছাপেন নি। তিনি ফিরে যান 'পরিচয়'-এর পাঠেই।

'স্বগত'-র দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৩৫৪ ব.) সেটিই ছাপা হয়েছে।[৮] দুটি সংস্করণেই 'পরিচয়'-এর পাঠের বানান ও ছেদচিহ্ন ইচ্ছেমতো পাল্টানো হয় (যেমন হয় বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত 'রচনাবলী'-তে)।

তবে সুধীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত পাঠে একটি পরিবর্তন লক্ষ করার মতো। চরণ ২৬-এ 'স্বগত'-র দুটি সংস্করণেই আছে "ছ'জন" ও "ছ-জন"। অর্থাৎ যথাসময়ে ভুলটি এড়াতে না-পারলেও কবিতাটি ছাপার ছবছরের মধ্যেই সুধীন্দ্রনাথ সেটি নিঃশব্দে শুধরে নেন। কিন্তু 'পুনশ্চ'র দ্বিতীয় সংস্করণের পর থেকে আজ অবধি সেই কাজটি করা হয় নি।[৯]

[কবিতাটির পাঠভেদ-সমস্যা প্রথম নজরে আনেন শ্রীপ্রভাসকুমার সিংহ ও শ্রীশঙ্খ ঘোষ। অনুসন্ধানে সাহায্য করেছেন শ্রীঅরুণ সেন, শ্রীচিন্ময় গুহ, শ্রীসিদ্ধার্থ দত্ত ও শ্রীসুতপা ভট্টাচার্য।]

টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র', খণ্ড ১৬, সুতপা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৯৫, পৃ. ২২০ ও ৪৩৮-৪৫দ্র.। বিষ্ণু দে-র নিজের বিবরণ পাওয়া যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা' (কলকাতা: লেখক সমবায়-সমিতি, ১৩৭২ ব., পৃ. ২০। প্রথম প্রকাশ : 'সাহিত্যপত্র', শারদীয় সংখ্যা ১৩৭২ ব.), "Homage to T. S. Eliot", *In the Sun and the Rain* (New Delhi : People's Publishing House, 1972, pp. 177-78) আর "দেশ"-এর 'সংযুক্ত-সম্পাদক মহাশয়কে' লেখা চিঠিতে ('দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২ ব., পৃ. ৪১)। এই পত্রিকাতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে পত্রালাপ ছেপে বেরয়। এ বিষয়ে আরও প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্যে অরুণ সেন, "বিষ্ণু দে : পটভূমি", 'পরিচয়', বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ৫, অগ্রহায়ণ ১৩৮২ ব., পৃ. ৫১১-১৩ (টীকা ৩৪) দ্র.।

২. 'পরিচয়', বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ৪৫৪-৫৫। পাদটীকায় লেখা ছিল : "T. S. Eliot -এর The Journey of the Magi-নামক কবিতার অনুবাদ।" মূল কবিতার নামের গোড়ায় অবশ্য The নেই (T. S. Eliot, *Collected Poems 1909-35*, London : Faber and Faber, 1958, p. 107 দ্র.)।

৩. *Collected Poems*, p. 107.

৪. দুটি পাণ্ডুলিপিরই ফোটোকপি পাঠিয়ে বাধিত করেছেন অধ্যাপক দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কর্মসচিব, বিশ্বভারতী। এ দুটি আগেই ছেপেছিলেন সুতপা ভট্টাচার্য তাঁর "বাংলায় এলিয়ট : রবীন্দ্রনাথ আর বিষ্ণু দে" ('বারোমাস', শারদীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ৫০-৫৬) প্রবন্ধে। 'পরিচয়' ও 'পুনশ্চ', দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ অবশ্য সে-আলোচনায় আসে নি। 'বারোমাস'-এ ছাপার সময়ে চারটি জায়গায় পাণ্ডুলিপির পাঠের হেরফের হয়ে গেছে : চরণ ১-এ "হোলো"-র বদলে "হলো", ১৫-য় "মুস্কিলে"-র জায়গায় "মুস্কিলে", ২০ ও ৪৫-এ "যেখানে" না-হয়ে "সেখানে"।

৫. *The Use of Poetry and the Use of Criticism*, London : Faber and Faber, 1933, p. 141; 1967 ed., p.148.

৬. Manju Jain, *A Critical Reading of the Selected Poems of T. S. Eliot*, Delhi : Oxford University Press, 1991, pp. 231-36 দ্র.।

৭. 'পরিচয়', বর্ষ ১ সংখ্যা ১, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃ. ২৪-৪২ ; 'স্বগত', কলকাতা : ভারতী ভবন, ১৩৪৫ ব., পৃ. ৩৭-৩৯। অমিয় দেব-সম্পাদিত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ' (কলকাতা : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, ১৩৯০ ব.) -এর পরিশিষ্ট-য় শুধু প্রথম প্রকাশের সাল ও উৎস দেওয়া আছে, এই সংযোজন (ও অন্যান্য সংস্কার)-এর উল্লেখ নেই (পৃ. ৪৫৪ দ্র.)। তেমনি 'স্বগত' থেকে প্রবন্ধটির ইংরেজি তর্জমায় শুধু রচনাকাল (১৯৩০) দেওয়া আছে ("The Emancipation of Poetry", trans. Edward Dimock and A.T.M. Anisuzzaman in : *The World of Twilight*, Essays and Poems by Sudhindranath Datta, Bombay [& c.] : Oxford University Press, Indian Branch, 1970, pp. 125-48)। আর সেইসঙ্গে রয়েছে অপ্রথাগত চিহ্ন

দিয়ে রোমান হরফে রবীন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদটি। ১৯৩০-এ যে ওই কবিতার অনুবাদ আদৌ করাই হয় নি, ছাপা দূরস্থান— কেউই এটা খেয়াল করেন নি।

৮. 'স্বগত', কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৩৬৪ ব., পৃ. ৩৯-৪১।
প্রসঙ্গত আর-একটি কথা বলি। যে-গদ্যচ্ছন্দ নিয়ে বিষ্ণু দে চিন্তিত হয়েছিলেন 'পুনশ্চ', প্রথম সংস্করণ পড়ে, সে বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ আলোচনা করেন 'পরিচয়' এর সেই সংখ্যাতেই যাতে "তীর্থযাত্রী" বেরিয়েছিল (সূত্র. ২ দ্র.)। তার নাম ছিল "ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ ('পরিশেষ' ও 'পুনশ্চ' বিষয়ে)" (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫-৩৫)। 'স্বগত', প্রথম সংস্করণে (সূত্র ৭. পৃ. ৫৭-৭৬) ও পরে 'কুলায় ও কালপুরুষ' (কলকাতা : সিগনেট প্রেস. ১৩৬৪ ব., পৃ. ২৯-৫১)-এ এটি একই নামে, কিন্তু বন্ধনীভুক্ত অংশটি বাদ দিয়ে, সংশোধিত রূপে ছাপা হয়।

৯. অন্য একটি ব্যাপারও কেউ খেয়াল করেন নি : কবিতাটির প্রথম পাঁচ চরণ উদ্ধৃতি-চিহ্নের (' ') মধ্যে থাকার কথা। মূলে তা-ই ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংশোধনে, প্রেস কপি-তে ও 'পরিচয়'-এ ছাপার সময়েও তা বাদ পড়েছে। 'স্বগত'-য় ও বিষ্ণু দে-র তর্জমাতেও যথাস্থানে উদ্ধৃতিচিহ্ন নেই।
জানা না থাকলে অবশ্য এর তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। এলিঅট-এর কবিতার প্রথম পাঁচ চরণ আসলে লন্সেলট অ্যান্ডরুজ-এর একটি ধর্মোপদেশ (Sermon) থেকে নেওয়া। তারই ইঙ্গিত থাকে ওই উদ্ধৃতিচিহ্নে। ২৫ ডিসেম্বর ১৬২২-এ, রাজা প্রথম জেমস-এর সামনে খ্রিস্ট-র জন্ম প্রসঙ্গে অ্যান্ডরুজ বলেন :
A cold coming they had of it at this time of year, just the worst time of year to take a journey, and especially a long journey in. The ways deep, the weather sharp, the days short, the sun farthest off, *in solstitio brumali*, 'the very dead of winter.'
১৯২৬-এ "Lancelot Andrewes" প্রবন্ধে এলিঅট নিজেই এই অংশটি উদ্ধৃত করেছিলেন। তাঁর *For Lancelot Andrewes : On Style and Order* (১৯২৮) বইতে এটি সংকলিত হয়। এলিঅট-এর ভাষ্যকাররা এই সূত্র থেকেই উদ্ধৃতিটি পুনরুদ্ধৃত করেন।

ইংরেজিতে ফাল্গুনী : কিছু তথ্য কিছু অনুমান

শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়

এক

'ফাল্গুনী' প্রথম প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯১৫-র সবুজপত্র-এ। তখন অবশ্য এর সূচনা অংশ ছিল না। সূচনা অংশ 'বৈরাগ্যসাধন' শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৯১৬-র জানুয়ারিতে, ওই একই পত্রিকায়। ১৯১৬-র জানুয়ারিতেই দুর্ভিক্ষ কবলিত বাঁকুড়ার সাহায্যার্থে কলকাতায় অভিনীত হয় 'ফাল্গুনী', যাতে রবীন্দ্রনাথ অংশ নেন বাউলের ভূমিকায়। অভিনয়ের আগেই লেখা হয়েছিল বৈরাগ্যসাধন, কেননা রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিল ফাল্গুনী নাটক হিসেবে ছোটো বলে দশ টাকা টিকিটের দর্শকেরা সন্তুষ্ট না হতেও পারেন, সেজন্যে প্রথমে তিনি ভাবেন বশীকরণ বা ওই জাতীয় কিছু একটার অভিনয় প্রথমে করে ফাল্গুনী অভিনয় করলে দর্শকদের হিসেবের খাতাতেও ঢেড়া পড়ে না, আর নাটকের প্রথম দৃশ্য শুরু হওয়ার পরেও দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশটার বশীকরণ করা যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বশীকরণ হল না, কিন্তু বশীকিরণের জন্যেই লেখা হল ও অভিনীত হল বৈরাগ্যসাধন।[১]

অভিনয়কালে নাট্যনির্যাস জানিয়ে একটা লিফলেটও তৈরি করা হল ইংরেজিতে। ওই লিফলেটে বেশ-কয়েকটি গানেরও অনুবাদ দরকারমতো প্রকাশ করা হল। পুরো লিফলেটটিই রচনা করেছিলেন কবি। রবীন্দ্রভবনে তার ঈষৎ খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটি ১১০-সংখ্যক ফাইলে রাখা আছে। সেখানে লিফলেটটির একটি কপিও আছে। ফাল্গুনী অভিনয় উপলক্ষে তৈরি লিফলেটটির পরে ঘটল এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ।

ফাল্গুনী ঠিক কত তারিখ থেকে কত তারিখের মধ্যে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল বলা কঠিন। তবে লিফলেটটি তৈরির পর যে হয়েছিল এটা বলা যায় এ কারণে যে, লিফলেট থেকে বেশ-কয়েকটি বাক্য এসেছিল অনুবাদটির প্রথম পাণ্ডুলিপিতে। আর এর অনুবাদ সম্ভবত শেষ হয়েছিল পিয়ারসনদের নতুন গৃহে প্রবেশের আগেই, কারণ ২৬ মার্চ ১৯১৬ তারিখে পিয়ারসন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন— ...খোকা comes to me often and came in a beautiful red silk chapkan to our গৃহপ্রবেশ ceremony when the English translation of Phalguni was partly read.[২]

কে করেছিলেন এর অনুবাদ ? অনুবাদটির আদি পাণ্ডুলিপিটি অ্যান্ডরুজের হস্তলিখিত। এর থেকে এ অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, অ্যান্ডরুজই করেছিলেন অনুবাদ। এরকমই অনুমান করেছেন অধ্যাপক ড. অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য' বইতে।[৩] সেখানে তিনি বলেছেন *'The Cycle of Spring* যদিও ম্যাকমিলন-প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সংকলনে গৃহীত হয়েছিল তবুও এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের করা নয়। টমসন যাকে unhappy introductory matter[১৩] বলেছিলেন, Centenary Volume এর রচনাপঞ্জিতে তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, The greater part of the intorductory portion of this drama was translated from the original Bengali by Mr. C. F. Andrews and Prof. Nishikanta Sen and revised by the Author.[১৪] বর্তমান লেখকের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রভবনের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডক্টর পশুপতি শাসমল রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং মূল উপকরণগুলি দেখে জানিয়েছেন যে, সি. এফ. অ্যান্ডরুজের হস্তলিখিত এবং রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত যে Cycle of Spring পাণ্ডুলিপি ভবনসংগ্রহে আছে তাতে Act I থেকে Act IV পর্যন্ত পাওয়া যায়। এর একটা টাইপকরা কপিও আমাদের সংগ্রহে আছে যার আরম্ভের ২২ পৃষ্ঠা (Prelude) অতিরিক্ত দেখা যায় ; এতেও রবীন্দ্রনাথকৃত সংশোধন বর্তমান। অনুবাদ কে কতটা করেছিলেন তা নির্ধারণ করা কঠিন।[১৫] শারীরিক শ্রম বাঁচানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে অনুবাদ করেছেন আর অ্যান্ডরুজ শ্রুতিলিখন

লিখেছেন তা মনে হয় না। মনে হয় ডাকঘরের তর্জমায় যেমন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, তেমনি ফাল্গুনীর তর্জমায় অ্যান্ডরুজ প্রাথমিক অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, পরে সংশোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।'[৪]

অশ্রুবাবুর সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে পশুপতিবাবুর চিঠিটি তিনি অকারণে তুলে দিয়েছেন, কেননা ওই চিঠিটি কোনো নতুন তথ্যও দেয় না, কোনো নতুন তথ্যের দিকে আলোকপাতও করে না। চিঠিটি নিরঙ্কুশভাবে একটি গা-বাঁচানো চিঠি। কিন্তু এহো বাহ্য। বরং ভাবতে অবাকই লাগে যে The greater part of the introductory portion of this drama was translated from the original Bengali by Mr. C. F. Andrews and Prof. Nishikanta Sen and revised by the Author. —ব্যাকটি তিনি Centenary Volume থেকে উৎকলন করলেন এবং ধরে নিলেন Centenary Volume -এর রচনাপঞ্জিতে The Cycle of Spring সম্বন্ধে বলা হয়েছে ওটি। ওই রচনাপঞ্জিতে ওই বাক্যটি আছে ঠিকই, কিন্তু বাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে। আর উদ্ধৃত হয়েছে বাক্যটি প্রথমে যেখানে ছিল সেখান থেকেই এবং অবিকলভাবে। The Cycle of Spring -এর প্রথম সংস্করণেই বাক্যটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার পর থেকে ওই বই-এ বাক্যটি প্রতিবার পুনর্মুদ্রিত হয়ে এসেছে। অশ্রুবাবু সম্ভবত The Cycle of Spring নিয়ে কাজ করেছেন Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore থেকে, আর সেখানে বাক্যটি মুদ্রিত হয় নি বলেই এই বিপত্তিটুকু ঘটেছে।

বিপত্তিটা সামান্য ঠিকই। কিন্তু এই বিপত্তিটাই অশ্রুবাবুর মতো একজন মান্য রবীন্দ্রগবেষকের সিদ্ধান্তকে ভুলপথে পরিচালিত করেছে। ভুলপথে বলছি এজন্যে যে ফাল্গুনী-র introductory portion-টা আলাদা একটা অস্তিত্ব, আর সেই introductory portionটাই অনুবাদ করেছিলেন অ্যান্ডরুজ ও নিশিকান্ত সেন— এ কথাটা বলা হল ১৯১৭র ফেব্রুয়ারিতে, যখন রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ডরুজ, নিশিকান্ত সেন তিনজনেই জীবিত। বলা হল, ম্যাকমিলন-প্রকাশিত বই-এর শুরুতে, যে ম্যাকমিলনের কাছে রবীন্দ্রনাথের নাম তখনো দামী, তাঁর নামে যা-কিছু প্রকাশ করার জন্যে তখনো তাঁরা উদগ্রীব। সুতরাং ম্যাকমিলন কোম্পানি নিশ্চয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করেন নি ওই নোট। আর 'রাজা' নাটকের অনুবাদে ক্ষিতীশচন্দ্রের নাম না থাকায় রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কতটা সে তো আমরা জানতে পারি অশ্রুবাবুরই বইতে। সুতরাং এ নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে এ নোট পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর ঘটনা হল, ওই নোট যে অংশটার অনুবাদক হিসেবে অ্যান্ডরুজ ও নিশিকান্ত সেনের নাম জানায় সে অংশটার আদি পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে নেই। কিন্তু আদি পাণ্ডুলিপি আছে মূল নাটকটার অনুবাদের এবং সেটা অ্যাণ্ডরুজের হস্তলিখিত। অশ্রুবাবুর অবশ্য মনে হয় না যে শারীরিক শ্রম বাঁচানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে অনুবাদ করেছেন আর অ্যান্ডরুজ শ্রুতিলিখন লিখেছেন। কিন্তু আমাদের তো প্রাথমিকভাবে তাই মনে হয়েছে, কেননা আমরা দেখেছি পিয়ারসনের সেই চিঠি, যেখানে তিনি অ্যান্ডরুজের বাবাকে লিখেছেন ... Charlie (অ্যাণ্ডরুজকে ওই নামেই ডাকা হত) is very happy now a days for he not only gets good news of you but he is back in the abode of peace with the poet. Every day the poet comes to our new bunglow and reads or translates some of his works. When he dictates his translation to Charlie I hear continual peals of laughter; for the poet is full of fun and humour.[৫] । চিঠিটির তারিখ ২৬ মার্চ ১৯১৬। অর্থাৎ শারীরিক শ্রম বাঁচানোর জন্যে হোক বা না হোক রবীন্দ্রনাথ যে ওই সময়ে মুখে মুখে অনুবাদ করছেন আর অ্যান্ডরুজ লিখছেন এ খবরটা পাওয়া গেল পিয়ারসনের মতো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা হল অ্যান্ডরুজ কি ততটাই বাংলা জানতেন যতটা বাংলা জানলে 'ফাল্গুনীর' মতো একটা নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করা যায়। অন্তত প্রমথনাথ বিশী এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্তর মতো আরো দুজন তো বলেছেন— 'মিঃ পিয়ার্সন স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে থাকিতেন বলিয়া তিনি বেশ বাংলা শিখিয়াছিলেন ; গোরা উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ তাঁহার কৃত। মিঃ অ্যান্ড্রুজ স্থায়ীভাবে বসিতে পারেন নাই বলিয়া বাংলা শেখা তাঁহার হয় নাই'।[৬] এবং 'বলে নেওয়া ভালো যে, অ্যান্ড্রুজ ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাঙালি সেজেছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষাটি শিখতে পারেন নি'।[৭]

তা হলে কি আপাতত এই অনুমানই করা যায় না যে, রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে করেছিলেন অনুবাদের কাজ, আর শ্রুতিলিখন করেছিলেন অ্যান্ডরুজ।

দুই

এরকম একটা অনুমান করা যায় বটে কিন্তু এ অনুমানের বিপক্ষেও যে কিছুই বলার থাকে না তা নয়। যেমন ধরা যাক অনুবাদের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গানটিকে— We are free, my friends from the fear of work। প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য গানটির পাঠ ঠিক এমনটা ছিল না, কিন্তু গানের আলোচনা পরে হবে। এখন দেখানো যাক, এ গানটির অনুবাদ ঠিক কীভাবে হয়েছিল! গানটি মূল নাটকে যেমন দুবারে শেষ হয়েছে, অনুবাদেও শেষ হয়েছে সেভাবে। কিন্তু গানটির দুটি অংশই লিখিত হয়েছে মার্জিনে। অ্যান্ডরুজের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে [সংখ্যা ৭৬(১)] গানের জায়গায় song লিখে জায়গা না ছেড়েই পরবর্তী সংলাপগুলির অনুবাদ পাওয়া যায়। গানটি মার্জিনে হলেও অ্যান্ডরুজের হস্তাক্ষরে লিখিত। এ থেকে মনে হতেই পারে যে গানের অনুবাদ অ্যান্ডরুজ করেন নি, তাই গানের জায়গায় song লিখে সংলাপ অনুবাদ করে গেছেন তিনি। পরে রবীন্দ্রনাথ লিখিতভাবে অথবা মুখে মুখে গানের অনুবাদ করে দিলে তার অনুলিখন করেছেন অ্যান্ডরুজ। এটা আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এ তথ্যটা মাথায় রাখলে যে ওই গানটি 'ফাল্গুনী' অভিনয় উপলক্ষে প্রকাশিত লিফলেটে ছিল না। তাই অ্যান্ডরুজ সংলাপ অনুবাদ করার সময় গানটির অনুবাদ পান নি।

কিন্তু ৭৬(১) পাণ্ডুলিপি তৈরি হওয়ার সময় লিফলেটটাও অ্যান্ডরুজের হাতে ছিল কি? Act I-এর শুরুতে The Heralds of Spring are abroad. There are songs in the rustling bamboo leaves, in birds' nests and in blossoming branches লেখা হয়েছে মার্জিনে, যা ওই লিফলেট থেকে পাওয়া, কিংবা Act II-এর শুরুতে Spring's heralds try to rob winter of his outfit of age লেখা হয়েছে মার্জিনে— এটিও ওই লিফলেট থেকে পাওয়া। সুতরাং এমনটাই হতে পারে যে প্রথম দুই অঙ্ক লেখার সময় অন্তত লিফলেটটি হাতে ছিল না অ্যান্ডরুজের। পরে হাতে এসেছিল। তাই Act III-র শুরুতে Winter is being unmasked, his hidden youth about to be disclosed— লিফলেটেও ছিল এবং ৭৬(১)এ মার্জিনে না এসে লেখার মধ্যেই এসেছিল। হ্যাঁ, এরকম একটা ধারণা করা যায় বটে, কিন্তু মুশকিল হল Act I-এ পূর্বোল্লিখিত অংশ মার্জিনে এলেও মার্জিনে আসে নি Act I-এর প্রথম তিনটি গান। গান তিনটির মধ্যে প্রথম দুটির পাঠ প্রকাশিত লিফলেটে কী ছিল আর ৭৬(১)-এ পাঠ কী হয়েছিল তুলনামূলকভাবে দেখা যাক।

১. O South Wind, O Wanderer, push me and rock me,/ thrill me into the outbreak of new leaves./ I stand a tip-toe by the wayside to be startled/by your first whisper by the music of your foot steps/ a flutter of joy running through my leaves betraying my secret.

আর ৭৬(১)-এর পাঠ হল— O South Wind the Wanderer, come and rock me,/ kiss me and thrill me into the new outbreak of leaves./ I am the wayside bamboo tree waiting for your voice./ Come to me, and bring the flutter of life into my branches./ O South Wind, the Wanderer, my dwelling is in the end of the lane./ I know your wayfaring, and I know the language of your footsteps./ Your least touch thrills my limbs./ Your whisper steals all my secrets.

২. The sky pours light into my heart,/ my heart repays the sky in songs./ I pelt the south wind with my notes./ O blossoming palash flame of the forest the air is afire/ with your passion, you have dyed my songs red with your madness./ O sirish, you have cast your perfumenets/ wide in the sky, bringing up my heart into my throat.

আর ৭৬(১)-এর পাঠ হল— The sky pours its light into our heart, / I will fill the sky with songs in answer./ I will pelt the air with my notes.– the air that stirs my wings with its dance./ O, flame of the forest, all your flower-torches are ablaze,/ you have tinged my songs red with the passion of your youth./ In the spring breeze, the throbbing heart of the flower-garden knows no rest, /And

the anklet-bells of the dancing new leaves sound without ceasing./ O Sirish, you have cast your perfume nets wide in the sky,/ bringing up my heart into my throat. প্রকাশিত লিফলেটে প্রথম গানটির অন্তরা অংশ আর দ্বিতীয় গানটির In the spring breeze থেকে without ceasing পর্যন্ত অংশ ছিল না। কিন্তু যে বড়ো অংশগুলি ছিল সেগুলির পাঠ ৭৬(১)-এর পাঠের সঙ্গে অবিকল না মিললেও বোঝা যায় অনুবাদ কাজ চলার সময় ওই পাঠ হাতের কাছেই ছিল। কিন্তু কার হাতের কাছে ? অ্যান্ডরুজের, নাকি রবীন্দ্রনাথের ? অ্যান্ডরুজের হাতের কাছে নয়ই, কেননা প্রথম গানটির অন্তরা অংশ বা দ্বিতীয় গানটির ওই জায়গাটি তা হলে টানা লেখা হত না। মার্জিনে লেখা গানগুলির মতো মার্জিনেই ওই অংশগুলি লেখা হত। আর যদি এই হয়ে থাকে যে অ্যান্ডরুজ যতটা পেয়েছেন ঈষৎ পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছেন, আর যা তিনি পান নি তা নিজে অনুবাদ করেছেন ! কিন্তু তা হলেই প্রশ্ন ওঠে যে গানগুলি তিনি মার্জিনে লিখে রেখেছেন সেগুলিও মার্জিনে না লিখে টানা লিখে গেলেন না কেন ?

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে অ্যান্ডরুজ যখন লিখে চলেছেন তখন সেখানে উপস্থিত ওই লিফলেটটি এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত না থাকলে গানদুটির লিফলেটে অননূদিত অংশগুলি ৭৬(১)-এ টানা চলে আসত না, মার্জিনে আসত।

রবীন্দ্রনাথ যে নিজেই অনুবাদ করেছেন তার প্রমাণ হিসেবে আর-একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে এখানে। ছাপা লিফলেটে ছিল—

Musical Prelude to Scene III

Winter is being unmasked, his hidden youth about to be disclosed.

Spring's heralds sing :-

How grave he looks, how laughably old,/ how seriously busy with preparations of death!/ But before he reaches home we will change/ his dress and his face shall change./ We will confound his calculations,/ snatch away his bag, bulging out/ with dead things, and there shall/ be unveiled the reckless and the young in him.

They tease him and sing:-

O the time comes, it has come when he/ shall know that he is our own, when the/ mad torrent shall be unloosed from the/ miserly grip of the ice, and the north wind/in its ring-dance shall turn round ..

আর অ্যান্ডরুজের হস্তাক্ষরে টানা লেখা হয়েছে এরকম—

Act III

Song Prelude

Winter is being unmasked, his hidden youth about to be disclosed.

Song of the Heralds of Spring.

How grave he looks, how laughably old,/ how solemnly quite among his preparations of death!/ Come, friends, help him to know himself, before he reaches home,/ Change his garb and put on him the dress of young minstrel./ Confound his calculations, snatch away/ his bag of dead things, bring out the impetuous, hiding in him.

(They tease him and sing)

The time comes when the world/ shall know that you are even as we are./ The time comes when your heart shall break/ away in torrents from the clasp of the icy stillness./ And your north wind turn back against its own current...

উদ্ধৃত দুটি পাঠের মিল-অমিল দেখলেই বোঝা যায় প্রকাশিত লিফলেট ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ৭৬(১) পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় উপস্থিত ছিলেন। লিফলেটটি না থাকলে টানা লেখায় লিফলেটের পাঠের সঙ্গে ৭৬(১)-এর পাঠের এত মিল থাকত না। আবার রবীন্দ্রনাথ dictate না করলে গানদুটির পাঠে এত অমিলও ঘটত না। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত গানের অনুবাদ মুখে মুখে করতেন না। তাই যে-সব গানের অনুবাদ তিনি তখনো করে উঠতে পারেন নি সেগুলিই ৭৬(১)-এ লেখা হয়েছে মার্জিনে।

আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আর-একটি কথা বলতে পারি এখানে। Introductory portion-এর বাক্য গঠনের রীতি ও মূল নাটকের বাক্য গঠনের রীতিতে যে একটা ভিন্নতা আছে সেটা ধরা পড়ে আমাদের শ্রবণে। কিন্তু যা বিশেষভাবে উল্লেখ্য ব্যাপার তা হল Introductory portion-এ শ্রুতিভূষণের মুখে চৌপদী ছিল চারটি। প্রকাশিত বইতে অবশ্য চারটি চৌপদী নেই। চৌপদী আছে তিনটি আর দ্বিপদী একটি। শেষেরটি দ্বিপদী। কিন্তু ৭৬(২) টাইপকপিতে ওটি দ্বিপদী নয়, চৌপদীই। ওখানে ওটি ছিল এরকম—

For man's worth is wealth well placed;
Man's unworth makes money's waste.
That king's coffers are well stored,
Where wealth alone on worth is poured.

রবীন্দ্রনাথ মার্জনার সময় প্রথম দুটি ছত্র বাদ দেন, তাই ওটি দ্বিপদীতে পরিণত হয়। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল চৌপদীগুলি বাংলা চৌপদীর মতোই অন্ত্যমিলযুক্ত। কিন্তু অনূদিত মূল নাটকে দাদার পাঁচটি চৌপদীই অন্ত্যমিলহীন। গদ্যে রচিত। এর থেকে Introductory portion—এর অনুবাদকারীর [দের] চৌপদী অনুবাদের রীতির সঙ্গে নাটকের অনুবাদকারীর চৌপদী অনুবাদের রীতির ভিন্নতা সহজেই চোখে পড়ে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো যে চতুর্থ অঙ্কে দাদার চৌপদীটি বোধহয় অ্যান্ডরুজ অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন প্রথমে, লিখেছিলেন—

The Sun is at the gate of the East.
The night cries my death is useful.
She bows down her head at his feet.
And the dark vanished with his * full of gold.

(তারকা-চিহ্নিত স্থানে একটি শব্দ ছিল, পড়া গেল না) এতে Introductory portion-এর চৌপদীগুলির অনুবাদে যে ধরনের অন্ত্যমিল রয়েছে তা ঠিক তেমন না থাকলেও চৌপদীর সুরটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত কবির তা পছন্দ না হওয়ায় অ্যান্ডরুজ মার্জিনে লেখেন—

The sun is at the gate of the East,
his drum of victory sounding in the sky.
The night bows to him with her hand on her breast.
She says – 'I am blessed, my death is bliss.'
The darkness receives his alms of gold,
filling his wallet,– and departs.

অনুবাদটা অনেকটাই গদ্যাত্মক, যেরকম গদ্যাত্মক চৌপদী অনুবাদ আমরা পাই মূল নাটকের মধ্যে। তাই আমাদের মনে হয় অ্যান্ডরুজের হস্তাক্ষরে ওই চৌপদীটির অনুবাদও রবীন্দ্রনাথ dictate করে গেছেন, আর লিখে গেছেন Charlie।

তিন

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত The Cycle of Spring-এর পাণ্ডুলিপির সংখ্যা দুই। একটির সংখ্যা ৭৬(১), অন্যটির ৭৬(২)। ৭৬(১)-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি অ্যান্ডরুজের হস্তলিখিত ও রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক মার্জিত, আর ৭৬(২) -সংখ্যক কপিটি টাইপকপি। সেখানে মার্জনার কাজ প্রথমে করেছিলেন সম্ভবত অ্যান্ডরুজ, পরে রবীন্দ্রনাথ। জানিয়ে রাখা ভালো যে ৭৬(১) -সংখ্যক কপিতে চারটি দৃশ্যের অনুবাদ আছে, কিন্তু সূচনা অংশের ('বৈরাগ্যসাধন') অনুবাদ নেই। ৭৬(১)-এ 'দৃশ্য'কে Act করা হয়েছে, আর 'ফাল্গুনী'তে চারটি দৃশ্যের যেমন যথাক্রমে সূত্রপাত, সন্ধান, সন্দেহ, প্রকাশ— এই চার নাম ছিল, অনুবাদে অঙ্ক চারটির তেমন কোনো নাম দেওয়া হয় নি।

৭৬(২)-এ অবশ্য 'বৈরাগ্যসাধন' অংশের অনুবাদও টাইপ হয়ে রয়েছে। ৭৬(২)-এর প্রথম বাইশ পৃষ্ঠা ওই অংশের অনুবাদের টাইপকপি। কিন্তু ওই বাইশ পৃষ্ঠা টাইপ হয়েছিল আলাদাভাবে। তাই টাইপ হওয়ার সময় যে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল তাতে মূল নাটক যে পৃষ্ঠায় শুরু সেই পৃষ্ঠার সংখ্যা : ।। পরে বাইশ পৃষ্ঠা জুড়ে দেওয়ায় আগের টাইপ হওয়া পৃষ্ঠা সংখ্যা কেটে 23 লেখা হয়েছে।

চার

স্বাভাবিক কারণেই The Cycle of Spring-এ গানের সংখ্যা অনেক। আলোচনা প্রসঙ্গে এ নাটকের গানগুলির পাঠ পরিবর্তনের ওপর কিছু আলোকপাত করা গেছে আগেই। এখন এ নাটকের দুটি গানের পাঠ তৈরির সিঁড়িটা আর-একবার লক্ষ করা যাক।

O South Wind গানটিই এ নাটকের প্রথম গান। গানটির পাঠ 'ফাল্গুনী' অভিনয় উপলক্ষে রচিত লিফলেটে কী ছিল, আর অ্যান্ডরুজ-হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে কী হয়েছিল দেখানো গেছে। ৭৬(২)-এ I am the wayside bamboo tree -র পর শুধু একটি কমাচিহ্ন টাইপ হয়ে রয়েছে দেখতে পাই। ৭৬(২)-এর পাঠ ৭৬(১)-এর পাঠের সঙ্গে এতটা সমতা রাখলেও, ওই পাঠ কিন্তু প্রকাশিত নাটকে ঠিক সেইমতো আসে নি, এসেছে কিছুটা পরিবর্তিত রূপে।

গানটির দ্বিতীয় ছত্রে ৭৬(২)এ পাঠ ছিল— Kiss me, and thrill me into the new outbreak of leaves. আর প্রকাশিত নাটকে ওই ছত্রের পাঠ হল— Rouse me into rapture of new leaves.। তৃতীয় ছত্রে waiting for your voice. এর voice বদলে হল breath, চতুর্থ ছত্রটি প্রায় পুরোটাই পাল্টে গেল— come to me, and bring the flutter of life into my branches > To Tingle life into my branches...। তেমনি সপ্তম ছত্রে দ্বিতীয় I know-টি উঠে গেল প্রকাশিত নাটকে। ৭৬(২)-এ অষ্টম ছত্রে ছিল Your least touch thrills my limbs, যা প্রকাশিত নাটকে হল your least touch thrills me out of my slumber, আর নবম ছত্রের steals all my secrets হল gleans my secrets.।

নাটকের দ্বিতীয় গান The sky pours its light into our heart. ৭৬(২)-এ heart 'our' এর সঙ্গে সংগতি রেখে hearts হয়েছিল, আর the throbbing heart of the flower-gardest knows no rest, and the anklet-bells of the dancing new leaves ৭৬(২)-এ টাইপ হয়েছিল the fluttering heart of the mango blossoms grow restless, And the anklet-bells of the new leaves।

৭৬(২)-এ এই গানের যা পাঠ আছে তার থেকে প্রকাশিত নাটকে গানটির যে পাঠ পাওয়া যায় তা কিছুটা ভিন্ন। যেমন গানের

দ্বিতীয় ছত্রে—	I will fill > I fill
তৃতীয় ছত্রে—	I will pelt > We will pelt
	with my notes > with our notes

চতুর্থ ছত্রে— the air that stirs my wings with its dance > When the air stirs our wings with its madness.

পঞ্চম ছত্রে— O. Flame > O Flame

ষষ্ঠ ছত্রে— ablaze, > ablaze;

সপ্তম ছত্রে— You have tinged my > You have kissed our

অষ্টম-নবম ছত্রে— In the spring breeze, the fluttering heart of the mango blossoms grow restless, And the anklet bells of the new leaves sound without ceasing. > In the spring breeze the mango-blossoms launch their messages to the unknown / And the new leaves dream aloud all day.

দশম-একাদশ ছত্রে— O Sirish, you have cast your perfume nets wide in the sky, bringing up my heart into my throat. > O sirish, you have cast your perfume-net round our hearts,/ Drawing them out in songs.

পাঠ তৈরির সিঁড়িগুলো নিবিষ্ট হয়ে দেখলে এই সিদ্ধান্ত অনায়াসে করা যায় যে বিন্যাসে, শব্দ ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ নিঃশেষে অতৃপ্ত। যদিও এটা ঠিক, যে, এতটা অতৃপ্তি সত্ত্বেও ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণেই কিছু অতৃপ্তির অনেকটা কারণ তাঁর পক্ষে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয় নি। মূল নাটকে ছিল 'বেণুবন'। বাঁশবন ছিল না। বেণু বাঁশ-এর ঠিক প্রতিশব্দ নয়। বেণু শব্দের সঙ্গে এক অনির্বচনীয় অনুভব জড়িয়ে আছে আমাদের চেতনায়, যা বাঁশ শব্দের সঙ্গে নেই, আবার বাঁশবনও তার ব্যাপ্তি, তার অসংখ্য পাতার ঝিরঝির নিয়ে আমাদের মনে যে অনুভূতিটা জাগায় bamboo শব্দ তুলনায় নিঃশেষে আবেগহীন, কঠিন। ফলে bamboo গান গায় শুনলেই হাসি পায়, তার গান অন্তরে কোনো দোলা দেয় না। তেমনি চম্পক চাঁপা হয়ে যে কাজটা করে থাকে সহজে, চাঁপা Champak হলে তার বিপরীত ঘটনাটাই ঘটে যায়।

কিন্তু এ ধরনের অঘটনের কথা বাদ দিলেও অন্য ধরনের অঘটনের কথা ভোলা যায় না কিছুতে। মূল নাটকে ছিল 'ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া/দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে '। আর অনুবাদে শেষপর্যন্ত হল— O South wind, the Wanderer, come and rock me। অর্থাৎ 'দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে' ইংরেজিতে হল rock me। কিন্তু rock শব্দ দিয়ে কি 'দোদুল দোলায়' দুলিয়ে দেওয়া যায়? *The Penguin Dictionary of English*[৮]-এ rock শব্দের অর্থ আছে এরকম— swing steadily to and fro; sway; lull to sleep by swinging; shake violently; reel, cause to reel; (sl) startle, shock; (jazz) work up a strong repeated rhythm, dance violently to jazz music ইত্যাদি। তেমনি মূলের 'ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,/ রাঙা রঙের শিখায় শিখায়/ দিকে দিকে আগুন জ্বলাস', ইংরেজিতে শেষপর্যন্ত হল O Flame of the forest,/ All your flower-torches are ablaze; । মূলে পলাশকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ফলে তার লাল রঙ আমরা মনের মধ্যে দেখে নিয়েছিলাম, আর তাই তার 'রাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন' জ্বললেও সে আগুনে পুড়বার ভয় হয় নি আমাদের, কিন্তু পলাশকে না দেখিয়ে যখন Flame of the forest -কে সম্বোধন করা হল তখন মুহূর্তের জন্যে Flame -এর অভিধেয় অর্থে চোখ আটকে গেল আমাদের। পরেই অবশ্য বোঝা গেল এ আগুন সে আগুন নয়, কারণ flower-torches are ablaze, কিন্তু flower-torches! -এর থেকে বরং মূলানুগ ছিল লিফলেটের পাঠ— O blossoming palash flame of the forest, the air is afire/ with your passion, যদিও সে অনুবাদে ইংরেজিয়ানা ততটা আসে নি, কিন্তু ইংরেজিয়ানা আনতে গিয়ে ৭৬(১)-এ ঘটল এই আর-এক অঘটন। তৃতীয় গানের 'আকাশ বোঝে আনন্দ তার' হল Its stirring thrills the sky.। আনন্দ thrill? আনন্দ বলতে কি thrill বুঝতেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি এই অনুবাদ যখন করছেন তার বছর খানেক আগে লিখছেন 'কেই বা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত'— অর্থাৎ, 'কেই বা দুঃখ ধন্দা লেশমাত্র স্বীকার করিত— আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখ দ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ'।[৯] সেই আনন্দরূপম্ অমৃতম্ কি thrill বিভাতি?

পাঁচ

৭৬(২) টাইপকপির প্রথম বাইশ পৃষ্ঠা হল 'বৈরাগ্যসাধন' অংশের অনুবাদ। আগেই বলা হয়েছে যে ওই বাইশ পৃষ্ঠা টাইপ হয়েছিল আলাদাভাবে, পরে মূল নাটকের অনুবাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃষ্ঠাঙ্ক দেখলেই সেটা ধরা পড়ে। 'বৈরাগ্যসাধন'-এর অনুবাদক অ্যান্ডরুজ সাহেব ও অধ্যাপক নিশিকান্ত সেন। দুজনের কে কতটা অনুবাদ করেছিলেন নির্দিষ্টভাবে তা বলা সম্ভব নয়, কেননা মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তবে প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ অ্যান্ডরুজের বাংলা জ্ঞান সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে অনুমান করা যায় যে সম্ভবত নিশিকান্ত সেনই প্রাথমিকভাবে অনুবাদ করেছিলেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছিলেন অ্যান্ডরুজ। কিন্তু সে যাই হোক, ওই অংশের অনুবাদ যে মূল নাটকের অনুবাদের চেয়ে অনেক বেশি সমর্থ ও নাটকীয় তা স্বীকার করতেই হয়।[১০] অবশ্য ওই অংশ মূলেও যেহেতু নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ তাই তার অনুবাদও নাটকীয় হয়ে ওঠা কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক। অংশটিতে মার্জনার কাজ করেছেন অ্যান্ডরুজ ও রবীন্দ্রনাথ। ৭৬(২) কপিটি টাইপ হওয়ার সময়েও নাটকের নাম কী হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয় নি। নামটিও স্থির হয়েছিল সম্ভবত পরবর্তী কপিতে। কেননা ৭৬(২) কপিতে টাইপ হয়েছিল PHALGUNI— যা কালি দিয়ে কেটেছিলেন অ্যান্ডরুজ। কিন্তু নতুন কোনো নাম লেখেন নি। অবশ্য এটা স্বীকার্য যে এ নাটকের নাম Phalguni-র চেয়ে *The Cycle of Spring* অনেক বেশি নাট্যবিষয় অনুসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী ২', বিশ্বভারতী, ১৯৭৭, পৃ. ৫৩৫।
২. রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পিয়ারসনের চিঠিপত্রের ফাইল, সংখ্যা : ৫
৩. ড. মার্টিন কেম্পশন জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের যে গ্রন্থতালিকা তৈরি করেছেন তাতে তিনিও লিখেছেন The Cycle of Spring ubers. V. C. F.Andrews und Nish'kanta Sen.। ওই তালিকাটি তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৪. অশ্রুকুমার সিকদার, 'রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য', আনন্দ, জানুয়ারি, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৯-৫০
[অশ্রুবাবুর দেওয়া সূত্র : ১৩. Rabindranath Tagore Poet and Dramatist –Edward Thompson, 1948, p.211; ১৪. Rabindranath Tagore: A Centenary Volume. 1861--1961, p. 513; ১৫. ব্যক্তিগত পত্রের তারিখ ১৭ আগস্ট ১৯৭৪]
৫. রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পিয়ারসনের চিঠিপত্রের ফাইল, সংখ্যা : ৪
৬. প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', বিশ্বভারতী, ১৯৬৫, পৃ. ৯০
৭. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শান্তিনিকেতনের এক যুগ', বিশ্বভারতী, ১৩৮৭, পৃ. ১২৩
৮. *The Penguin Dictionary of English*, Harmondsworth, Middlesex, England, 1965, p. 593
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের পথে', বিশ্বভারতী, ১৩৮৮, পৃ. ২৯
১০. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "Vincent Engels in the Commonweal called the plays 'beautiful', compared 'The Post Office' with Chekhov and observed that the prelude to the 'lively' *Cycle of Spring* was 'better than Gilbert and Sullivan." —দ্র. Lal, Ananda, *Rabindranath Tagore : Three Plays*. Translated from Bengali and with an introduction by Ananda Lal, The M.P. Birla Foundation, The Research & Publication Unit, Calcutta, 1987, p. 74.

রবীন্দ্রনাথের লিপিকা

অরুণ দে

১৯২২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'লিপিকা'র ৩৯টি রচনা '১৩২৪-২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে তৎকালীন ১০টি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত' হয়। এই সাময়িকপত্রগুলি হল : আগমনী, আঙুর, পার্বণী, প্রবাসী, বঙ্গবাণী, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, মোসলেম ভারত, শান্তিনিকেতন পত্র ও সবুজ পত্র। গ্রন্থভুক্তির সময় 'প্রত্যেক রচনার শেষে প্রকাশকাল নির্দেশ করা' হয়েছে। সম্ভবত এগুলির রচনাকাল জানা যায় না।

স্বতন্ত্র-প্রচল লিপিকার গ্রন্থপরিচয় বিশ্লেষণ করে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করা গেছে।

এক ॥ গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলি কালানুক্রমিকভাবে সংকলিত হয় নি। নীচের তালিকায় বন্ধনীধৃত সংখ্যাটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রচনার ক্রম-নির্দেশক।

১ (২৪) তোতা-কাহিনী। সবুজ পত্র। মাঘ ১৩২৪
২ (৩৯) স্বর্গ-মর্ত্য। সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২৫
৩ (২২) ঘোড়া ॥ মুক্তির ইতিহাস। সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২৬
৪ (১৩) প্রথম শোক ॥ কথিকা। সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২৬
৫ (২৩) কর্তার ভূত। প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩২৬
৬ (২৫) অস্পষ্ট ॥ কথিকা। সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২৬
৭ (৩) বাণী ॥ কথিকা। সবুজ পত্র। ভাদ্র ১৩২৬
৮ (১) পায়ে-চলার পথ। প্রবাসী। আশ্বিন ১৩২৬
৯ (১৪) প্রশ্ন। ভারতী। আশ্বিন ১৩২৬
১০ (২) মেঘলা দিনে ॥ অক্ষমতা। ভারতী। আশ্বিন ১৩২৬
১১ (৭) পুরোনো বাড়ি। মানসী ও মর্মবাণী। আশ্বিন ১৩২৬
১২ (৩৭) আগমনী। আগমনী। মহালয়া ১৩২৬
১৩ (৪) মেঘদূত। প্রবাসী। কার্তিক ১৩২৬
১৪ (৫) বাঁশি। সবুজ পত্র। কার্তিক ১৩২৬
১৫ (১১) কৃতঘ্ন শোক। ভারতী। কার্তিক ১৩২৬
১৬ (১২) সতেরো বছর। ভারতী। কার্তিক ১৩২৬
১৭ (৬) সন্ধ্যা ও প্রভাত। মানসী ও মর্মবাণী। কার্তিক ১৩২৬
১৮ (৯) একটি চাউনি। প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩২৬
১৯ (১০) একটি দিন। প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩২৬
২০ (৮) গলি ॥ কথিকা। সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২৬
২১ (৩৩) সওগাত। শান্তিনিকেতন পত্র। পৌষ ১৩২৬
২২ (৩৪) মুক্তি। শান্তিনিকেতন পত্র। পৌষ ১৩২৬
২৩ (৩৬) প্রাণমন ॥ আমার কথা। সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২৬
২৪ (১৫) গল্প ॥ গল্প বল। প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২৭
২৫ (৩২) রথযাত্রা। আঙুর। বৈশাখ ১৩২৭

২৬ (৩৮) কথিকা। ভারতী। বৈশাখ ১৩২৭
২৭ (২০) সুয়োরানীর সাধ। পার্বণী। আশ্বিন ১৩২৭
২৮ (২৭) নতুন পুতুল। প্রবাসী। ভাদ্র ১৩২৮
২৯ (১৭) নামের খেলা। মোসলেম ভারত। ভাদ্র ১৩২৮
৩০ (২৬) পট। সবুজ পত্র। ভাদ্র ১৩২৮
৩১ (১৯) রাজপুত্তুর। ভারতী। আশ্বিন ১৩২৮
৩২ (১৮) ভুল স্বর্গ। প্রবাসী। কার্তিক ১৩২৮
৩৩ (১৬) মীনু। ভারতী। কার্তিক ১৩২৮
৩৪ (৩০) সিদ্ধি। সবুজ পত্র। মাঘ-ফাল্গুন ১৩২৮
৩৫ (২১) বিদূষক। ভারতী। বৈশাখ ১৩২৯
৩৬ (২৮) উপসংহার। ভারতী। বৈশাখ ১৩২৯
৩৭ (৩৫) পরীর পরিচয়। বঙ্গবাণী। বৈশাখ ১৩২৯
৩৮ (৩১) প্রথম চিঠি। শান্তিনিকেতন পত্র। বৈশাখ ১৩২৯
৩৯ (২৯) পুনরাবৃত্তি। প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

দুই ॥ কখনো কখনো এক/একাধিক রচনা একই সময়ে প্রকাশিত। যেমন :

শ্রাবণ ১৩২৬ : কর্তার ভূত/প্রবাসী :
অস্পষ্ট/সবুজ পত্র
আশ্বিন ১৩২৬ : পায়ে-চলার পথ/প্রবাসী
প্রশ্ন/ভারতী
মেঘলা দিনে ॥ অক্ষমতা/ভারতী
পুরোনো বাড়ি/মানসী ও মর্মবাণী
কার্তিক ১৩২৬ : মেঘদূত/প্রবাসী
বাঁশি/সবুজ পত্র
কৃতঘ্ন শোক/ভারতী
সতেরো বছর/ভারতী
সন্ধ্যা ও প্রভাত/মানসী ও মর্মবাণী
অগ্রহায়ণ ১৩২৬ : একটি চাউনি/প্রবাসী
গলি/সবুজ পত্র
বৈশাখ ১৩২৭ : গল্প/প্রবাসী
রথযাত্রা/আঙুর
কথিকা/ভারতী
ভাদ্র ১৩২৮ : নতুন পুতুল/প্রবাসী
নামের খেলা/মোসলেম ভারত
পট/সবুজ পত্র
কার্তিক ১৩২৮ : ভুল স্বর্গ/প্রবাসী
মীনু/ভারতী
বৈশাখ ১৩২৯ : বিদূষক/ভারতী
পরীর পরিচয়/বঙ্গবাণী
প্রথম চিঠি/শান্তিনিকেতন পত্র

তিন ॥ যে দশটি সাময়িকপত্রের কথা শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে সেখানে প্রকাশিত রচনা (সমূহ)র তালিকা :

আগমনী। আগমনী। মহালয়া ১৩২৬
আঙুর। রথযাত্রা। বৈশাখ ১৩২৭
পার্বণী। সুয়োরাণীর সাধ। আশ্বিন ১৩২৭
প্রবাসী। কর্তার ভূত। শ্রাবণ ১৩২৬
পায়ে-চলার পথ। আশ্বিন ১৩২৬
মেঘদূত। কার্তিক ১৩২৬
একটি চাউনি। অগ্রহায়ণ ১৩২৬
একটি দিন। অগ্রহায়ণ ১৩২৬
গল্প ॥ গল্প বল। বৈশাখ ১৩২৭
নতুন পুতুল। ভাদ্র ১৩২৮
ভুল স্বর্গ। কার্তিক ১৩২৮
পুনরাবৃত্তি। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
বঙ্গবাণী। পরীর পরিচয়। বৈশাখ ১৩২৯
ভারতী। প্রশ্ন। আশ্বিন ১৩২৬
মেঘলা দিনে ॥ অক্ষমতা। আশ্বিন ১৩২৬
কৃতঘ্ন শোক। কার্তিক ১৩২৬
সতেরো বছর। কার্তিক ১৩২৬
কথিকা। বৈশাখ ১৩২৭
রাজপুত্তুর। আশ্বিন ১৩২৮
মীনু। কার্তিক ১৩২৮
বিদূষক। বৈশাখ ১৩২৯
উপসংহার। বৈশাখ ১৩২৯
মানসী ও মর্মবাণী। পুরোনো বাড়ি। আশ্বিন ১৩২৬
সন্ধ্যা ও প্রভাত। কার্তিক ১৩২৬
মোসলেম ভারত। নামের খেলা। ভাদ্র ১৩২৮
শান্তিনিকেতন পত্র। সওগাত। পৌষ ১৩২৬
মুক্তি। পৌষ ১৩২৬
প্রথম চিঠি। বৈশাখ ১৩২৯
সবুজ পত্র। তোতা-কাহিনী। মাঘ ১৩২৪
স্বর্গ-মর্ত্য। ফাল্গুন ১৩২৫
ঘোড়া ॥ মুক্তির ইতিহাস। বৈশাখ ১৩২৬
প্রথম শোক ॥ কথিকা। আষাঢ় ১৩২৬
অস্পষ্ট ॥ কথিকা। শ্রাবণ ১৩২৬
বাণী ॥ কথিকা। ভাদ্র ১৩২৬
বাঁশি। কার্তিক ১৩২৬
গলি ॥ কথিকা। অগ্রহায়ণ ১৩২৬
প্রাণমন ॥ আমার কথা। ফাল্গুন ১৩২৬
পট। ভাদ্র ১৩২৮
সিদ্ধি। মাঘ-ফাল্গুন ১৩২৮

পত্রিকার সম্পাদকগণের নামসহ তালিকা :

আগমনী। বার্ষিক। ১৩২৬	সম্পাদক :	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
আঙুর। মাসিক। ১৩২৭	সম্পাদক :	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
পার্বণী।	সম্পাদক :	নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রবাসী। মাসিক। ১৩০৮	সম্পাদক :	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গবাণী। মাসিক। ১৩২৮	সম্পাদক :	বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন
ভারতী। মাসিক। ১২৮৪	সম্পাদক :	সরলা দেবী
মানসী ও মর্মবাণী। মাসিক।	সম্পাদক :	জগদিন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
মোসলেম ভারত। মাসিক। ১৩২৭	সম্পাদক :	মোজাম্মেল হক
শান্তিনিকেতন পত্র। মাসিক। ১৩২৬	সম্পাদক :	সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৩২৮) বিভূতিভূষণ গুপ্ত (১৩২৯)
সবুজ পত্র। মাসিক। ১৩২১	সম্পাদক :	প্রমথ চৌধুরী

লক্ষ করলে দেখা যাবে 'আগমনী' রচনাটি আগমনী পত্রিকার মহালয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে কি রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার নামের সঙ্গে সংগতি রেখে সম্পাদকের অনুরোধে (?) লিখে দিয়েছিলেন এটি ? কেনই বা একই সময় দুটি, কখনো কখনো চারটি স্বতন্ত্র পত্রিকায় চারটি ভিন্ন রচনা প্রকাশিত হয় ? এ-সব রচনা কি পূর্বেই লেখা হয়ে ছিল, নাকি যেমন-যেমন অনুরোধ এসেছে, তেমন-তেমন লিখে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ?

দুই

লিপিকা রচনার সূত্রপাত ঠিক কোন্ সময় হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু মতানৈক্য আছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন (রবীন্দ্রজীবনী/তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯১), "এবার শান্তিনিকেতন বাসকালে কবি নূতন রীতিতে 'কথিকা' নামে কতকগুলি গল্পাণু বা গল্পকণা লেখেন।"* প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 'লিপিকার সূচনা' (শারদীয় দেশ ১৩৬৭)-তে লিখেছেন, "আস্তে আস্তে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলুম। Andrews সাহেব এলেন। বড়লাটকে তার পাঠানো— খবরের কাগজে দেওয়ার জন্য কপি তৈরি করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রামানন্দ বাবুকে এক কপি এনে দিলুম। এইসব করতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। দুপুরের দিকে আর জোড়াসাঁকোয় যাই নি। বিকালে গিয়ে শুনি কবি দোতলা থেকে তিনতলায় চলে গিয়েছেন। দক্ষিণের শোবার ঘরে গিয়ে দেখি একটা ছোটো বাঁধানো খাতা, লাল মলাট দেওয়া। তাতে কী লিখছেন। আমি যেতেই বললেন, এই শোনো আরেকটা লেখা, লিপিকার প্রথম যেটা লেখা হয় "বাপ শ্মশান থেকে ফিরে এল"। তখন পাঞ্জাব কোথায়, জালিয়ানালা-বাগ কবির মন থেকে মুছে গিয়েছে। দিনের পর দিন একটা করে "লিপিকা"র লেখা চলতে লাগলো। শরীরের ক্লান্তি, সমস্ত অসুখ তখন একদিনের মধ্যেই সেরে গিয়েছে।"

স্পষ্টতই, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বিবরণীতে অমিল রয়ে গেছে। প্রভাতকুমার স্পষ্টকথায় লিপিকা-সূত্রপাতের কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে প্রশান্তচন্দ্রের বিবরণে অনেকগুলি ঘটনার কথা জানা যাচ্ছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রসঙ্গ যদি রবীন্দ্রনাথের মন থেকে মুছে গিয়ে থাকে তবে সে ১৯১৯

---

*'কথিকা' শিরোনামে চারটি রচনা প্রকাশিত হয় 'সবুজ পত্র' -এ ১৩২৬-এর আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এবং অগ্রহায়ণ-এ।

সালের কথা। অমৃতসরের 'জালিনবালাবাগে' নববর্ষের দিন (১৩ এপ্রিল ১৯১৯) 'মেলার জনতার উপর সরকারি সৈন্য অতর্কিতে গুলি চালিয়ে হত্যা করল ৩৭৯ জনকে'। দেড় মাস পরে এই হত্যাকাণ্ডের খবর দেশে রাষ্ট্র হয়ে যায়। কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি শান্তিনিকেতনে। সেখান থেকে শ্রীমতী রাণু অধিকারীকে লিখছেন, "তোমরা তো পঞ্জাবে আছ, পঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপে আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিল।"

রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন প্রতিবাদ করতেই হবে। কলকাতায় চলে এসে "কয়েকজন খ্যাতনামা দেশনেতার সঙ্গে দেখা করে সভা ডাকতে বললেন। রাজি হলেন না কেউ।" তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। ২৯মে রাতে ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখলেন। এই চিঠি সংবাদপত্রে ২ জুন প্রকাশিত হলে দেশের লোক জানতে পারে যে "রবীন্দ্রনাথ জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর 'সার' উপাধি প্রত্যর্পণ করেছেন।"

প্রশান্তচন্দ্রের স্মৃতিকথার সঙ্গে এই ইতিহাস মিলে গেলেও একটা প্রশ্ন তবু থেকেই যাচ্ছে। লিপিকার গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে যে 'প্রত্যেক রচনার শেষে প্রকাশকাল নির্দেশ করা হইয়াছে' অথচ প্রশান্তচন্দ্র জানিয়েছেন যে চেমসফোর্ডকে চিঠি লেখার পরে-পরেই "বাপ শ্মশান থেকে ফিরে এল" অর্থাৎ 'প্রশ্ন' রচিত। লিপিকায় 'প্রশ্ন'-এর দুটি পাঠ মুদ্রিত। মূল গ্রন্থের পাঠ "শ্মশান হতে ফিরে এল" ; গ্রন্থপরিচয়ভুক্ত পাঠ "শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল" এর কোনোটির সঙ্গেই প্রশান্তচন্দ্রের উল্লিখিত পাঠ মেলে না।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় প্রকাশিত 'সঙ্কলন' (১৯২৫)-এ লিপিকার চারটি রচনা 'মেঘদূত' 'পায়ে চলার পথ' 'বাঁশি' 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' সংকলিত। এই গ্রন্থের প্রকাশক ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে চয়ন করিয়া একখানি কবিতার বই "চয়নিকা" অনেকদিন হইল বাহির করা হইয়াছে এবং ইহার অনেকগুলি সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোনো বই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এইবার আমরা গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া "সঙ্কলন" বাহির করিতেছি। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন আর সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে। কোনো বইতে এখনও গ্রথিত হয় নাই এমন লেখাও "সঙ্কলনে" দেওয়া হইল। লেখাগুলি বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে সাজানো হইয়াছে।' "সঙ্কলন"-ধৃত 'মেঘদূত' 'পায়ে চলার পথ' 'বাঁশি' 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'-এর শেষে মুদ্রিত আছে যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, আষাঢ় ১৩২৬, আশ্বিন ১৩২৬, আশ্বিন ১৩২৬। এই চারটি রচনার ক্ষেত্রে প্রকাশকের বক্তব্য এবং গ্রন্থ-পরিচয় লেখকের ভাষ্য যে মিলল না পাঠকের তা সহজেই লক্ষ্যগোচর হবে।

তিন

লিপিকা রচনার যুগে একটি পত্রে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (৪ ভাদ্র ১৩২৬), 'আমার লেখাটির কি নাম দেব ভেবে পাইনে। "পুরাণো শোক" বোধ হয় চলতে পারে। ছোট ছোট গল্পকে "কথাণু" না বলে "কথিকা" বলা যেতে পারে। "গল্পস্বল্প" বললে ক্ষতি কি ?'

প্রমথ চৌধুরী -সম্পাদিত 'সবুজ পত্র'-এ লিপিকার এগারোটি রচনা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'কথিকা' শিরোনামে চারটি প্রকাশিত (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৬)। এগুলির পরিবর্তিত শিরোনাম 'প্রথম শোক' 'অস্পষ্ট' 'বাণী' 'গলি'।

লিপিকা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৭ আগস্ট ১৯২২। প্রথম প্রকাশকালে এই গ্রন্থে কোনো 'ভূমিকা' ছিল না। পরবর্তীকালে 'পুনশ্চ'-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেছিলাম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজীরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।...আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে।'

শান্তিনিকেতনে ২৯ আগস্ট ১৯৩৯-এর ভাষণে রবীন্দ্রনাথ লিপিকা প্রসঙ্গে বলেন, 'লিপিকা লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখি নি।'

প্রশ্ন/সমস্যা এখানেই। লিপিকা গল্প না কাব্য ? 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়'-এ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একে বলেছেন 'গদ্য-কবিতা'। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/তৃতীয় খণ্ড' (প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩, পৃ ৩২৯)-এ লিখেছেন, 'সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় ছোট-গল্প লেখার তৃতীয় যুগের অবসান হইয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের গল্পের টুকরা বা "কথিকা" অনেকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি 'লিপিকা'য় (১৯২৩) সংগৃহীত হইয়াছে।' এই গ্রন্থের অন্যত্র (পৃ ৩৩১) সুকুমার সেন আবার লিখেছেন, 'লিপিকার লেখাগুলি সবই গদ্যের মত ছাপা। কিন্তু কয়েকটি লেখার রীদম্ গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের নিকটবর্ত্তী।' 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর পরবর্তীকালীন সংস্করণে (পৃ ১৮৫) সুকুমার সেন লিপিকা প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা-রচনার প্রথম প্রচেষ্টার পরিচয় আছে 'লিপিকা'র প্রথম অংশে। পদ্যের মত পংক্তি ভাঙিয়া ছাপা না হইলেও এগুলির মধ্যে... প্রকৃত গদ্যকবিতার ঝঙ্কার আছে।' 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে সুকুমার সেন লিখেছেন (পৃ ১৮৮), 'লিপিকার মধ্যে যে 'কথিকা' বা গল্পের টুকরা বা গদ্য কবিতাগুলি আছে তাহার অধিকাংশের লিখনভঙ্গি অনেকটা কাব্য-ঘেঁষা।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিপিকা-বিষয়ে 'রবীন্দ্রজীবনী'তে লিখেছেন, 'এবার শান্তিনিকেতন বাসকালে কবি নূতন রীতিতে 'কথিকা' নামে কতকগুলি গল্পাণু বা গল্পকণা লেখেন... এগুলি নূতন রীতিতে লেখা গল্পের রেখাচিত্র, মনের ভাবনার নিরাভরণ আলপনা যেন।' আর, এর পাশাপাশি দেখা যেতে পারে প্রমথনাথ বিশীর অভিমত, 'রবীন্দ্রনাথের লিপিকা কাব্যখানি— কাব্যই বলা যাক, দু-চারটি রচনা ছাড়া সমস্তই কাব্যধর্মী।'

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত এবং বুদ্ধদেব বসু -প্রকাশিত (শ্রাবণ ১৩৪৬/ জুলাই ১৯৪০) 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সূচনা হয়েছে লিপিকার 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' দিয়ে। কেন ? তার একটা ব্যাখ্যা (হয়তো) পাওয়া যাবে আবু সয়ীদ আইয়ুবের এই ভূমিকাংশ থেকে : 'আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক কোনখান থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা শক্ত, প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে সব জায়গায় প্রাকৃতিক সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি। বর্তমান শতাব্দীতে প্রথম দুই দশকের কবিতা যে মোটের উপর রবীন্দ্রকাব্যেরই প্রতিধ্বনি, এতে সন্দেহ করা চলে না, এবং আক্ষেপও করা যায় না যখন আমরা স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলার মতন দীন সাহিত্যকে ঋদ্ধির কোন স্তরে নিয়ে এসেছে। তৃতীয় দশকে নজরুল ইসলাম, যতীন সেনগুপ্ত প্রভৃতির শক্তি ও সাহসের ফলে সে-সর্বজয়ী প্রতিভার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে নবীন বাঙালী কবিদের নিজেকে চিনবার ও চেনাবার সুযোগ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে তাকে আশাতীত মর্য্যাদা দান করলেন। গদ্যরীতির প্রচলন ক'রে কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা বর্জন ক'রে, কবিকুলপরিত্যক্ত "অসুন্দর" প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেষকে গ্রহণ করে তিনি নিজের ঐতিহ্য নিজেই ভেঙেছেন। তার স্থানে নতুন কোনো ঐতিহ্য এখনো গ'ড়ে ওঠবার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধপরবর্তী মেজাজ ঐতিহ্যগঠনের অনুকূল নয়।'

রবীন্দ্রনাথের এই অন্তর্ভুক্তিতে 'কবিতা'-সম্পাদককে লীলাময় রায় লেখনী-নামে পত্র লিখেছিলেন (চৈত্র ১৩৪৩) অন্নদাশঙ্কর রায়। সেই পত্রে অনেক কথার সঙ্গে তিনি এই কথাও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, পদ্যের অনুকরণে সাজানো ছাড়া আধুনিক কবিতার অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা পুরাতন গদ্যের ছিল না। 'পদ্যের অনুকরণে সাজানো বলেই এই জিনিস কবিতা বলে কাটবে, ঐ অনুকরণটুকু ছাড়লে এর বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে না।

কাব্যরসের দিক থেকে বিচার করলে ল্যাম, লী হান্ট, ডি কুইন্‌স, পেটার, রাসকিন যত শত প্রবন্ধ লিখেছেন তার অধিকাংশই কবিতা। অথচ কোনো ইংরেজী কাব্য সংকলনে তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না। হয়ত ল্যামের দুই একটি মাঝারি পদ্য দেওয়া থাকে। 'সঞ্চয়িতা'র পরবর্তী সংস্করণে আশা করি "বিচিত্র প্রবন্ধ",

"ছিন্নপত্র" ও "গল্পগুচ্ছ" থেকে কিছু কিছু ও "লিপিকা" থেকে বেশী বেশী কবিতা থাকবে।'

লীলাময় রায়ের এই পত্র প্রসঙ্গে 'কবিতা'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছিল, 'কবিতা যখন গদ্যেও হ'তে পারে, পদ্যেও হ'তে পারে তখন গদ্য-কাব্য কথাটার বৈধ প্রয়োজন আছে। পদ্যকে পদ্য-কাব্য বললে ভুল হয় না, হয়তো বাহুল্য হয়, যদিও পৃথিবীতে অনেক পদ্যই দেখা গেছে যেটা কাব্য নয়। এমন অনেকে আছেন, যাঁরা সেই শ্রেণীর পদ্যকে অনায়াসেই কবিতা ব'লে মানেন, মানেন না লিপিকাকে। কিন্তু লিপিকার রচনাগুলি কবিতাই, লীলাময় রায়ের কূট কোটেশনমার্কা সত্ত্বেও।'

এই সম্পাদকীয় মন্তব্যতেই উল্লিখিত হয়েছিল আর-একটি তথ্য, 'ইয়েটস-এর সদ্য প্রকাশিত অক্সফোর্ড বুক অফ মডার্ণ ভর্সের প্রথম কবিতা হচ্ছে পেটারের দা ভিঞ্চি প্রবন্ধ থেকে মোনালিসা সম্বন্ধে বিখ্যাত কয়েকটি লাইন— পদ্যের মতো সাজানো।'

'কবিতা'র সম্পাদকীয়তে (আষাঢ় ১৩৫০) 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' শিরোনামে প্রশ্ন তুলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, ' 'লিপিকা' গল্প-উপন্যাসে অন্তর্গত না ক'রে কবিতা অংশের অন্তর্গত করাই কি যুক্তি-সংগত নয়? রবীন্দ্রনাথ যখন নিজেই বলেছেন যে 'লিপিকা'র রচনাগুলি তিনি কবিতা হিসেবেই লিখেছিলেন, শুধু সাহসের অভাবে কবিতার মতো ক'রে সাজাননি, এবং 'লিপিকা'র সঙ্গে 'পুনশ্চ'র আত্মীয়তা যখন সুস্পষ্ট তখন ভাবীকাল কি ঐ গ্রন্থকে কবিতা হিসাবেই গ্রহণ করবে না? এখনই তো অনেকের মনে দৃঢ় ধারণা দেখা যাচ্ছে যে 'লিপিকা' বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যকবিতাগ্রন্থ। 'লিপিকা' যদি গল্প হয় 'পুনশ্চ'ই বা নয় কেন? বাংলাভাষায় প্রথম গদ্যকবিতালেখক যে রবীন্দ্রনাথই এই সত্যের অপলাপ ঘটে যদি 'লিপিকা'কে ছোটোগল্পের দলভুক্ত করা হয়।'

বুদ্ধদেব বসুর এই সম্পাদকীয় রচনার প্রায় দু-দশক পূর্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ ১৩৩১) হয়েছিল এই সংবাদ : "বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়" বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, রবিবাবুর ছোট গল্পের বইগুলি হইতে ১৫টি ছোটগল্প নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য তিনটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। রবিবাবু নিজে একটি তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকাভুক্ত গল্পগুলির নামের সঙ্গে যাঁহাদের তালিকার নামগুলি ঠিক মিলিয়া যাইবে, কিম্বা অনেকটা মিলিবে, তাঁহার মিলের পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার পাইবেন।...

আমরা যখন এই নির্বাচন পুরস্কারের কথা শুনিয়াছিলাম তখন মনে করিয়াছিলাম 'লিপিকা'র গল্পগুলির মধ্য হইতেও নির্বাচন চলিবে। পরে জানিলাম, "লিপিকা" এখন বাদ দেওয়া হইয়াছে।

"লিপিকা"র মত লেখা রবিবাবুর কলম হইতেও আগে বাহির হয় নাই। শুনিয়াছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচনের পুরস্কার পরে দেওয়া হইবে।'

এর প্রায় পাঁচ বছর পর 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ ১৩৩৬) পুনর্মুদ্রিত 'লিপিকা'র এই 'পুস্তক-পরিচয়', লেখক শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, " 'লিপিকা' আটত্রিশটি ক্ষুদ্র গল্প ও গদ্য কবিতার সমষ্টি। গল্পে কাব্যে বিজড়িত এই ধরনের রচনার প্রথম সূচনা— কবির 'কথিকা'য়। 'লিপিকা'র প্রথম লেখা 'পায়ে চলার পথ'— রূপক। "আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখলুম এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।" লেখাটি যৌবনারম্ভে রচিত— কবির রাজপথের কথাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'গলির কথা'য় কবি বলিতেছেন, "তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জ্জনা এসে জমে— মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারীর খোসা, মরা ইঁদুর— সে জানে এই-সব হচ্ছে বাস্তব।" 'সুয়োরানীর সাধ', 'উপসংহার', 'সিদ্ধি', 'পরীর পরিচয়' রূপকথার রূপে সমুজ্জ্বল। শাণিত তরবারির ঝলকের মত তীক্ষ্ণ শ্লেষ 'কর্ত্তার ভূত' ও 'তোতা কাহিনী'র মধ্য দিয়া ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে, 'মীনু', 'ভুল স্বর্গ', 'অস্পষ্ট', 'নতুন পুতুল' ও 'পুনরাবৃত্তি' প্রভৃতির মধ্যে পুনরায় নূতন করিয়া ছোট-গল্পে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই। 'লিপিকা'র লেখাগুলি যেন এক-একখানি ছবি, দু'একটি রেখা, এখানে ওখানে মৃদু রঙের একটু প্রলেপ, তাহাতেই যেন তাহারা অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অসম্পূর্ণতার মধ্যেই তাহাদের সম্পূর্ণতা। কবির ভাষায় "রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দিয়ে সেই ছবি আঁকা।"

'লিপিকা' সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ' "পলাতকা" লেখার সময়েই বিশুদ্ধ গদ্যে কবিতারচনা রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল। সেগুলি বেরোল 'লিপিকা"র প্রথমাংশে। তবে সে-পুস্তকপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ল যে হর্বর্ট্ স্পেন্সর একেবারে মিথ্যে বলেননি ;

অনেকেই যদিও ভুলক্রমে ভাবেন যে শিখিপুচ্ছধারী দাঁড়কাক আর ময়ূর এক, তবু গদ্যবেশী কাব্যের যথার্থ পরিচয় সকলেরই অগোচর। এমন কি কবির নিজের মনেও হয়তো এই বই-সম্বন্ধে দ্বিধা চোকেনি ; কারণ তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকায় এর নাম গদ্যেরই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আকারে এবং জাতিবিচারে তাদের স্থান যেখানেই হোক, "পায়ে চলার পথ", "রাত্রি ও প্রভাত" ইত্যাদি লেখাগুলি যে-মুহূর্তে চেঁচিয়ে পড়া যায়, তখনই তাদের কাব্যরূপ ফুটে ওঠে ; রবীন্দ্রনাথের অপরাপর গদ্যরচনার সঙ্গে তাদের প্রভেদ কত গভীর তা আর ঢাকা থাকে না।'

ওই একই প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, ' "লিপিকা" সজ্ঞানে সরলতার দিকে চ'লেও কাব্য-গুণের অংশভাক্।' এই অসাধ্যসাধন কী করে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা তাঁর 'অবিদিত' ছিল বলেই জানিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ। এই 'রহস্যের' সমাধান করতে চেয়েছেন তিনি এইভাবে : 'সকলে দেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর পদ্যের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গদ্যোপমার সঙ্গে তাঁর পদ্যোপমার কোনও মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমাপ্রয়োগ করেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর। পক্ষান্তরে তাঁর কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতির প্রয়োজনে অথবা ধ্বনিমাধুর্যের তাগিদে। এ-জাতীয় উপমা অর্থাগমের সহায় নয়, এমনকি অনেক সময়ে প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী। তৎসত্ত্বেও এতে কাব্যের অনিষ্ট ঘটে না ; কারণ কবিতাপাঠে যুক্তি হয়তো অনাবশ্যক, অপরিহার্য শুধু নিষ্ঠা। কাব্যে উপমার একমাত্র কর্তব্য পাঠকের নিষ্ঠাকে ডাক দেওয়া ; এবং নিষ্ঠা যুক্তির আদেশে আসে না, আসে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আকর্ষণে।...

"লিপিকা"র উপমা এই জাতীয় স্বপ্নময় উপমা ; তার সার্থকতা অর্থগত নয়, চিত্রগত ; এবং সাধারণ কবিতায় ছন্দ যেমন ধ্বনিসাম্য বজায় রেখে পাঠকের কাণ্ডজ্ঞানকে মোহজালে ঘিরে ফেলে, "লিপিকা"-য় তেমনই উপমা আলেখ্যের মায়াকাজল পরিয়ে তার তর্কপ্রবৃত্তিকে ঘুম পাড়ায়। সেই জন্যে, "লিপিকা"র রূপ যাই হোক, কাব্যই তার স্বরূপ।' সুধীন্দ্রনাথের বিচারে "লিপিকা" অমূল্য পুস্তক। অন্য অন্য রবীন্দ্র-গ্রন্থের তুলনায় লিপিকা 'কেমন যেন সঙ্কীর্ণ' হলেও তাঁর মনে 'এ-বইয়ের সাফল্য-সম্বন্ধে' দ্বিধা ছিল। বাংলা কবিতার ছন্দোমুক্তি কত দূর সইবে তা তাঁর জানা ছিল না, সে কারণে ' "লিপিকা"র কবিতাগুলিকে গদ্যাকারে ছেপেছিলেন, তার জন্যে এমন প্রসঙ্গ বেছেছিলেন যা কৌলীন্যের জোরেই রসাত্তীর্ণ।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *An Artist in Life* গ্রন্থে লিপিকা সম্পর্কে লিখেছেন, '*LIPIKA* is written in the form of prose. But it is poetry really, and that of the highest kind. Poetic form and versification have always been one of the poet's major interests; in *Lipika* he breaks altogether new grounds by writing poems in a free prose-like metre but in the rhythm of poetry, and he keeps to it for some time.'

প্রসঙ্গত অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের এই সংলাপচূর্ণ :

> "'লিপিকা' তোমার কেমন লাগে ?"
>
> "খুব ভালো।"
>
> "দেখ একবার, contradiction কি রকম তোমার মধ্যে। 'লিপিকা' কেন ভালো লাগে ? সে তো গদ্য কবিতা, বিশুদ্ধ গদ্য কবিতা। লেখাটা গদ্যের ছাঁদে এই মাত্র তফাৎ।"

চার

'লিপিকা'কে কবিতা বলা উচিত না কি ছোটোগল্পের সংকলন হিসেবে গণ্য করা কর্তব্য, এই বিতর্ক এড়িয়ে গিয়ে কতগুলি রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য' গ্রন্থে। লিপিকার কয়েকটি রচনাকে রূপকথা বলে মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। মেনে নিলে, তাঁর উল্লিখিত রচনাগুলি— ভুল স্বর্গ, রাজপুত্তুর, সুয়োরানীর সাধ, বিদূষক, তোতা-কাহিনী, পট, নতুন পুতুল, উপসংহার, পুনরাবৃত্তি, সিদ্ধি, রথযাত্রা, পরীর পরিচয়, মুক্তি— গদ্যকবিতা বলে চিহ্নিত করা যাবে না। (গদ্য)-কবিতা রূপকথা হতে পারে, রূপকথা কি (গদ্য)কবিতা হতে পারে ?

লিপিকার শ্রেণীগোত্র নিয়ে এই-যে মতভিন্নতা তার একটা মূল কারণ বোধহয় এই যে পদ্যের একটা নির্দিষ্ট আকার আছে যেটা গদ্যের নেই। পদ্যের আছে নানারকম ছন্দ, পর্বভাগ, অন্ত্যমিল ; গদ্যের তা নেই। 'হর্বর্ট' স্পেন্সর নাকি গদ্য-পদ্যের প্রভেদ-নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ওই দুই রচনারীতির তারতম্য কেবল মুদ্রাকরের মর্জির উপরে প্রতিষ্ঠিত ; এক পাতা ছাপা গদ্যের চার দিকে যে-পাড় থাকে, তা সমান্তর, আর পদ্যের কিনারা বন্ধুর।'

গদ্য-পদ্যের বিভেদ বোঝাতে 'পঞ্চভূত'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর কোমল হৃদয় সর্বদাই আর্তের পক্ষে। তিনি আমার দুরবস্থায় কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া কহিলেন, "কেন, গদ্যেপদ্যে এতই কি বিচ্ছেদ !"

আমি কহিলাম— পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে।" '

রানী মহলানবিশকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন (২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬), 'পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো— তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের— কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়— অরণ্য পাহাড় মরুভূমি সমতল অসমতল প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। জানা আছে পৃথিবীর জলময় রূপ আদিম যুগের, স্থলের আবির্ভাব হাল আমলের। সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন, গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠছে— তাকে ব্যবহার করা অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না— নিজের শক্তি প্রয়োগ ক'রে তার উপর দিয়ে চলতে হয়— ক্ষমতা অনুসারে সেই চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই, ধীরে চলা, ছুটে চলা, লাফিয়ে চলা, নেচে চলা, মার্চ করে চলা ; তার পরে না-চলারও কত আকার, কত রকমের শোওয়া বসা দাঁড়ানো। বস্তুত গদ্যরচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত।'

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে গদ্য-পদ্য সম্পর্কে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (২২ মে ১৯৩৫), 'গদ্য বলতে বুঝি, যে-ভাষা আলাপ করবার ভাষা ; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে-ভাষা তাই পদ্য। আর রসাত্মক বাক্যকেই আলঙ্কারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য, আর গদ্যে বললে হবে গদ্যকাব্য।'

গদ্য-পদ্যের 'ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক' রবীন্দ্রনাথ মানতেন না। তাঁর কাছে তারা 'ভাই আর বোনের মতো'। তাই তিনি যখন দেখেন 'গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে' তখন আর আপত্তি করেন না।

'কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা, পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক'— রবীন্দ্রনাথের এই কথাটা সকলে না মানলেও কেউ কেউ মানবেন আশা করি। আর আধুনিককালের জনাদৃত চলচ্চিত্রাভিনেতার কণ্ঠে যখন 'লিপিকা'র আবৃত্তি শোনা যায় ক্যাসেট-কল্যাণে তখন এ কথা তো মেনে নিতে হয় যে 'লিপিকা' আধুনিক কাব্যপাঠকের হৃদয় জয় করেছে। রানী মহলানবিশকে পূর্বে উল্লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন 'লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ', সে কি কেবলই হালকা চালে, কৌতুকের সুরে ? তাতে কি নেই কাব্যের কোনো গভীর সত্য, লিপিকার গভীরতর অন্তরতম পরিচয় !'

'পুনশ্চ' (১৯৩২)-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।'

ভাবতে অবাক লাগে রবীন্দ্রনাথও ভীরুতার শিকার হয়েছিলেন।

তিন পর্বে বিভক্ত লিপিকার প্রথম পর্বের চোদ্দটি রচনাই রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'অল্প কয়েকটি লেখা' কি না সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ নই। নির্মলকুমারীকে যখন তিনি লেখেন 'লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ' তখনও কি তিনি এই প্রথম পর্বের চোদ্দটি রচনার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন ? তপোব্রত ঘোষ এই চোদ্দটি রচনাকে বলেছেন 'গীতিগদ্য' ('রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ', পৃ. ৩৪৫) আর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বিশুদ্ধ গদ্যকবিতা, লেখাটা গদ্যের ছাঁদে, এইমাত্র তফাৎ' সুতরাং একটা ধন্দ থেকেই যায়।

লিপিকা প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ বলেন ('ছন্দের বারান্দা', পৃ. ৫৪-৫৫), 'নিজের গদ্যছন্দ বিষয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেবলই জানান 'লিপিকা'র কথা, 'পুনশ্চ'র পাঠকেরাও তাই মনে রাখতে বাধ্য হন 'লিপিকা' প্রসঙ্গ, কিন্তু তা মনে রেখেও এখানে আমি বলতে চাই যে 'লিপিকা'র সঙ্গে 'পুনশ্চে'র কোনো অব্যাহত যোগ নেই, পরম্পরার সম্পর্ক নেই, 'পুনশ্চ' ঠিক 'লিপিকা'রই পরবর্তী পরীক্ষণ নয়।... এটা লক্ষ করা জরুরি মনে হয় যে 'লিপিকা'র বাক্যগুলিকে আপাত-পদ্যের আকারে খণ্ডিত ক'রে নিলেও তার থেকে মিলত না 'পুনশ্চে'র যোগ্য ছন্দস্পন্দন, এ-দুয়ের চরিত্রই ছিল ভিন্ন। ভাবে কিংবা ভাষায় সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা দূর করবার কোনো আয়োজন নেই 'লিপিকা'র রচনাবলিতে, তাকে যেন ঘিরে নেওয়া হয়েছে একটু বেশিরকমই কবিত্বমণ্ডনে, সেই প্রথাময় মেঘ আর বাঁশি আর শোক আর প্রেমের নিমগ্নতাই হলো এর নিশ্চিত আলম্বন।'

এখানে লিপিকার রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ কবিতার আকারে খণ্ডিত করে নিয়েছি যদি কোনো 'ছন্দস্পন্দন' মেলে এই দুরাশায়।

পায়ে চলার পথ

এই তো পায়ে চলার পথ।
এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে,
মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে,
খেয়া-ঘাটের পাশে বটগাছ-তলায় ;

তার পরে
ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে
চলে গেছে গ্রামের মধ্যে ;

তার পরে
তিসির খেতের ধার দিয়ে,
আমবাগানের ছায়া দিয়ে,
পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে,
রথতলার পাশ দিয়ে

কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁচেছে জানি নে।

বোবা পথ কথা কয় না।
কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে
সূর্যাস্ত অবধি
ইশারা মেলে রাখে।

পথ কি নিজের শেষকে জানে,
যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল,
যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব

গল্প

ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল
অমনি সে বললে, 'গল্প বলো।'
দিদিমা বলতে শুরু করলেন,
'এক রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সদাগরের পুত্তুর—'
গুরুমশায় হেঁকে বললেন, 'তিন-চারে বারো।'

তার পরে কখন শুরু হল প্রাণের পত্তন।
জাগল ঘাস,
উঠল গাছ,
ছুটল পশু,
উড়ল পাখি।
কেউ বা মাটিতে বাঁধা থেকে
আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল,
কেউ বা ছাড়া পেয়ে
পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল,
কেউ বা জলের যবনিকাতলে
নিঃশব্দ নৃত্যে
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত,
কেউ বা আকাশে ডানা মেলে
সূর্যালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ্যরচনায় উৎসুক।
এখন থেকেই ধরা পড়তে লাগল
বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

রাজপুত্তুর

রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে,
সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে,
যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।
সে হল যে কালের কথা
সে কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।
শহরে গ্রামে
আর-সকলে হাটবাজার করে,
ঘর করে, ঝগড়া করে;
যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর
সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।
কেন যায়?

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে,
খাল-বিলের জল খাল-বিলের মধ্যেই শান্ত।
কিন্তু গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না,
মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না।
রাজপুত্তুরকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখবে কে ?
তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না,
সাত-সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যায়।
মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায়
আর বারে বারে নতুন ক'রে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে।
সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে,
ছেলেরা চুপ ক'রে গালে হাত দিয়ে ভাবে,
'আমরা সেই রাজপুত্তুর।'

সামনে এল অসীম সমুদ্র,
স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো।
সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

শব্দ-ব্যবহার

লোকসান হদ্দমুদ্দ বকশিশ তলব সাবাস মেরামত নজর স্যাকরা তনখা গদি তদারক মজুর দেউড়ি দানা পানি ঠাসা কোতোয়াল বেয়াদবি দমাদ্দম সম্বন্ধীরা আক্কেল অবিদ্যার কলম সড়কি শিরোপা ঠাহর পাইক ভাণ্ডারী জোগাড় হিসাবের নিকাশ গোঁফে খরচ লড়াইয়ের শখ ডিম গুজব বুঁদ ঝিম ভোঁ গতিকে ফাঁস শেল আস্তাবলে মাইনের হেনকালে সহিস তারিফ খোলসা খাবি খাসা রশি বিচলিত আভা লজ্জিত জীর্ণ অবধি অন্তর্যামীর
দশা এড়াবার জো নালিশ আদিম আভাস দারোগা ফুটো ওঝার খোঁটায় মুশকিল ঘানি খর্পরে খিড়কির পেয়াদা খাজনা হুঁশ হুঁশিয়ার বেবাক আভিজাত্য মশান আব্রু ইজ্জত ইমান ঘানি মোদ্দা অর্বাচীনেরা নায়েব
ধামা রেলিঙের বালাপোষ মিইয়ে কাঁকন শপথ আঙিনা বেড়া দস্যি পাগলি ভর শাসন তাঁবু ঝুঁটি গলি ঝাঁকিয়ে গির্জে চাদর থাপড় অচঞ্চল স্তব্ধ প্রখর বিবর্ণ দিগন্ত বেণী স্থির দুরন্ত নিস্তব্ধ
ঘোমটা হুকুম উজিয়ে দেউল গোলা মহল পর্দা ইশারা তর্জনী দ্বাদশ পদাবলী সংক্ষিপ্ত লুপ্ত স্তব্ধ অনির্বাণ
তাবিজ গুমরে দুয়ারে লণ্ঠনের টিকটিকি বোবা শ্মশান আগডালে উলঙ্গ
রোজ আলাপ বাকি চুকিয়ে ফতুর অভিসার মোড় ভেরে সিঁধ আঁচড় ঝাপট কাঁথা কুলুপ তালা ফাটা সাসি(র) বাঁখারি ঠেকিয়ে চুনকাম আলসে সিধে আবরু উজাড় দখল ইমারতের মহল মস্ত বাহবা জবাব যাচাই খবর মজুর জো আন্দাজ ভারাগুলো নহবত খাতাঞ্চিখানায় অকর্মণ্য মুশকিল ধূলিসাৎ
খেয়াল পর্দা আঁধি অফুরান শিয়রের বিরহ আড়াল সিঁথি জটা দুগাছি
বিদায় সেলাই ভর্ৎসনা আড়াল পাড়ি
অবগুণ্ঠিতা ধূসর চাউনি দণ্ড পল মুহূর্ত জিনিস রেণু নিমেষে স্তূপ প্রতাপ ঐশ্বর্য অমৃত
দমকা বাদশা সস্তা টুকরো ঝাপসা দুর্লভ

শান নজর ছাঁটা ডমরু বালাই মাৎলামি চুলো খোসা আড় নালা আঁশ ধারাবাহী
পরব সামগ্রী বেনারসি সওগাত রুমালে
তফাত শিয়রে কলরব মুদে
আঁটি মোকাবিলা গাঁঠ দাসখত ধাঁদা লড়াই ব্যূহ
দিদিমা কোটাল পুত্তুর গুরুমশায় নামতা মানচিত্রে ঠিকানা
ধারাপাত নিছক সারবান পিটনি বহুধা যবনিকাতলে হয়রান
হিতৈষী পুটপাক প্রদক্ষিণ আবর্তন
বদ্দি মেড়ে গুমরে স্যাঙাৎনি সই লশকর পাল্কি নাইতে
হাওদা ডালি ঘাম কোঠাবাড়ি
পুতুল কারিগর বাকি সাবেক সর্দার জামাই খেদিয়ে
বোঝাই কাহন দাদি চশমা
খাতা কিনারা মলাটের কাগজে ঝি উল্কি ঠাস চড় ভাগনে
পট তূলি হরণ ইষ্টদেবতা সূক্ষ্ম স্থূল ধ্যান
তেপান্তর মাঠ তুফান খুড়ো দাবরাবের উকিল শমে যম শিকল বিচক্ষণ
বেকার খামকা কেজো অবকাশ হয়রান নালিশ অলক ঘড়া দড়ি বেণী আয়না কোমরবন্ধের বাহার
ইঁদারা মালী নিড়োত বোঁটা হাঙ্গাম হিন্দুস্থানী দাই ফিকে
হাবা কাঙাল খাজনা পেয়াদা বর্গি চৌতলা দরোয়ান স্বয়ং পণ বৃথা প্রখর তপস্বী তাপস আঁচলে দরদ লঙ্ঘন
বোঝাই তিলক বিদূষক হুকুম শিবির সহায় প্রণাম
তম্বুরা সম্মতি প্রসন্ন উতলা কিংখাবে পাহারা
ঘটক মিনতি আতুর চাউনি বধূ পড়ন্ত পরশ
বিমর্ষ প্রাচীর কুটীর ত্রুটি ঠাটে বিলম্ব প্রস্তাব পরাভব কিনারায় রাক্ষস

কায়দা-কানুন কোঠা-বালাখানায় সোনাদানা পাড়াপড়শি চাল-চলন মণি-মানিক ঘরবাড়ি আসা-যাওয়া যুদ্ধবিগ্রহ মাল-মশলা লোক-লশকর দিন-রাত হাটবাজার দেশ-বিদেশ রামসীতা কপিল-কণাদ ডাল-পালা জিনিসপত্র সাজ-সরঞ্জাম পাড়াপড়শিকে আনাচে-কানাচে

ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আপিসে কলেজ পোস্ট্‌আপিসের টেবিলে বাক্স টব পেনসিলের থিয়েটার ইস্কুলের রেলগাড়ি ফুটবল ম্যাচ ট্রাম টিউশানি পাস মার্কা পুলিস

পর্বত-প্রমাণ তদারক-নবিশ আধমরা হাতছাড়া জীবনযাত্রা আধখাওয়া চিলে-কোঠা না-শেষ-করা ইন্দ্রধনু ডানা-ভেজা রক্তরশ্মি বহুবিস্তৃত ধূলিরেখা সিংহদ্বার ধূলিবন্ধনে চরণপাত পুষ্পবৃষ্টি দেয়ালি-উৎসব কাঁচা-আমওয়ালা আলো-নেবানো শোকাতুরা কুলুপ-লাগানো বালি-ধসা ইঁট-বের-করা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা তিন-মহল লাল-পেড়ে জোড়-ভাঙা মন-বাঁদর মাপকাঠি চিরতৃপ্তিহীন কূলহারা কর্মহীন ছায়া-উত্তরীয় মর্মরমুখরিত আত্মনিবেদনে অশ্রুভরা হঠাৎ-বেজে-ওঠা বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন বাদল-হাওয়ায় বিশ্বাসঘাতক তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া সন্ধ্যায়-জ্বালানো পান্থশালা জয়ভেরী রাত্রে-গাঁথা শান-বাঁধানো আবর্তনধ্বনি পত্রমর্মরে গলাগলি গল্পপোষ্য সন্ধি-স্থাপন সন্তান-পালন চোখে-ঠুলি-দেওয়া লাল-পেড়ে ঝাঁকা-ভরা থিয়েটার-বিলাসী কুড়িয়ে-পাওয়া থলি-ভরা মোহর-ভরা সাত-সমুদ্র তেরো-নদী সব-গোড়াকার সব-শেষের স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা বোতাম-খোলা ঝড়ে-ভাঙা চরণসেবা

মাস-মাস. মুঠা-মুঠা. রাশি রাশি. আস্তে আস্তে. ঝাঁকে ঝাঁকে. ফাঁকে ফাঁকে. নেড়ে নেড়ে. চলতে চলতে. কানে কানে. ঠুকরে ঠুকরে. টিপে টিপে. ক্ষণে ক্ষণে. ফোঁটা ফোঁটা. বড়ো বড়ো. দিয়ে দিয়ে. ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে. দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে. তারায় তারায়. ধড়াস ধড়াস. বাঁকে বাঁকে. কেঁপে কেঁপে. স্বর্গ-স্বর্গ. তানে তানে. সঙ্গে সঙ্গে. মনে মনে. জানলায় জানলায়. তালে তালে. ধীরে ধীরে. বারে বারে. ছাতায় ছাতায়. ভাইয়ে ভাইয়ে. ভারে ভারে. সারে সারে. কাঁদো কাঁদো. চেয়ে চেয়ে. দিনে দিনে. গণ্ডূষে গণ্ডূষে. আছি আছি. প্রাণে প্রাণে. তাকিয়ে তাকিয়ে. সাজিয়ে সাজিয়ে. শাখায় শাখায়. পাতায় পাতায়. ঘরে ঘরে. যুগে যুগে. মুখে মুখে. লেখায় লেখায়. থাকে থাকে. দলে দলে. পিছে পিছে. চোখে চোখে. রাস্তায় রাস্তায়. ঘন ঘন. হাঁপাতে হাঁপাতে. ছোটো ছোটো. ঘিরে ঘিরে. ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে. বুনে বুনে. থেকে-থেকে. উন্মেষে উন্মেষে. মাঝে মাঝে. যুদ্ধ-যুদ্ধ. অঙ্গে অঙ্গে. বনে বনে. কখনো কখনো. ডালে ডালে. গাছে গাছে. দেখতে দেখতে. কিছু কিছু. মরতে মরতে.

খস্‌খস্‌. গজ্‌গজ্‌. ঝির্‌ ঝির্‌. খিল্‌ খিল্‌. থর্‌ থর্‌. ঝর ঝর. গুন্‌ গুন্‌. ঝিমি ঝিমি. ঝিলমিল. টানাটানি. কাড়াকুড়ি. আনাচে-কানাচে. আলুথালু. গড়াগড়ি. দেখাদেখি. বলাবলি. ছড়াছড়ি. দমাদম. এবড়ো-খেবড়ো. ঠেলাঠেলি.

লিপিকায় ব্যবহৃত বিশেষণ-এর মধ্যে বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়। এখানে তারই কিছু নিদর্শন :

বোবা পথ। স্তব্ধ গান। লুপ্ত ফুল। অনির্বাণ বেদনা। বন্দী কথা। পলাতকা ঝর্না। অপরিমিত চঞ্চলতা।
আলুথালু পাগলা মেঘ। চিরতৃপ্তিহীন দেখা। সুদূর দুর্গম নির্বাসন।
নিভৃত হৃদয়। তুচ্ছ কামনা। সলজ্জ অবগুণ্ঠন।
ছিন্ন মেঘ। অনাথা দরজা। রোগা পাতাবাহার। ছোটো কৌশল।
ছাঁটা আকাশ। কৃতঘ্ন শোক। ক্লান্ত নহবতের। খাপছাড়া মেঘ।
ছলছলে আভা। বোবা অন্ধকারের। নিঃশব্দ নৃত্যে। সরল বীরত্ব।
কাঁচা প্রাণ। থিয়েটার-বিলাসী বন্ধু। দুরন্ত অলক। চঞ্চল ঝর্না।
ভুল লোক। ভুল স্বর্গ। নীল ঘুম। আদিম আভিজাত্য।
প্রাচীনতম ঘুম। রোগা ঠোঁট। আবাঁধা চুল। মোটা কাঁকন।
মোটা মেঘ। অসীম ব্যথা। নীল পাহাড়। বাঁকা পথ। গভীর গর্ভশয্যা।
নিঃশব্দ আবর্তনধ্বনি। পলাতক আলো। সরল হাসি।

এখান থেকে একটু সাজিয়ে নিলে আমরা পাই :
বোবা *পথ*, *অন্ধকার* (< অন্ধকারের)।
পলাতক *আলো*। রোগা *পাতাবাহার, ঠোঁট*। ভুল *লোক, স্বর্গ*।
পলাতকা *ঝর্না*। নীল *ঘুম, পাহাড়*। মোটা *কাঁকন, মেঘ*।
দেখা যাচ্ছে 'মেঘ'— এই বিশেষ্যের সঙ্গে চার বার পাঁচরকম বিশেষণ ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ :

ছিন্ন, খাপছাড়া, আলুথালু, পাগলা, মোটা।

লিপিকায় লক্ষ করবার মতো একটি বিষয় হল এর বাক্য। অন্যান্য গদ্যরচনার মতো দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার না করে ছোটো ছোটো বাক্য দিয়ে বিশেষ কোনো কাব্যরস গড়ে তোলার চেষ্টা হয়তো এর নেপথ্য কারণ। কখনো কখনো একটিমাত্র বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাক্যে শব্দ-সংখ্যার ব্যবহারও চোখে পড়ার মতো। লক্ষ করে দেখা যেতে পারে শুরু ও শেষের বাক্যের শব্দসংখ্যা। পরবর্তী তালিকায় এই দুই বাক্যের শব্দ-সংখ্যার উল্লেখ করা হল :

শিরোনাম	শুরুর বাক্য	শেষের বাক্য
তোতা-কাহিনী	৪	১১
ঘোড়া	১৬	৬
প্রথম শোক	৯	৯
কর্তার ভূত	১৩	৫
অস্পষ্ট	৮	২১
বাণী	১২	১২
পায়ে-চলার পথ	৫	১৮
প্রশ্ন	৫	১২
মেঘলা দিনে	৯	২১
পুরোনো বাড়ি	৯	১৪
আগমনী	২	১৫
মেঘদূত	৬	৩৫
বাঁশি	২৩	৫
কৃতঘ্ন শোক	৫	১৯
সতেরো বছর	৫	২০
সন্ধ্যা ও প্রভাত	৩	১৮
একটি চাউনি	১৩	২৩
একটি দিন	৫	২০
গলি	১৫	২০
সওগাত	৩	১৩
মুক্তি	১২	২৪
প্রাণমন	৫	১০
গল্প	৯	১০
রথযাত্রা	৩	১১
কথিকা	২৪	৫
সুয়োরানীর সাধ	৪	২০
নতুন পুতুল	১২	১১
নামের খেলা	৭	৯
পট	১২	৫
রাজপুত্তুর	১৭	১২
ভুল স্বর্গ	৪	১১
নীনু	৪	২০
সিদ্ধি	৯	৫
বিদূষক	৬	২২
উপসংহার	১২	১৭
পরীর পরিচয়	১১	১৫
প্রথম চিঠি	১৩	২১
পুনরাবৃত্তি	৬	৭

শব্দ সংখ্যা	বাক্য সংখ্যা	শব্দ সংখ্যা	বাক্য সংখ্যা
২	১	৯	৪
৩	৩	১১	১
৪	৪	১২	৫
৫	৬	১৩	৩
৬	৩	১৫	১
৭	১	১৬	১
৮	১	১৭	১

শুরু এবং শেষ ছাড়াও লিপিকায় দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয় শব্দের বাক্যও আছে। নীচে একটা সারণি করে দেওয়া হল :

শিরোনাম	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়
তোতা-কাহিনী	পাখিটা মরিল। পাখি আসিল।	সে ছিল মূর্খ। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন।	এক যে ছিল পাখি। আর কি গান গায় ? দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। কথাটা রাজার কানে গেল।	পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে।	দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ?
ঘোড়া	খাসা আস্তাবল।	আমার ঘোড়াটিকে নিয়েছ।	ব্রহ্মা বড়ো খুশি হলেন। মাঠের ধারে থাকে মানুষ। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া।	ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে	এতে মানুষের মনে বড়ো রাগ হল ; একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে।
প্রথম শোক			অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম।		আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম।
কর্তার ভূত			তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।	শুনে তারও মনে দুঃখ হল। দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল। ভূতের নায়েব ভুতুড়ে জেলখানার দারোগা। শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।	
অস্পষ্ট	মেয়েটি আধাবয়সী।	একদিন বাধা পড়ল। এমনি কিছুদিন যায়। লেফাফা খুললে না।	ওরা সব গেল কোথায় !		ছাতে আর মেয়েটিকে দেখা যায় না। কেবল আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলে। কলেজ খোলবার সময় সময় ফিরে এল।
বাণী	বৃষ্টি পড়ছে।	মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।		অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এল.	ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখি নি।
পুরোনো বাড়ি	তিন-মহল বাড়ি।		মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্রা।		তার পরে সকল দরজাতেই তালা পড়ল।
আগমনী	বাস চুপ। শরৎপ্রভাতের শুকতারা।	আর কথা নেই। 'কেন চলবে না ?'	কিন্তু, ভরসা হয় না। এমনি করেই দিন যায় ; 'সে যে মস্ত বড়ো'।	চুপচাপ করে আবার খাটতে বসি। মন চার দিকে তাকিয়ে দেখলে।	
মেঘদূত			কেনন., আধখানা কথা ভুলেছি.		উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

শিরোনাম	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়
কৃতঘ্ন শোক		মন চুপ কবলে। হঠাৎ চমকে উঠলেম।			
সতেরো বছব			বলে, 'আমবা খুঁজতে বেবলেম।'	কাকে সে এরা জানে না।	তার পরে আবো সতেরো বছব যায়। আর, ওবা বাতাসে উড়ে চলে যায়।
সন্ধ্যা ও প্রভাত	জ্বাল কে ?	এখানে নামল সন্ধ্যা।			
একটি দিন		আবার ফিবে গেল।	মনে পড়ছে সেই দুপুব বেলাটি।	সে উঠে চুল বাঁধতে গেল। আবাব একবাব বাইবে এসে দাঁড়াল। এইটুকু ছাড়া আব কিছুই না।'	ঘবে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। বৃষ্টি ধবে এল, আমার গান থামল।
সওগাত	দিন ফুবোল।	পুজোর পবব কাছে। মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।	ভাণ্ডাব নানা সামগ্রীতে ভবা। সওগাত সব চলে গেল।		এই বলে তার কপালে চুম্বন কবলেন। 'যখন দূবে যাবি তখন সওগাত পাবি।'
মুক্তি			মেলার দিন কাছে এল। গিয়ে দেখে, মূর্তি কোথায়।	ঐখানে, যেখানে তোমার পুতুল সাজিয়েছ।	বেদীব উপর দিয়ে পথ হয়ে গেছে। লোকেব পবে লোক চলে, বিশ্রাম নাই।
প্রাণমন	সৃষ্টি কবি।	সেখানে কব কী ? আব ওব কাল ? নাই বা বুঝলে ! বেলা কেটে গেল। 'কী বকম দেখলে ?'	সে ভাবি খুশিব কথা। সৃষ্টি আবাব ঘেবেব মধ্যে। তখন কবেকাব কোন্ ভোববাত্রি।	সেই ভাষা বিশ্বজগতেব সবকাবি ভাষা। তা হলে মাপবে কী দিয়ে ? তাই সে কাল সংখ্যাব অতীত। সেই সুন্দবকেই দেখে এই বনবিহারী।	কিছুক্ষণেব জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। মন আমাব খানিকক্ষণ চুপ করে বইল।
গল্প			কত বেদন, কত ঘটনা,	তখনকাব কাণ্ডকাবখানা যাকে বলে 'সাবধান'।	এমন করে বহু যুগ কেটে যায়।
রথযাত্রা		বথযাত্রার দিন কাছে।	কেবল বাকি বইল একজন। বাস্তাব ধাবে তাব বাড়ি।		দাসদাসী দলে দলে পিছে পিছে চলল।
কথিকা			পথ বললে, 'ভয় নেই।'		
সুয়োবানীব সাধ	স্যাঙাৎনি এল।	কুঁড়েঘব বানিয়ে দিলে। নদীতে নাইতে গেছি।	বাজাব কানে খবর গেল। তাব পবে একদিন দোলযাত্রা। তাব পবে একদিন স্নানযাত্রা।	ডালি পড়ে বইল, লজ্জা পেলেম।	ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ। সে ঘব যেন তুলে আনা বনফুল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম। সাদা শাঁখা পবলেম আর লাল-পেড়ে শাড়ি। সমস্ত বাত নাচ হল, গান হল।

শিরোনাম	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়
					তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই।
নতুন পুতুল			চুপ করে বসে রইল।	কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়। বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল।	নবীনের দল বললে, 'লোকটা সাহস দেখিয়েছে' সাবেক কালের অনুচরেরা বলে, 'আরে ছিঃ!' বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকরনার কাজে সে বলে, 'কী দিদি কী চাই?' নাতনি বলে, 'দাদা, আমি কার তাতার' মা বললে, 'এখন বর এলেই হয়।' বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, 'সে আছে কোথায়?'
নামের খেলা	হল না।		কোথাও ছাপা হল না।	আন্দোলন হল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্ছে তার ছোটো ভাগনেটি।	একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগল। সে একটুখানি হাসলে আর লিখতে লাগল। পড়াশুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা। বন্ধু বললে, 'ওরা রাজি হল না।'
পট			মন্ত্রী বললে, 'কত দাম?'	এমন সময় রথের মেলা বসল। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।	এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। সেদিন তাই নিয়ে শহরে খুব ধুম। কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চলল না।
রাজপুত্তুর	কেন যায়? ট্র্যাম চলেছে। রাজকন্যা কোথায়?	এ যে শহর! এ কী চাল! পাত্রের সন্ধান মিলল। সে বড়ো আশ্চর্য।	তার পরে অনেক কথা। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা।	আর, রাজপুত্তুরের এ কী বেশ। মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। খুড়ো বললেন, মেয়ের কপাল ভালো।	খবর এল, তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।
ভুল স্বর্গ	কী হবে?	কী কাজ দেব? কিছুই হবে না।	এর সেই দশা হল।	কেউ বলে না 'সময় অমূল্য'। হার মানতে হল, ঘড়া দিলে। ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।	আহা তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই? 'ঘড়া নিয়ে কী হবে? জল তুলবে?' 'না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।' সেদিনও বেকার মানুষ এক পাশে দাঁড়িয়ে। নানা রঙের নানা-কাজ-করা দড়ি তৈরি হল। কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়। স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

শিরোনাম	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়
মীনু		ওর অল্প বয়েস।	সেটা শেষ হল না। ক্লান্ত মীনু বেলায় উঠত।	তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।	বড়ো হয়ে জৌনপুরে হল ওর বিয়ে। একদিন সারারাত মীনুর ঘুম ছিল না।
সিদ্ধি		আরো কিছুদিন গেল।	তা নাই-বা রইল তপস্যা তাপস আসন ছেড়ে উঠল। তাই সে চোখ মেলল।	তার পরে আরো কিছুদিন যায়।	বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নির মেয়ে। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জন গিরিগুহায়।
বিদূষক		তিনি হলেন জয়ী।		এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।	কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল।
উপসংহার		এক পদ গাইলেন।		রাত পোয়ালো, রাজকন্যা যাত্রা করলে।	মেয়েটি তাঁকে শিশুর মতো মানুষ করে। আচার্যের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তম্বুরা নিয়ে আচার্য গান গাইতে বসলেন।
পরীর পরিচয়	পরী কই ? আর, কাজরী ?	মন্ত্রীর পুত্র এল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে।	এক মাস কেটে গেল। দিনের পর দিন যায়। তিন প্রহরের বাঁশি বাজল।	তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। সে কোনো জবাব করলে না।	রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল। তার জল-ভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।
প্রথম চিঠি			তারা হাততালি দিয়ে উঠল।	কিন্তু, সেটুকু সময় ছিল না।	
পুনরাবৃত্তি	বিচারসভা প্রস্তুত।	আর পড়ে রুচিরা। কিন্তু, রাজার ইচ্ছা	রাজা সেখানে বসে গেলেন। মরতে মরতে হাঁপিয়ে উঠলেন। কেননা ছেলেরা কানাকানি করে। এমনি করে কিছুকাল যায়।	কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কিন্তু, রুচির সমস্ত মন কোথায় ? রাজা তাঁর বাগানে এসে বসলেন।	সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন। রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল। রাজা সিংহাসনে বসে, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়ালো।

লিপিকায় কয়েকটি প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এখানে তেমন কয়েকটি প্রসঙ্গ :

সংগীত

১। পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, **ভৈরবীর** সুরে বাঁধা। (পায়ে-চলার পথ)
২। **স্তব্ধ গান** (পায়ে-চলার পথ)
৩। কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী **সুরের** প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে। (পায়ে-চলার পথ)
৪। যে পথ একটিমাত্র **সরল তারের একতারার** মতো...। (মেঘলা দিনে)
৫। সেই মস্ত চুপকে **বাঁশির সুর** দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। (মেঘদূত)
৬। আমার **গান** চলুক উড়ে। (মেঘদূত)
৭। চোখের জলের **গান**[১]। (মেঘদূত)
৮। **মেঘমল্লারের** সব **মিড়গুলি**। (মেঘদূত)
৯। পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন **সেতারের দ্রুত তালের গতের** মতো। (ভুল স্বর্গ)
১০। এর **পূরবী** ওর **বিভাসকে** আশীর্বাদ করে চলে যাক। (সন্ধ্যা ও প্রভাত)
১১। **যন্ত্রটা** হাতে নিয়ে গানে **মল্লারের সুর** লাগালেম। (একটি দিন)
১২। কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের **পিলু বারোয়াঁ**। (সতেরো বছর)
১৩। দুলহা-দুলহীর গান, **সাহানার** সুরে। (উপসংহার)
১৪। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন **কোমল-ঠাটে** আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল (পুনরাবৃত্তি)
১৫। **গানের তান** বেড়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ **সপ্তক** থেকে কোন্ **সপ্তকে** চড়ল তার ঠিকানা নেই। (প্রাণমন)
১৬। যখন পুজোর নহবত **ভৈরবীতে** বাজে। (গলি)
১৭। **বীণার** তারের। (মেঘদূত)
১৮। ওদের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে **জয়ভেরী** বেজে উঠল। (সন্ধ্যা ও প্রভাত)
১৯। বর্ষা **ডমরু** বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে! (গলি)
২০। আচার্য মেয়েটিকে আপন **তম্বুরাটির** মতো কোলে নিয়ে মানুষ করেছে। (উপসংহার)
২১। একদিন সেই **শমে** এসে সে থামল। (রাজপুত্তুর)

শব্দ/ধ্বনি

১। অর্ধেক রাত্রে দেখি দরজাগুলো খড়্ খড়্ শব্দে কাঁপছে। (বাণী)
২। গির্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে। (বাণী)
৩। তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগল। (পুরোনো বাড়ি)
৪। বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে। (রাজপুত্তুর)

১। তুলনীয় : 'এ কি চোখের জলের গান', গীতবিতান, দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ষা ৫০, পৃ. ৪৪৭ (এ গানের প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৩২)

৫। তালপাতার বাঁশি-ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে। (রাজপুত্তুর)
৬। ক্ষীণ স্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করছে। (ঘোড়া)
৭। ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্‌বকম্‌ মিইয়ে আসে। (অস্পষ্ট)
৮। কোকিল ডেকে উঠল, কুহু কুহু কুহু কুহু। (পরীর পরিচয়)

পথ

১। কালের উজান **পথ** বেয়ে। (মেঘদূত)
২। ঘাসের গন্ধে ভরা **বনপথ**। (মেঘদূত)
৩। ওদের জন্যে **পথের** ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; **রাস্তা** ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে। (সন্ধ্যা ও প্রভাত)
৪। আমাদের এই শান-বাঁধানো **গলি**। (গলি)
৫। বেদীর উপর দিয়ে **পথ** হয়ে গেছে। (মুক্তি)
৬। খ্যাপা **পথের** ধারে। (আগমনী)
৭। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা **পথ** নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে। (প্রথম চিঠি)
৮। **পথ** কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে সমস্ত লুপ্ত[১] ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব হচ্চে? (পায়ে-চলার পথ)

মানুষ

১। মানুষ সমুদ্র পার হল, পর্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতালপুরীতে সিঁধ কেটে মণি-মানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আর একজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা— এ কিছুতেই পারলে না। (মেঘলা দিনে)
২। দুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। (মেঘদূত)

১। লুপ্ত ফুলের সূত্রে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গানের এইসব ছত্র :

সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার আসে (বর্ষা ১২৪)
লুপ্ত তারার পথে চলে কাহার সুদূর স্মৃতি (বর্ষা ১৩৫)
উতলা করে সারাবেলা কার লুপ্ত হাসি (প্রেম ১২৮)
তবে আসুক-না সেই তিমির রাতি লুপ্তিনেশার চরম সাথি (প্রেম ১৮০)
লুপ্ত আলোয়, পাখির সুপ্ত গানে (পূজা ৫৩৪)

(এখানে অনেকেরই হয়তো মনে পড়ে যাবে ল্যুইস ক্যারলের 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর ছবিসহ এই অংশটি : "All right" said the cat; and this time it vanished quite slowly, beginning with the end of the tail, and ending with the grin, which remained some time after the rest of it had gone.

"Well!" I've often seen a cat without a grin," thought Alice, "but a grin without a cat! It's the most curious thing I ever saw in all my life.")

৩। শুধু শিশুবয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, মুখে মুখে, লেখায় লেখায়, গল্প যা জমে উঠেছে তা মানুষের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেছে। (গল্প)
৪। মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায়। (রাজপুত্তুর)
৫। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই। (কর্তার ভূত)
৬। মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চলতে হয়। (প্রাণমন)

লিপিকা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ অজস্র ছবি এঁকেছেন কথা দিয়ে। এখানে রইল তার কিছু নির্দশন :

১। এই তো পায়ে চলার পথ।
এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর ধারে, খেয়া-ঘাটের পাশে বটগাছ-তলায় ; তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে ; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে, কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁচেছে জানি নে। (পায়ে-চলার পথ)
২। তার মনটি যেন বেণুবনের উপর-ডালের পাতা, কেবলই ঝির্ ঝির্ কাঁপছে। (বাণী)
৩। আজ দেখি সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে— বাদল-শেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়। (বাণী)
৪। তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানা-ভেজা পাখির মতো। (বাণী)
৫। সূর্যাস্তের একটা রক্তরশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এল। (বাণী)
৬। বহুদূরের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়েরের কাছে নত হয়ে পড়ল। (মেঘদূত)
৭। বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল। (মেঘদূত)
৮। যখন সেখানকার মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম, তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপর দাঁড়িয়ে। (বাঁশি)
৯। ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে ; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো[১]... ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে। (সন্ধ্যা ও প্রভাত)
১০। দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নখ দিয়ে খুঁড়ে চড়ুই পাখি ধুলোয় পাখা ঝাপট দেয়, চণ্ডীমণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মতো দল বাঁধল। (পুরোনো বাড়ি)
১১। বালি-ধসা ইঁট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। (পুরোনো বাড়ি)
১২। দেখি, বারান্দা থেকে লাল-পেড়ে শাড়ি ঝুলছে। (পুরোনো বাড়ি)
১৩। ছাদে আলসের 'পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ। (পুরোনো বাড়ি)
১৪। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে। (পুরোনো বাড়ি)

১। তুলনীয় : 'প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথার সোনার রঙের চন্দন পরালে' ; 'দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল' ।—শিশুতীর্থ

১৫। পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে প'ড়ে চমকিয়ে দিতে থাকে। (গলি)
১৬। ঝি কোমরে ঝুড়ি ক'রে বাজার নিয়ে আসে। (গলি)
১৭। ওই দেখো-না, গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা। (কৃতঘ্ন শোক)
১৮। ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠেছে। (কৃতঘ্ন শোক)
১৯। সাত বছরের ছেলেটি— গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ— একলা গলির উপরকার জানলার ধারে। (প্রশ্ন)
২০। দুয়ারে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিকটিকি। সামনে খোলা ছাদ। (প্রশ্ন)
২১। চারি দিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো। (প্রশ্ন)
২২। সকালের আলো তখন আধ-ফোটা পদ্মের মতো সবে জাগছে, এমন সময় সাজি-হাতে পূজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগল। (মীনু)
২৩। আমি দেখেছি, দেখেছি, ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মারলে। (মীনু)
২৪। তবু দু-চারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে ব'লে উঁকি মারছে। (ভুল স্বর্গ)
২৫। এ যে শহর! ট্র্যাম চলেছে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশি-ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে। (রাজপুত্তুর)
২৬। পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপা গাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। (সুয়োরানীর সাধ)
২৭। বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি, তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে খেতের শাক।[১] (সুয়োরাণীর সাধ)
২৮। প্রবীণা জানালার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়ছে। (অস্পষ্ট)
২৯। মেয়েটি দিনান্তের শেষ আলোতে ঝুঁকে পড়ে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে মাজছে। (অস্পষ্ট)
৩০। আল্‌সের উপরে একটা কাক আধ-খাওয়া আমের আঁঠি ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। (অস্পষ্ট)
৩১। কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা ; ছাদের উপর আকাশপ্রদীপ জ্বলছে, আস্তাবলের ধোঁওয়া অজগর সাপের মতো পাক দিয়ে আকাশের নিশ্বাস বন্ধ করে দিলে। (অস্পষ্ট)
৩২। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর সুভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইঁদারায় বলদে ক্যাঁ-কোঁ করে জল টানে। (অস্পষ্ট)
৩৩। মেয়েটি শাক-পাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধছে। (পুনরাবৃত্তি)
৩৪। এমন সময় সূর্য উঠল পূর্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদারুর শিশির-ভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠল। (প্রথম চিঠি)
৩৫। ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শাল ফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষ ফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে। (পরীর পরিচয়)
৩৬। শয়নঘরে বিছানায় সাদা আস্তরণ, তার উপর সাদা কুন্দফুল রাশ করা ; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। (পরীর পরিচয়)

১। তুলনীয় : রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি। —দ্বিতীয় পাঠ, 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ।

৩৭। তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পুবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের সার ; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এমনি জটলা করেছে যে দিগন্ত দেখা যায় না। (প্রাণমন)

৩৮। চাঁদের আলোয় তাল গাছের পাতায় পাতায় কাঁপন ধরেছে : বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে চোখে ইশারা। (কথিকা)

লিপিকার সমস্ত রচনাই ইংরেজিতে অনূবাদিত হয়েছে। *The Fugitive* (1922) গ্রন্থভুক্ত কয়েকটি রচনার অনুবাদ প্রসঙ্গেই এই আলোচনা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনুবাদে মূল রচনার শিরোনামের পরিবর্তে সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম শোক (II / 27)

মূল ॥ বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

অনুবাদ ॥ I was walking along a path overgrown with grass

'বনের ছায়াতে' মিলিয়ে গেছে অনুবাদে।

মূল ॥ পঁচিশ বছর বয়সের শোক।

অনুবাদ ॥ that first great Sorrow whom you met when you were young.

মূল ॥ তার চোখের কোণে একটু ছলছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অনুবাদ ॥ Her eyes looked like a morning whose dew is still in the air.

'শ্রাবণের মেঘের মতো কালো' 'আশ্বিনের সোনার প্রতিমা' অননুবাদিত।

'বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি লিখে নিয়েছে।' অনুবাদে এই বাক্যটি নেই। অন্তর্লীন বেদনা আছে এইভাবে : I felt that her tears had had time to learn the language of smiles.

মূল ॥ আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, 'একি তোমার অপরূপ মূর্তি!'

অনুবাদ ॥ Then I took her hand in mine and said, "But you have changed."

বাণী (III / 9)

মূলের অধিকাংশই বর্জিত হয়েছে অনুবাদে। এটি যেন মূল অবলম্বিত একটি স্বতন্ত্র রচনা।

মূল ॥ আজ দেখি সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে— বাদল-শেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়।

অনুবাদ ॥ A little girl stands at her window, still as a rainbow at the gate of a broken-down storm.

মূল ॥ ও তাই বড়ো বড়ো চোখ মেলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল— যেন অনন্তকালেরই প্রতিমা

so there she stands, possessed by eternity!

প্রশ্ন (II / 21)

'সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নিম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে ; কাঁচা-আম-ওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।' —অনুবাদে এই অনুচ্ছেদটি বর্জিত।

মূল ॥ দুয়ারে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো, দেয়ালের গায়ে এক জোড়া টিকটিকি।

অনুবাদ ॥ A lamp dimly burned near the bedroom door, and a lizard chased moths on the wall. দেখাই যাচ্ছে অনুবাদে ছবিটা বদলে গেছে কতটাই! (টিকটিকির পোকা ধরার ছবি পাওয়া যাবে 'গোরা'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে : 'আলোর কাছে দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি পোকা ধরিতেছে।')

মূল ॥ সামনে খোলা ছাদ, কখন খোকা সেইখানে এসে দাঁড়ালো।

অনুবাদ ॥ The boy woke up from sleep, felt with his hands the emptiness in the bed, and stole out to the open terrace.

মূল ॥ আকাশে তার কোনো সাড়া নেই; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

অনুবাদ ॥ No answer came : and the stars seemed like the burning tears of that ignorant darkness.

পুরোনো বাড়ি (III / 22)

The house, lingering on after its wealth has vanished, stands by the wayside like a madman with a patched rag over his back.

এইভাবে শুরু হয়েছে ভাষান্তর। শুরুতেই যে madman-এর কথা বলা হয়েছে, মূলে তা আছে অনেক পরে, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে : 'বালি-ধসা ইঁট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, আপনাকেও দেখে না, অন্যকেও না।' —দু জায়গায় 'পাগল'-এর ছবি দুরকম।

মূলে তৃতীয় অনুচ্ছেদে পুরোনো বাড়ির বর্তমান অবস্থা যে-ছবিতে আঁকা হয়েছে, 'দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নখ দিয়ে খুঁড়ে চড়ুই পাখি ধুলোয় পাখা ঝাপট দেয়, চণ্ডীমণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মতো দল বাঁধল,' অনুবাদে তা অনুপস্থিত। সেখানে আমরা পাই নতুন ছবি, 'rainy months leave their fantastic signatures on its bared bricks'. বর্জিত 'তিন-মহল বাড়ি'র বিবরণ।

মূল ॥ দেখি, বারান্দা থেকে লাল-পেড়ে শাড়ি ঝুলছে।

অনুবাদ ॥ Over the balcony-rail women's clothes are hung in the sun
উধাও 'লাল-পেড়ে শাড়ি'। এসেছে নতুন এক ছবি যা মূলের কোথাও নেই : a bird whistles from a covered cage, and a boy plays with his kite on the terrace.

মূল ॥ শোবার ঘরে ভাঙা জানলা ইঁট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে

অনুবাদ ॥ an empty box keeps the boltless gate shut.
চতুর্থ ভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদে পুরোনো বাড়ির ছাদের একটা ছবি ছিল। অনুবাদে সেটি বর্জিত। ছবিটা এই : 'ছাদে আলসের 'পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগল।'

['খিল খিল' হাসির অনুষঙ্গে মনে পড়ে যায় 'আগমনী'র এই ছবি : 'আর একটি শিশু, সে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।']

আগমনী (I / 21)

ভাষান্তর যেভাবে শুরু হয়েছে মূলে সেভাবে নেই। মূলের দুটি অনুচ্ছেদকে খানিকটা এক করে নেওয়া হয়েছে এইভাবে : "Why these preparations without end?"– I said to Mind– "Is some one to come?"

এর পর 'মন'-এর সঙ্গে 'আমি'র কথোপকথন অনেকটা সম্পাদিত হয়েছে।

মূল ॥ এমন সময়ে একদিন বাদলের মেঘ কেটে গেল ; কালো মেঘ হল সাদা ;

অনুবাদ ॥ The season of rains came to an end. The dark clouds became white and thin.

মূল ॥ কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরোঁর তান নিয়ে ছুটির হাওয়া বইল, মানস-সরোবরে পদ্মগন্ধে দিনরাত্রির দণ্ডপ্রহরগুলোকে মৌমাছির মতো উতলা করে দিলে।

অনুবাদ ॥ and in the rain-washed sky the sunny hours hovered like butterflies over an unseen flower.

মূল ॥ একটা খ্যাপা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে মাথায় কুন্দফুলের মালা জড়িয়ে চুপ করে বসে ছিল।

অনুবাদ ॥ A tramp walked the road whose dress v as wild as his manner;

মূল ॥ মন চার দিকে তাকিয়ে দেখলে।
কী দেখতে পেলে ?
শরৎপ্রভাতের শুকতারা।
... ...
আর কী ?
আর একটি শিশু, সে খিল্ খিল করে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

অনুবাদ ॥ Mind looked about. But what was there to see? Only the morning star and the lily washed in dew. And what else? A child running laughing from its mother's arms into the open light.
এখানে মূলের বর্জিতাংশের ভেতর ছিল 'ল্যাজ দুলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখি'।

মূল ॥ 'ওই শিশু তোমাকে কী বর দেবে ?'
'ওই তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে। ওরই গোপন তূণে লুকোনো থাকে ব্রহ্মাস্ত্র, ওরই হৃদয়ের মধ্যে ঢাকা আছে শক্তিশেল।

অনুবাদ ॥ 'What does the child bring you?'
'Hope for all the world and its joy.'

মূল ॥ মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'হাঁ গো কবি, কিছু দেখতে পেলে, কিছু বুঝতে পারলে ?' আমি বললেম, 'সেই জন্যেই ছুটি নিয়েছি। এতদিন সময় ছিল না, তাই দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি।'

অনুবাদ ॥ Mind asked me, 'Poet, do you understand?'
'I lay my work aside,' I said, 'for I must have time to understand.'
অনুবাদে মূলকে অনেকটাই সংহত করা হয়েছে।

কৃতঘ্ন শোক (II / 22)

মূল ॥ আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, 'সবই মায়া।'

অনুবাদ ॥ My mind tried to console me by saying, 'All is vanity.'

মূল ॥ আমি রাগ করে বললেম, 'এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাদে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাত-পাখাখানি— সবই তো সত্য !'

অনুবাদ ॥ I felt angry and said, 'That unopened letter with her name on it, and this palm-leaf fan bordered with red silk by her own hands, are they not real?'

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অনুবাদে বর্জিত হয়েছে টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাদে ফুলগাছের টব। পরিবর্তে যুক্ত হয়েছে 'না-খোলা চিঠি', 'নাম-লেখা হাত-পাখাখানি' হয়েছে 'লাল রেশমি ঝালর-দেওয়া'। 'জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠেছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি!' —অনুবাদে এই ছবি বর্জিত।

মূল ॥ ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?

অনুবাদ ॥ 'You pour out into the void of my absence your faith in the truth that I came!'
—অনুবাদে সুরান্তর ঘটেছে।

সতেরো বছর (II / 24)

মূলে, প্রথমাংশে আছে কিছুটা স্মৃতিকথা, স্মৃতিচারণা। সেই সূত্রে বলা হয়েছে, 'আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত।' —এই ডাকা দিয়ে শুরু হয়েছে ভাষান্তর :
The name she called me by, like a flourishing jasmine, covered the whole seventeen years of our love.
লক্ষ করবার যে অনুবাদে যে ভালোবাসা বা love-এর কথা বলা হয়েছে মূলে তা সম্পূর্ণতই অনুচ্চারিত।

অনুবাদে পাই : With its sound mingled the quiver of the light through the leaves, the scent of the grass in the rainy night, and the sad silence of the last hour of many an idle day.

মূলে কিন্তু এর কোনোই উল্লেখ নেই।

মূল ॥ ওই নামে যে মানুষ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে-মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

অনুবাদ ॥ Not the work of God alone was he who answered to that name; she created him again for herself during those seventeen swift years.

অনুবাদ প্রসঙ্গে এই কথাটা স্মরণীয় : 'আপনি যেভাবে তর্জ্জমা করিয়াছেন ইহাই আমার কাছে ভাল বোধ হইল। বাংলায় যে সকল অলংকার শোভা পায় ইংরাজিতে তাহা কোনোমতেই উপাদেয় হয় না এইজন্য বাংলা মূলের অনেকটা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। ইংরাজিতে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত বক্তব্য বিষয়টির অনুসরণ করিলেই ভাল হয়।'

—যদুনাথ সরকারকে লিখিত পত্র, ১৭ আশ্বিন, ১৩১৭

পাঠান্তর

'রবীন্দ্রনাথের অন্য বহু রচনায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি সাময়িকের ও পুস্তকের পাঠে বহু স্থলে' মিল নেই। এখানে তেমনি তিনটি রচনার পাঠান্তর দেওয়া হল।

মেঘলা দিনে

মানুষ সমুদ্র পার হয়েচে, পর্ব্বত ডিঙিয়ে গেচে, পাতালপুরী সিঁধ কেটে মণি-মানিক চুরি করে এনেচে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আরেকজনকে চুকিয়ে দেওয়া, এ কিছুতেই পারলে না।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরচে। ভিতরের মানুষ বলচে, "আমার চিরদিনের আপন কোথায়, যে আমার শ্রাবণ-মেঘকে ফতুর করে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে!"

যা-কিছু দেখি শুনি, তারা চোখের কানের দেউড়ি পেরিয়ে চলে যায় ভিতর মহলে ; সেখানে অদৃষ্ট ছবিতে অশ্রুত গানে গাঁথা পড়ে। মনের সেই না-দেখা না-শোনা জগৎ বলে, "আমি দেখা-শোনার দেশে ধরা দেব।" রোজই বলে, কিন্তু কাজের গোলমালে সে কথা কানে পৌঁছয় না।

আজ মেঘলা সকালে শুন্‌চি, সেই ভিতরের কথাটা বন্ধ দরজার শিকল নেড়ে সারা হল। ভাবচি, "কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে?"

আজ মেঘলা সকালে মন বল্‌চে, "আমার কাছে ঠিক মন্ত্রটি বলে' যে চাইতে পারে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্ব্বনেশে ভিখারী রাস্তার কোন্ মোড়ে? যদি সে আমার দুয়ার খুঁজে না পায়, হাত বাড়িয়ে না দাঁড়াতে পারে, তাহলে কি আছে আমার তা নিজেই জান্‌ব না, কাউকে জানাতেও পারি না। কেবলি বইব, কোথাও পৌঁছে দেব না, এ কি চিরদিন সইতে পারি?"

তাই আজ আমার কাজে মন নেই। আজ আমার ভিতরের আকাশে অমনিতর অকেজো মেঘ অমনিতর অকারণ হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্চে। তাদের নানা মূর্ত্তি, তাদের নানা খেলা ; তারা নানা বিদ্যুতে চমক দেয়, নানা বজ্রে বাজে, নানা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় ; কিন্তু তাদের অন্তরে অন্তরে আমার জীবন-জোড়া একটিমাত্র বৃহৎ কান্না।

অক্ষমতা/ভারতী : আশ্বিন ১৩২৬

গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ

রোজই থাকে সমস্ত দিন কাজ, আর চার দিকে লোকজন। রোজই মনে হয়, সেদিনকার কাজে সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বুঝি একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়। ভিতরে কোন্ কথাটি যে বাকি রয়ে গেল, তা বুঝে নেবার সময় পাওয়া যায় না।

আজ সকাল বেলা মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে। আজও সমস্ত দিনের কাজ আছে সামনে, আর লোক আছে চার দিকে। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা-কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।

মানুষ সমুদ্র পার হল, পর্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতালপুরীতে সিঁধ কেটে মণি-মানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আর-একজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা— এ কিছুতেই পারলে না।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরছে। ভিতরের মানুষ বলছে, 'আমার চিরদিনের সেই আর-একজনটি কোথায়, যে আমার হৃদয়ের শ্রাবণমেঘকে ফতুর করে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে!'

আজ মেঘলা দিনের সকালে শুনতে পাচ্ছি, সেই ভিতরের কথাটা কেবলই বন্ধ দরজার শিকল নাড়ছে। ভাবছি, 'কী করি! কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে! কে আছে যার চোখের একটি ইশারায় আমার সব ছড়ানো ব্যথা এক মুহূর্তে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জ্বলে উঠবে! আমার কাছে ঠিক সুরটি লাগিয়ে চাইতে পারে যে, আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্বনেশে ভিখারি রাস্তার কোন্ মোড়ে!'

আমার ভিতর-মহলের ব্যথা আজ গেরুয়াবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে— যে পথ একটিমাত্র সরল তারের একতারার মতো, কোন্ মনের মানুষের চলায় চলায় বাজছে!

সওগাত

পৌষপার্ব্বণ এল। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসি কাপড়, কত সোনার অলঙ্কার, আর ভাণ্ড ভরে ক্ষীর, দই, পাত্র ভরে মিষ্টান্ন।

মা সওগাত পাঠাচ্চেন। বড় ছেলে বিদেশে রাজ-সরকারে কাজ করে; মেজো ছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না: আরো কটি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে পৃথক পৃথক বাড়ি করেচে। কুটুম্বেরা আছে নানা দেশে ছড়িয়ে।

কাছে থাকে কোলের ছেলেটি। সে আজ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারাদিন ধরে দেখ্‌চে, ভারে ভারে সওগাত, সারে সারে দাস দাসী, থালাগুলি রঙ-বেরঙের রুমালে ঢাকা।

দিন ফুরিয়ে আসে। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষ-নৈবেদ্যের ডালি নিয়ে ঘোমটা-মাথায় গোধূলি নক্ষত্রলোকের পথে নিরুদ্দেশ হল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, "মা, সবাইকে তুই ভারি ভারি সওগাত দিলি কেবল আমাকে না!"

মা হেসে বললেন, "সবাইকে সব দেওয়া হল এখন তোর জন্যে কি বাকি রইল দেখ্!" এই বলে তার কপাল চুম্বন করলেন।

ছেলে কাঁদো-কাঁদো সুরে বল্‌লে, "সওগাত পাব না?"

"নির্ব্বোধ, যখন দূরে চলে যাবি সওগাত পাবি।"

"আর যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিষ দিবিনে?"

মা তাকে কোলে তুলে নিয়ে বল্‌লেন, "এই ত আমার হাতের জিনিষ।"

শান্তিনিকেতন পত্র। পৌষ ১৩২৬

গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ

পুজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসি কাপড়, কত সোনার অলংকার; আর ভাণ্ড ভ'রে ক্ষীর দই, পাত্র ভ'রে মিষ্টান্ন।

মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।

বড়ো ছেলে বিদেশে রাজ-সরকারে কাজ করে; মেজো ছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না; আর-কয়টি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে পৃথক পৃথক বাড়ি করেছে; কুটুম্বরা আছে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে।

কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারাদিন ধরে দেখছে— ভারে ভারে সওগাত চলেছে, সারে সারে দাসদাসী, থালাগুলি রঙ-বেরঙের রুমালে ঢাকা।

দিন ফুরোল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষ নৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভা নক্ষত্রলোকের পথে নিরুদ্দেশ হল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, 'মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না!'
মা হেসে বললেন, 'সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্যে কী বাকি রইল এই দেখ্।'
এই বলে তার কপালে চুম্বন করলেন।
ছেলে কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে, 'সওগাত পাব না?'
'যখন দূরে যাবি তখন সওগাত পাবি।'
'আর, যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিস দিবি নে?'
মা তাকে দু হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন; বললেন, 'এই তো আমার হাতের জিনিস।'

মুক্তি

যাবার সময় পুরুষ বল্‌লে, আমাকে যেতেই হবে।
মেয়ে বল্‌লে, যেতেই হবে এমন কি কথা?
পুরুষ বল্‌লে, নইলে আমার কাজ নষ্ট হবে।
মেয়ে বল্‌লে, যদিই বা কাজ নষ্ট হয় তাতেই বা কি?
পুরুষ বল্‌লে, তাহলে আমার সমস্ত জীবন মিছে হবে।
মেয়ে বল্‌লে, আর আমি কি করে বাঁচব?
পুরুষ বল্‌লে, এই কথা মনে করে যে তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েচ।
মেয়ে বল্‌লে, আর আমি মুক্তি পাব কি করে?
পুরুষ বল্‌লে, আমাকে যখন সম্পূর্ণ করে পাবে।
মেয়ে বল্‌লে, সম্পূর্ণ করে পেতে হয় কি করে?
পুরুষ বল্‌লে, ত্যাগ করে।
মেয়ে রাগ করলে, বললে, তোমার পথে তুমি যাও আমার পথ আমি জানি।
পুরুষ চলে গেল কাজে।
মেয়ে তার বাগানের একধারে বেদী সাজিয়ে তার উপর পুরুষের একটি মূর্ত্তি গড়তে বসল। প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে আর চেয়ে দেখে আর ভাবে আর তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে।

কিন্তু একদিন মনের মধ্যে যে রূপটি স্পষ্ট ছিল তার উপরে যেন ছায়া পড়ে আসছে, রাতের বেলাকার পদ্মের মত স্মৃতির যেন পাপড়ি মুদে আসে।

মেয়ে তখন নিজের উপর রাগ করে বলে, আমার কাজ নেই, কেবল আমার স্মৃতি আছে, সেই আমার গর্ব্ব, সেই আমার সান্ত্বনা, অভাগিনী সেও তুই হারাতে বসেছিস্?

তখন সে কেবল ফল আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে থাকে, আর সংসারের দিকে তাকায় না; বলে আমার স্মৃতির দিক থেকে একটুও চোখ ফেরাব না, আমার শোকের উপর একটুও যেন ছাইচাপা না পড়ে।

গড়তে গড়তে মূর্ত্তি আর প্রতিমূর্ত্তি রইল না। মনে হল যেন কোনো বিশেষ মানুষের ছবি নয়, যতই বেশী চেষ্টা করে ততই বেশী তফাৎ হয়ে যায়।

তখন মূর্ত্তিকে গয়না দিয়ে সাজাতে লাগল, তাকে একশো এক পদ্মের ডালি দিয়ে পুজো দেয়; সন্ধে

বেলায় গন্ধ তৈল দিয়ে তার সামনে প্রদীপ জ্বালায় ; সে প্রদীপ সোনার, সে তেলের অনেক দাম।

দিনে দিনে গয়না বেড়ে ওঠে, পূজার আয়োজনে বেদী ঢেকে যায়, মূর্ত্তিকে দেখা যায় না।

দেশের সব মেয়ে বলে ধন্য। এমন করে আপন স্মৃতিকে পুজো করতে কজন পারে ? এত ব্যয়, এত সমারোহ, এত দিনরাতের নিরন্তর যত্ন।

এক ছেলে এসে তাকে বল্‌লে, আমরা খেলব।

কোথায় ?

ঐখানে, যেখানে তোমার পুতুল সাজিয়েচ।

মেয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয়, বলে, এখানে কোনোদিন খেলা হবে না।

আর এক ছেলে এসে বলে, আমরা ফুল তুলব।

কোথায় ?

ঐ যে তোমার পুতুলের ঘরের উপরে যে চাঁপা গাছ হয়েছে, ঐ গাছ থেকে।

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়, বলে, এ ফুল কেউ তুলতে পাবে না।

আরেক ছেলে এসে বলে, প্রদীপ ধরে আমাদের পথ দেখিয়ে যাও।

কোন্ প্রদীপ ?

ঐ যে-প্রদীপ তোমার পুতুলের ঘরে জ্বালো।

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়, বলে, ও প্রদীপের আলো ওখান থেকে সরাতে পারব না।

এক ছেলের দল যায়, আরেক ছেলের দল আসে, মেয়ে তাদের তাড়িয়ে রাখবে বলে সারাদিন একলা বসে পাহারা দেয়।

পাহারা দেয় আর শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য আর ছুটোছুটি ; আর অন্যমনস্ক হয়ে যায়, পাহারার কথা ভুলে যায়, অমনি তখন চমকে ওঠে ; লজ্জা পায়, তখনি মূর্ত্তির সামনে গিয়ে বসে, খুব শব্দ করে করতাল বাজায় আর স্তবগান করে।

মেলার দিন কাছে এল। বারো বছর পরে মহামেলা। দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসবে। ছেলে বুড়ো সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠেচে।

পাড়ার বুড়ো এসে বল্‌লে, বাছা, মেলা দেখতে যাবিনে ? আমরা সবাই চলেচি।

মেয়ে বল্‌লে, না, আমি কোথাও যাব না।

সঙ্গিনী এসে বল্‌লে, সই, মেলা দেখ্‌বি চল, আমরা চলেচি।

মেয়ে বল্‌লে, আমার যাবার সময় নেই।

ছোট ছেলেটি এসে বললে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় চল না, সবাই যাচ্চে।

মেয়ে বল্‌লে, যেতে পারব না, এইখানে আমার পুজো।

রাত্রে মেয়ে তার ঘুমের মধ্যেও শুনতে পেলে সমুদ্রের গর্জ্জনের মত শব্দ। দলে দলে দেশ বিদেশের লোক চলেচে, কেউ বা রথে কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বা বোঝা পিঠে নিয়ে, কেউ বা বোঝা ফেলে দিয়ে।

সকালে যখন সে জেগে উঠ্‌ল তখন যাত্রীদের গানে পাখীর গান আর শোনা যায় না ; ওর হঠাৎ মনে হল আমাকেও যেতে হবে।

অমনি চমকে মনে পড়ল, আমার যে পূজা আছে, আমার তো যাবার জো নেই।

তখনি ছুটে চল্‌ল তার বাগানের দিকে, যেখানে মূর্ত্তি সাজিয়ে রেখেচে।

গিয়ে দেখে, মূর্ত্তি কোথায়। বেদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেচে। লোকের পর লোক চলে, বিশ্রাম নেই।

এইখানে যাকে বসিয়ে রেখেছিলেম, সে কোথায় ?

কে তার মনের মধ্যে বলে উঠ্‌ল, যারা চলেচে তাদেরই মধ্যে।

এমন সময় ছোট ছেলে এসে বল্‌লে, আমাকে হাত ধরে নিয়ে চল।

কোথায় ?

ছেলে বল্‌লে, মেলার মধ্যে। তুমিও যাবে না?

মেয়ে বল্‌লে, হ্যাঁ, আমিও যাব।

যে বেদীর সাম্‌নে এসে সে বসে থাকত, সেই বেদীর উপরে হ'ল তার পথ। আর মূর্ত্তির মধ্যে যে ঢাকা পড়েছিল, সকল যাত্রীর মধ্যে তারই দেখা পেলে।

শান্তিনিকেতন। পৌষ ১৩২৬

গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ

বিরহিণী তার ফুলবাগানের এক ধারে বেদী সাজিয়ে তার উপর মূর্তি গড়তে বসল। তার মনের মধ্যে যে মানুষটি ছিল, বাইরে তারই প্রতিরূপ প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে, আর ভাবে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কিন্তু, যে রূপটি একদিন তার চিত্তপটে স্পষ্ট ছিল তার উপরে ক্রমে যেন ছায়া পড়ে আসছে। রাতের বেলাকার পদ্মের মতো স্মৃতির পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে যেন মুদে এল।

মেয়েটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তাব কঠিন হল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে থাকে।

মূর্তিটি মনের ভিতর থেকে গড়তে গড়তে সে আর প্রতিমূর্তি রইল না। মনে হল, এ যেন কোনো বিশেষ মানুষের ছবি নয়। যতই বেশি চেষ্টা করে ততই বেশি তফাত হয়ে যায়।

মূর্তিকে তখন সে গয়না দিয়ে সাজাতে থাকে, একশো-এক পদ্মের ডালি দিয়ে পুজো করে, সন্ধেবেলায় তার সামনে গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বালে— সে প্রদীপ সোনার, সে তেলের অনেক দাম।

দিনে দিনে গয়না বেড়ে ওঠে, পুজোর সামগ্রীতেই বেদী ঢেকে যায়, মূর্তিকে দেখা যায় না।

২

এক ছেলে এসে তাকে বললে, 'আমরা খেলব।'

'কোথায়?'

'ঐখানে, যেখানে তোমার পুতুল সাজিয়েছ।'

মেয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয়; বলে, 'এখানে কোনোদিন খেলা হবে না।'

আর-এক ছেলে এসে বলে, 'আমরা ফুল তুলব।'

'কোথায়?'

'ঐ-যে, তোমার পুতুলের ঘরের শিয়রে যে চাঁপাগাছ আছে ঐ গাছ থেকে।'

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়: বলে, 'এ ফুল কেউ ছুঁতে পাবে না।'

আর-এক ছেলে এসে বলে, 'প্রদীপ ধরে আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।'

'প্রদীপ কোথায়?'

'ঐ যেটা তোমার পুতুলের ঘরে জ্বালো।'

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়; বলে, 'ও প্রদীপ ওখান থেকে সরাতে পারব না।'

৩

এক ছেলের দল যায়, আর-এক ছেলের দল আসে।

মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য। ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অমনি চমকে ওঠে, লজ্জা পায়।

মেলার দিন কাছে এল।

পাড়ার বুড়ো এসে বললে, 'বাছা, মেলা দেখতে যাবি নে?'

মেয়ে বললে, 'আমি কোথাও যাব না।'

সঙ্গিনী এসে বললে, 'চল্, মেলা দেখবি চল্।'

মেয়ে বললে, 'আমার সময় নেই।'

ছোটো ছেলেটি এসে বললে, 'আমায় সঙ্গে নিয়ে মেলায় চলো-না।'

মেয়ে বললে, 'যেতে পারব না, এইখানে যে আমার পুজো।'

৪

একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সে যেন শুনতে পেলে সমুদ্রগর্জনের মতো শব্দ। দলে দলে দেশ-বিদেশের লোক চলেছে— কেউ বা রথে, কেউ বা পায়ে হেঁটে ; কেউ বা বোঝা পিঠে নিয়ে, কেউ বা বোঝা ফেলে দিয়ে।

সকালে যখন সে জেগে উঠল তখন যাত্রীর গানে পাখির গান আর শোনা যায় না। ওর হঠাৎ মনে হল, 'আমাকেও যেতে হবে।'

অমনি মনে পড়ে গেল, 'আমার যে পুজো আছে, আমার তো যাবার জো নেই।'

তখনই ছুটে চলল, তার বাগানের দিকে যেখানে মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে।

গিয়ে দেখে, মূর্তি কোথায়! বেদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেছে। লোকের পরে লোক চলে, বিশ্রাম নেই।

'এইখানে যাকে বসিয়ে রেখেছিলেম সে কোথায়?'

কে তার মনের মধ্যে বলে উঠল, 'যারা চলেছে তাদেরই মধ্যে।'

এমন সময় ছোটো ছেলে এসে বললে, 'আমাকে হাতে ধরে নিয়ে চলো।'

'কোথায়?'

ছেলে বললে, 'মেলার মধ্যে তুমিও যাবে না?'

মেয়ে বললে, 'হাঁ, আমিও যাব।'

যে বেদীর সামনে এসে সে বসে থাকত সেই বেদীর উপর হল তার পথ, আর মূর্তির মধ্যে যে ঢেকে গিয়েছিল সকল যাত্রীর মধ্যে তাকে পেলে।

ভারতীয় এবং অভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত লিপিকা

Gujrati : Dattatray Balkrishna Kalelkar: Ravindrasaurabh. Ahmedabad, Navjiban prakashan mandir, 1959. viii, 280p. 18cm. Rs 2.50. Tr from the Marathi version by Sarojini Kalelkar

Hindi : Devirprasad : Pagdani. Delhi, Rajpal & Sons, 1960. 155 illus. 18cm. Rs 3.00

Kamalaprasad Ray Sharma : Saugat. Varanasi, Bindeshwari prasad bookseller, n.d. 155p. 18cm. Rs 2.50

Marathi : Dattatray Balkrishna Kalelkar : Komvale kiran. Ahmedabad, Navjiban prakashan, 1955. x, 236p. 18cm. Rs 2.50. Includes commentary.

Czech : Crty, z bengalskeho originaln se svolenim spisovateloyam prelozil V. Lesny. Kladno. Nakladem J. Snajdra, 1926. 104p. 20cm. (Knipa-xi)

Dutch: De leerschool van den papegaai en toespraken in Shanti Niketan; met toestemming van den dichter bewerkt door Noto Soeroto. Teekeningen van Abanindranath Tagore. 'S-Gravenhage, Adi poestaka, 1922. 67p. front illus., port 32x24 cm. Tr of the parrot's training.

French : Le prince charmant (et quartoze autres contes); tr. par Amrita. Mouam-Sartoux (A.M.), Publications Chitra, C. A. Hogman, 1956. 104p. 1 1. col illus. 20cm (Feuilles de l'Inde, no 10)

German : In Wagner, Reinhard, tr. Bengalische Erzahler (der Sieg der Seele). Aus dem in dischen ins deutsche Übertragen. p 109-149

Italian : tr. d Promothonath Roy. Lanciano, Carabba, [1934]. iv p. 2 1, 9-136p. 17cm. (Scrittori Italiani e stranieri. Raconti)

লিপিকা-বিষয়ক রচনাদি

অজিত দত্ত। 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ'। কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৮
অবন্তীকুমার সান্যাল। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি। পৃ. ৫৩-৫৫
অরুণকুমার বসু। 'লিপিকার গদ্যভাষা'। বাঙলা গদ্য শৈলীবিজ্ঞান। পৃ. ১৪৫-১৬৮
জগদীশ ভট্টাচার্য। 'পুষ্পাঞ্জলি ও লিপিকা'। কবি ও কবিতা। ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা। পৃ. ৩২১-৩৫৮
জগদীশ ভট্টাচার্য। 'মেঘদূত'। কবি ও কবিতা। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪। পৃ. ৪৬৩-৪৭৪

তপোব্রত ঘোষ। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ। পৃ. ৩৪৪-৩৭৯
ধীরানন্দ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা। পৃ. ৬৩-২১২
পূর্ণেন্দু পত্রী। লেখালিখি ১। পৃ. ১৭০-১৮১
প্রমথনাথ বিশী। 'রবীন্দ্রনাথের লিপিকা'। বিশ্বভারতী পত্রিকা। মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯। পৃ. ১৯৬-২০১
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য। পৃ. ৫২-৬৫
শঙ্খ ঘোষ। ছন্দের বারান্দা। পৃ. ৫০-৫৭
শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। পুস্তক-পরিচয়। প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৬। পৃ. ৬০৭
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলো-আঁধারের সেতু/রবীন্দ্র চিত্রকল্প। পৃ. ১৫৪-১৫৬
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ'। কুলায় ও কালপুরুষ। পৃ. ৫০-৫২
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 'কাব্যের মুক্তি'। স্বগত। পৃ. ৩২-৩৩
সুশীলকুমার গুপ্ত। গদ্যকবিতা ও তার বিবর্তন : রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরসূরিবৃন্দ। পৃ ১৮৯—১৯৩
সুশীল রায়। 'লিপিকা'র রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ববাণী। বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, ১৯৬৬। পৃ. ১৫০-১৫২

কৃতজ্ঞতাস্বীকার ॥ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবন গ্রন্থাগার, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিতাভ ঘোষ, শ্রীসমররঞ্জন দে, শ্রীরণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশঙ্খ ঘোষ।
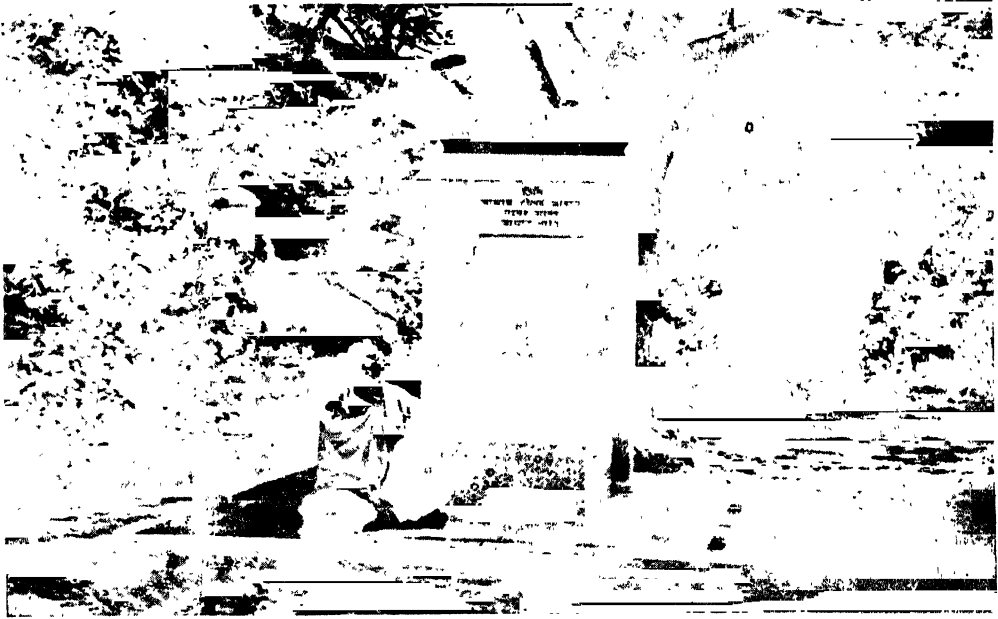
ছাতিমতলায় উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন মন্দির
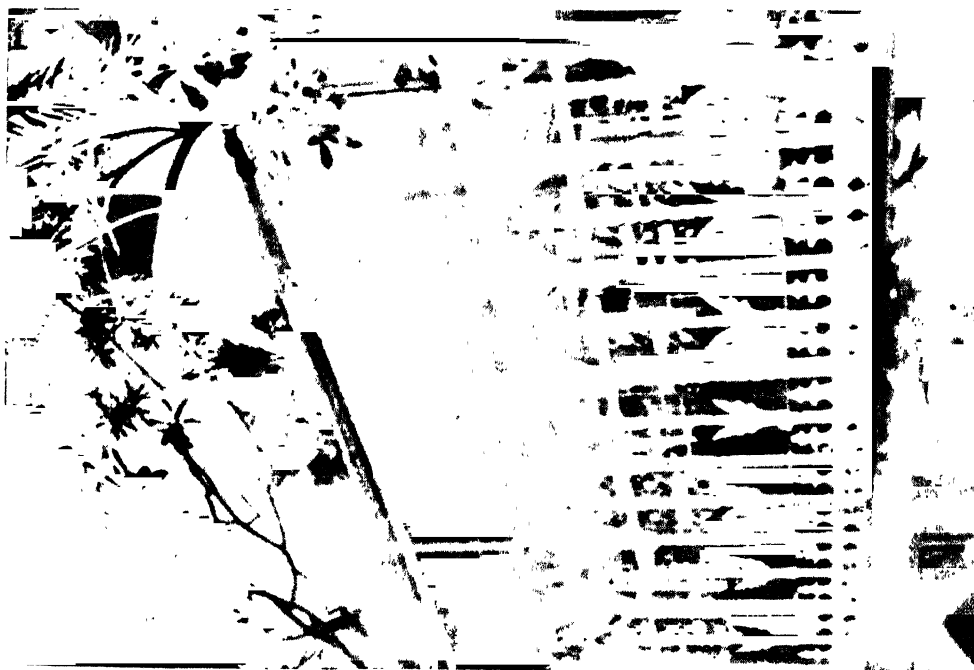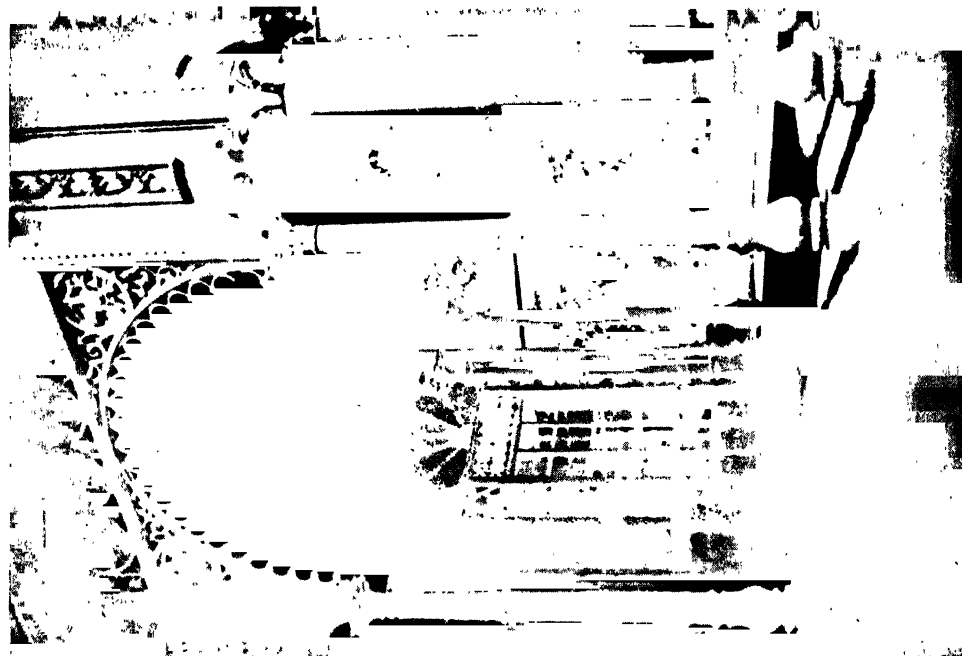
শান্তিনিকেতন মন্দিরের দুটি ভিন্ন দিকের কারুকার্য

শান্তিনিকেতন-স্থাপত্যরূপ, 'নির্মিত' পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

'ছিন্নপত্রাবলী'তে রবীন্দ্রনাথের আপন পছন্দের নীড় রচনা করে নেবার একটি সূত্র পাওয়া যায়। জীবনযাত্রায় সঠিক গৃহের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মনোগত একটি ইচ্ছার কথা যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। ১৮৯৫ সালে, এপ্রিল মাসে, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমি আজকাল কাজের তাড়ায় দোতলায় নেবে এসেছি। দক্ষিণের বারান্দার কোণে আমি যে একটি অলিন্দবেষ্টিত কাষ্ঠনীড় রচনা করে নিয়েছিলেম, সেইখানে আড্ডা করে নিয়েছি। ঘরে আর কোনো আস্‌বাব নেই, কেবল মাঝখানে তোদের প্রদত্ত সেই চীনে ডেস্ক এবং একটি মাত্র চৌকি। এ আমার পক্ষে একটি নতুন আবিষ্কার বললেই হয়— আমার তেতালার ঘরে কিছুতেই মন বসিয়ে লিখতে পারতুম না, মনে করতুম কলকাতার দোষ, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এ ঘরে এসে লেখার কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না, বেশ মন দিতে পারছি।... ঘরে কোনো আস্‌বাব না থাকাও একটা মস্ত সহায়। আমি দেখছি plain living, high thinking এর পক্ষে নিতান্তই দরকার— জড় পদার্থের বন্ধন যতটা পারা যায় ছেদন করে ফেলা আবশ্যক। জড় জিনিসগুলো মনের সঙ্গে কোনো মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না, তারা মনের মধ্যে কোনো নিত্যনূতন সংবাদ আনয়ন করে না— আসবাবগুলো চিরকালই একরূপ আকার ধারণ করে থাকে, কেবল উত্তরোত্তর মলিনতা সঞ্চয় করে, ওরা অলক্ষিতভাবে মনের পক্ষে ভার এবং বাধার স্বরূপ কাজ করে। আস্‌বাবের মধ্যে চারি দিকে যতটা সম্ভব আলোক এবং আকাশ সংগ্রহ করে রাখলে মনটা বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে অবাধে আপন কাজ করতে থাকে। সামনে গগনদের বাগানটিও আমার পক্ষে বড়ো সুবিধে হয়েছে। গঙ্গার ধারে আমার একটি বাগান থাকে— এবং নদীর ধারেই এক কোণে একটি পাথরে বাঁধানো পরিষ্কার তক্‌তকে নির্মল স্নিগ্ধ ঘর থাকে, ঠেসান দিয়ে বসবার মতো একটি কৌচ এবং লেখবার মতো একটি ডেস্ক থাকে, এবং বাকি সমস্তই কেবল বাগান এবং জল এবং আকাশ— ফুটন্ত ফুলের গন্ধ এবং পাখির ডাক— তা হলে চুপচাপ করে আপন কবির কর্তব্য করে যেতে পারি। এর চেয়ে ঢের কমেও পৃথিবীতে বেশ চলে যায়। এবং ঢের বেশিতেও অনেকে তিলমাত্র সুখ পায় না।" এই ছিন্নপত্রাবলীতেই রবীন্দ্রনাথ প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের কথাও বলেছেন। গৃহ তাঁর কাছে যেন নতুন স্বাধীনতা এনে হাজির করবার মতন : 'যতটা খুশি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মানুষের মানসিক সুখের যে একটা প্রধান অঙ্গ', সেটা তিনি সেই সময়েই অনুভব করতেন। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগের কারণে এও বলেছিলেন 'আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি', গাছপালা, নদী, মাঠ, কোলাহল নিস্তব্ধতা, সমস্তটা শুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরে, নিজের মতন করে পেতে চেয়েছেন।

কাছের প্রকৃতি ও পরিবেশকে জীবনযাত্রার অঙ্গনে নিয়ে আসতে, তাঁকে ভাবতে হয়েছিল গৃহস্থাপত্যে সরলতা, উপযোগিতা এবং সৌন্দর্য নির্মাণের অভিনবত্ব। বাইরের জগতের জীবন্তপ্রভাব যেন মুক্ত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারে, এমন ঘরবাড়ির কথা প্রত্যক্ষ ভাবে চিন্তা করেছেন। আরও চেয়েছেন 'আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে' সবুজ হিল্লোল তাঁর কাজের নেশায় যেন সদাই জুড়ে থাকে। সে কারণে নিরাভরণ সুন্দর গৃহকোণের জানালার আলোকে মনের এই ইচ্ছেটাকে খুঁজতে চাইতেন। কোনো রকম অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য স্থূলতা যেন মানুষের আবাসস্থলে শোভা না পায়— এটাই তাঁর চিন্তার, আবাসগৃহের, নির্মাণ সূত্র। মানুষের সুস্বাস্থ্যের উপায়ের মতনই বাসগৃহের সরলতার সঙ্গে নির্জনতা ও উপভোগ্যতা তাঁর মনের 'work shop'টিকেই যেন মেলে ধরল। এই সময়েই বলছেন 'জীবন ধারণ-রূপ আর্টের এই একটা প্রধান নিয়ম, এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ো শক্ত— একেবারে জোঁকের মতো লেগে থাকে—'। পরিত্রাণ পেতে কখনো চান নি, বরং ধীরে ধীরে দৃষ্টি ও সৃষ্টির নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য -সমন্বিত তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি আশ্রমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভাষায় ভঙ্গিতে,

সার্থক পরিবেশ নির্মাণে মিলেমিশে একটি বিশেষ ছন্দের প্রকাশ ঘটিয়েছিল। সেই নির্মাণ শক্তি গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য, আকারের সৌন্দর্য রূপে, পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রায় অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতন পর্বে, আমরা দেখতে পাব, ঘরবাড়ি, আস্‌বাব ও শিল্পস্থাপত্য-বিষয়ক চিন্তাভাবনা, তাঁর জীবনযাত্রার আদর্শের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সার্থক নির্মাণ শিল্পের সৃষ্টি করেছিল।

১৯১৬ সালে জাপান-যাত্রী রবীন্দ্রনাথ, জাপানের গৃহস্থাপত্য, শহর ও পরিবেশ নির্মাণ রচনায় মুগ্ধ হয়ে, তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তাগুলিকে আরও বিস্তৃত করেছিলেন। "এদের বাড়ি জিনিসটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেওয়াল কড়ি, বরগা, জানালা, দরজা যতদূর পরিমিত হতে পারে তাই। অর্থাৎ বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণটা তার আয়ত্তের মধ্যে। একে মাজা, ঘষা, ধোয়া পোঁছা দুঃসাধ্য নয়।" জাপানি গৃহের বাহির ও অন্দরের স্থাপত্য পরিকল্পনার বিষয়টিকে কত সহজ ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। চিন্তা করেছেন ঘরে যেটুকু দরকার ততটাই যেন থাকে। ঘরের আকাশে আস্‌বাবপত্র, চৌকি, টেবিলগুলো যেন বাধার সৃষ্টি না করে। এমন-কি, তিনি ফুল দিয়ে ঘর সাজানোর কথায় বলছেন, "ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দরাদরি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।" গৃহস্থাপত্যের সামগ্রিক সার্থকতায়, গৃহের কোনো অংশে যেন অনাদর না থাকে। আবার অনাবশ্যকতাও যেন ফুটে না ওঠে এই তিনি চাইছেন। মানুষের জীবনযাত্রার রচনাটিকে, সৌন্দর্য প্রকাশের অভিনবত্বে নিয়ে যাওয়ার আদর্শ, সেই সময় থেকেই আরও সুস্পষ্ট অঙ্গে তার একান্ত আপন আশ্রম বিস্তার পরিকল্পনায় মিলিয়ে মিশিয়ে নিলেন। মানব-নির্মিত অবয়বের পূর্ণতার জন্যে প্রকৃতি-নির্মিত রিক্ততার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উপলব্ধি করতেন। এই ভাবনাটিই সবিশেষ মৌলিক এবং আজও আধুনিক। স্থাপত্য নির্মাণ ভাবনা, তাঁর কতখানি স্বচ্ছ ছিল, তা আরও বোঝা যাবে এই কথাটি থেকে। বলেছেন, "যে জিনিস যথার্থ সুন্দর তার চারি দিকে মস্ত বিরলতার অবকাশ থাকা চাই।" নিস্তব্ধতার আলোকে নির্মিত, স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ মিলেমিশে, যে বিশেষ পৌরুষত্ব প্রকাশ করে, অভিজ্ঞতার আলোকে সেটাই তাই পূর্ণ প্রকাশিত হল। গৃহস্থাপত্য এবং পরিবেশ নির্মাণের এমন মৌলিক ভাবনা-চিন্তা সচল রূপে পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনের নির্মিত পরিবেশের অভিনবত্বে। প্রকৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশ ও গৃহস্থাপত্য রচনা, বর্তমান কালের গৃহস্থাপত্য ও বাস্তুনির্মাণ চিন্তা-ভাবনার এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনেক মৌলিক প্রশ্নের সমাধান সূত্র দেবার ক্ষমতা রাখে। উত্তরায়ণ, মুক্ত ক্লাস ঘর, পাঠভবন, বলভীকুটির, বীথিকা গৃহ, নাট্যমঞ্চ, কলাভবন, উন্মুক্ত শিল্প-স্থাপত্য, চৈত্য, কালোবাড়ি, তালধ্বজ কুটির, সন্তোষালয় প্রভৃতি এইরকমই কতক **মাইলফলক** নির্মাণ।

বিস্তৃত আলোচনায় যাবার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক, সাম্প্রতিক কালে স্থাপত্য শিল্প ও পরিবেশ নির্মাণ সম্বন্ধীয়, বিশিষ্ট কতক চিন্তার দিকগুলি। দেশেবিদেশে আবার নতুন করে এইসব প্রাসঙ্গিক ভাবনা-চিন্তার আলোড়ন উঠেছে :

(এক) গৃহস্থাপত্য মানুষের চিরন্তন অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও উপযোগিতার অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম হিসেবেই যেন গড়ে ওঠে।

(দুই) বাড়ি, ঘর, দোর, রাস্তাঘাট ও জীবনযাত্রার পরিবেশ নির্মাণে সরলতা সৌন্দর্য ও সততার প্রকাশ, জনজীবনে মানসিক সুখ এনে দেয়। আধুনিক জীবনযাত্রায় নানান জটিলতার মাঝে, মানুষের মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একটি বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

(তিন) নির্মিত পরিবেশের চরিত্রে যেন, দেশজ, কালজ ও স্থানীয় ভূমির সমন্বয় আদর্শ প্রকাশ লাভ করে। সর্বজনীন শিল্পস্থাপত্য নির্মাণে দীর্ঘস্থায়ী জনচেতনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ওই ঐতিহাসিক, সামাজিক ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রকাশরূপ সমকালীন স্থাপত্য পরিকল্পনায় এনে দেবে ঐতিহ্যের মর্যাদা।

(চার) শিল্প-স্থাপত্যের সমন্বয়ের আদর্শে প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষের মাঝে জীবনযাত্রার একটি মুক্ত বাতাবরণের সৃষ্টি করা। যা থেকে শরীর ও মনের সুস্থ, সুন্দর প্রসারণের স্থান নির্মিত হয়।

(পাঁচ) নির্মাণ শিল্পে যতদূর সম্ভব স্থানীয় উপাদান ও শ্রমিকদের প্রয়োগ নৈপুণ্যের ব্যবহার করা। স্থানীয় উপাদান এবং নির্মাণ শৈলীকে ক্রমাগত আরও উন্নত করে গড়ে তোলা।

(ছয়) গৃহবিন্যাসের বাহির ও অন্দরের সহজ সরল বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনার ব্যবহার করা দরকার, এমনভাবে, যা মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

(সাত) মানুষের সঙ্গে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাটের সম্পর্কটাকে আরও নিকট, সচল ও দীর্ঘস্থায়ী করা প্রয়োজন। সরলতার সৌন্দর্যও স্থায়িত্বের কারিগরী আশ্বাস এবং উপযোগিতা, সামগ্রিক স্থাপত্য আদর্শের উপভোগ্যতাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে।

(আট) আপনা হতে বেড়ে ওঠা প্রকৃতি-নির্মিত পরিবেশের সঙ্গে মানব-নির্মিত পরিবেশের সমন্বয় আদর্শ গড়ে তোলা।

(নয়) নির্মাণের ব্যয়ভার কমিয়ে আনা। গৃহনির্মাণের উপাদান, সহজ নির্মাণ প্রণালী এবং স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, সরল ডিজাইনের ব্যবহার করা। শুধু একটি গৃহ নয়, গৃহটিকে কাছের গৃহগুলি ও পারিপার্শ্বিক নির্মাণ বিন্যাসকে সঙ্গে নিয়েই, সামগ্রিক পরিসরে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

(দশ) দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শিল্প অভিজ্ঞতার সুযোগ সৃষ্টি করতে শিল্পকলা ও স্থাপত্য-সমন্বয়-রূপের নির্মাণ। স্থাপত্য শিল্পে শিল্পকলার প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে মর্যাদা দেওয়া।

(এগারো) প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্য শিল্পে এবং তৎসংলগ্ন ঘরবাড়ি, এবং আনুষঙ্গিক নির্মাণ শিল্পে স্থানীয় পরিবেশ ও সেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে, আরও গভীর রূপে প্রকাশ করা। নির্মিত পরিবেশের বিশেষ চরিত্র নির্মাণে বিষয়ভিত্তিক ডিজাইনের ব্যবহার করা।

(বারো) সেই স্থানের কোনো বিশেষ শিল্প ঘরানাকে উজ্জীবিত করা, এবং স্থানীয় শিল্পনির্মাতাদের সঙ্গে নিয়ে, যৌথ স্থাপত্য-শিল্প-সংস্কৃতির পরিবেশ গড়ে তোলা।

(তেরো) স্থাপত্য পরিকল্পনায়, নির্মাণের প্রাথমিক স্তর থেকেই, বাহির ও অন্দরে, গাছ এবং ল্যান্ডস্কেপ-এর ব্যবহার করা। পারিপার্শ্বিক ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানগুলিকে মানিয়ে নিয়ে, গৃহ, বসতি প্রভৃতি নির্মাণ করা।

(চোদ্দ) সামগ্রিক সবুজায়ন নির্মাণ পরিকল্পনার আদর্শকে গড়ে তোলা। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করার মতন সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নির্মাণ সংলগ্ন করে তোলা।

(পনেরো) গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণ ও বিন্যাসে আধুনিক স্থাপত্যবিজ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার করা। ঘর বাড়ি প্রভৃতি যেন সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয় ও তাদের সাধ্যের মধ্যেই থাকে।

(ষোলো) স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা, চারপাশের আবহাওয়া, জলীয় স্তর, ভূমি ও ভূমির তল, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি লক্ষ করে, প্রকৃতিমুখী বাস্তু পরিকল্পনা এবং স্বল্পমূল্যে স্থাপত্য গড়ে তোলা।

(সতেরো) গৃহস্থাপত্য ও পরিবেশ নির্মাণের সামগ্রিক বিস্তারকে শিল্প-সংস্কৃতির অনুভূতির স্তরে নিয়ে যাওয়া। জীবনযাত্রায় সেটিকে সচলায়িত করে একটি চিরন্তন শিল্প-অনুভূতির পর্যায়ে উন্নীত করা।

(আঠারো) নির্মাণ শিল্পের আকর ভাবনা-চিন্তাগুলিকে, আমাদের জীবনসঙ্গী করে তুলতে, 'ইন্টারডিসিপ্লিনারি' এবং 'ইন্টারইনস্টিটিউশনাল' স্তরে নিয়মিত চর্চার দরকার। সে-কারণেই ডিজাইন ইনস্টিটিউটের সুদূরপ্রসারী জনমুখী ভূমিকাকে আবশ্যিক রূপে গ্রহণ ক'রে আরও সচলায়িত করার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রভাবনায় গড়ো ওঠা শান্তিনিকেতন বিদ্যাশিক্ষা আশ্রমের রূপ, শিল্পকলা, স্থাপত্য এবং বাস্তুবিজ্ঞানের মহাসমন্বয়ের এইসব আদর্শগুলিকেই নানান মাত্রায় প্রকাশ করে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রাকে সঙ্গে নিয়ে, রবীন্দ্রভাবনায়, একটি বিশিষ্ট নির্মিতির আদর্শ, ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। ঘর বাড়ি, ক্লাস ঘর, নাট্য ঘর, উন্মুক্ত ক্লাস, ছাত্রাবাস, নোটিস ও প্রদর্শনী কক্ষ, নির্মিত উদ্যান, উন্মুক্ত ভাস্কর্য, গৃহের দেওয়াল-চিত্রকলা প্রভৃতি নির্মাণে, শান্তিনিকেতনের এই বিশিষ্ট আদর্শটিই স্তরে স্তরে পল্লবিত হয়ে উঠল।

ভারতীয় বাস্তুশিল্প-শাস্ত্রের এবং শিল্প ঐতিহ্যের নানান ঘরানার নিদর্শনগুলি ও সেইসঙ্গে সজীব ও সত্ত্বাবান রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল স্থাপত্য অঙ্গে আশ্রম জীবনে আজকের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামগ্রিক স্থাপত্য নির্মাণ সম্পর্কিত নানান আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধান সূত্র, রবীন্দ্রসৃষ্ট এই নির্মিত পরিবেশে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিস্তীর্ণ খোয়াইয়ের মাঝে, শান্তিনিকেতন আশ্রম নির্মাণের ইতিহাসটি, প্রথমে আলোচনা করে নিলে, পরবর্তী অধ্যায়টিকে বুঝতে হয়তো কিছু সুবিধে হবে। রুক্ষ ধূসর অসীম প্রান্তরের মাঝে দুটি মাত্র ছাতিম গাছের শীতল ছায়ায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ক্ষণকালের বিশ্রাম, তাঁর মনে এনে দিয়েছিল, 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকে বীরভূমের রায়পুরের সিংহ পরিবারের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সখ্য এক ঘনিষ্ঠ রূপ নিয়েছিল। সেই বন্ধুতার সূত্রেই একবার সিংহ বাড়িতে, নিমন্ত্রণ রক্ষার কারণে, যাতায়াতের পথে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, এই তৃণশূন্য প্রান্তরে, কিছু সময়ের বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এই স্থানটি তাঁর সাধনার উপযুক্ত বলে তিনি মনে করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এখানে তাঁবু ফেলেও বাস করেছেন। ঠাকুরবাড়ির প্রচেষ্টায় এই কাঁকড় বিছানো রুক্ষ ভূমিতে অন্যস্থান থেকে উপযুক্ত মাটি আনিয়ে নিয়ে, সবুজায়ন পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে পরিবেশ নির্মাণে কাজে লাগানো হয়েছিল প্রথম থেকেই। ১৮৬৩ সালের মার্চ মাস নাগাদ রায়পুরের প্রতাপনারায়ণ সিংহদের কাছ থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কুড়ি বিঘা জমি নিয়েছিলেন। এটাই শান্তিনিকেতন আশ্রম পত্তনের সূত্র।

জমির দলিল, মূলপাট্টাটি ছিল এই রকম : "শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু লিখিতা শ্রী প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও শ্রী উদয়নারায়ণ সিংহ স্বয়ং ও শ্রীসূর্যনারায়ণ সিংহ ও নাবালগ শ্রী চন্দ্রনারায়ণ ও শ্রী তীর্থ নারায়ণ সিংহ তরফ অংস্বী শ্রী উদয়নারায়ণ সিংহ ও শ্রী রসিকলাল সিংহ কস্য মৌরসী পট্টকপত্র মিদং সন ১২৬৯ বারসত্ত উনসত্তর সালাব্দে লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আমাদিগের জমিদারী জেলা বিরভোমের পত্তনির ডোল খারিজ্জান মৌজে ভুবননগরের মধ্যে বান্ধের উত্তরাঞ্চলে বিঃ নিচের চৌহুদ্দী মোত্তাজী ২০ বিঘা জমি আপুনি বাগীচা আদি করিবার জন্য পট্টক লইতে ইচ্ছা করায় আমরা সকলে এক ঐক্য হইয়া ইচ্ছাপূর্বক উক্ত ২০ বিঘা জমির সলিআনা কোম্পানী ৫ পাঁচ টাকা জমায় আপনাকে বাগবাগীচা ও এমারত ও পুস্কন্নি আদি করিবার জন্য মৌরসীপাট্টা দিয়া লিখিয়া দিতেছি যে আপুনি উক্ত জমিতে বাগবাগিচা ও এমারত ও পুস্কন্নি আদী প্রস্তুত করিয়া দান বিক্রয়ের সত্তাধিকারীরূপে পুত্র পৌত্রাদীক্রমে ভোগ দখল করিতে রহেন... ইতি সন ১২৬৯ বারসত্ত উনসত্তর সাল এসাই তারিখ ১৮ই ফাল্গুন—"

—দ্র. বুদ্ধদেব আচার্য, সুবুল সরকার বাড়ি ও মহর্ষির শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতন আশ্রম পত্তন প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "একদা এই দুটিমাত্র ছাতিম গাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূর পথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন, তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁচেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে এবং রুক্ষ রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন।"

—'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধ

এই প্রসঙ্গে আর-একটি তথ্যের অবতারণা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে, শ্রীকণ্ঠ সিংহের পরিচয় আমরা পেয়েছি। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ছিলেন, ওই রায়পুরের সিংহবাড়ির, শ্যামকিশোর সিংহের পৌত্র, ভুবনমোহনের ভ্রাতা, এবং মনমোহন সিংহের মধ্যমপুত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ সিংহের মধুর সম্পর্ক ছিল। এই প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, 'শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের সঙ্গ লাভ করিলেই দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিরস স্ফূর্তি হইত। তখন ধ্যানযোগের শান্তিময় অনুত্তরঙ্গ

অবস্থা দূর হইয়া পুলক, নৃত্য প্রভৃতি রসভাবের উদ্‌বেল অবস্থা দেখা দিত।... শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের যোগ ও সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হইয়াছিল।"

—'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'

শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে মহর্ষির নিবিড় আত্মিক সম্পর্কের একটি বিশেষ নিদর্শন পাই, মহর্ষির লেখা একটি পত্রে, 'আপনার বিরহে এ শান্তিনিকেতন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। আর এখানে তেমন গোলাবফুল ফুটে না, যদিও দুই একটা গোলাবফুল ফুটে তাহার আর মর্যাদা নাই; আজ আমার আত্মা উদাস— তাহার প্রতি আর কে দেখে ? এই সময়ে একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিন এই আমার প্রার্থনা"

—অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

১৮৭০ সালে ধর্মশালা পর্বতে ভ্রমণের সময়, শ্রীকণ্ঠ সিংহকে মহর্ষি চিঠিতে লিখছেন, 'গত বৎসরের এই আশ্বিনমাসের এই প্রথমদিবসে আপনাদের পুষ্পকাননে অশোকবৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া মনোহর প্রাতঃকালে আপনার উদার হস্ত হইতে যে কৃপা ও প্রেম আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম আজি কয়েক দিবসাবধি হইল, তাহা মনে আন্দোলিত হইয়া এই পর্বতের অরণ্য মধ্যে অন্তশ্চক্ষুতে আপনাকে দেখিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছিলাম, এমন সময়ে আপনার চিরপরিচিত বর্ণাবলী বিন্যস্ত পত্র আমার হস্তগত হইল। তাহা এমন সময়ে আমাব হস্তগত হইবা মাত্র আমি একেবারে আশ্চর্য ও চমকিত হইলাম এবং যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইলাম।... মধ্যে আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাটীতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করিয়া আসিযাছিলেন, ইহা শ্রবণে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।... কোথায় গত বৎসরের এই আশ্বিনমাসের এই প্রথমদিবসে আপনার সহিত আপনাদের পুষ্পকাননে— আর কোথায় অদ্য এই প্রাতঃকালে এই বনে বসিয়া আপনাকে ভাবিতে ভাবিতে এই পদ লিখিতেছি..." ('মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর')। শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে মহর্ষির প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথা বেশ বোঝা যায়। মহর্ষি তাঁকে বলতেন, 'শান্তিনিকেতনের বুলবুল'। মহর্ষির শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কারণ, এখানকার নির্মল উপযোগী পরিবেশই এই স্থানটি মহর্ষির বিশেষ পছন্দ হয়েছিল এবং এই মনোমতো স্থানটিকেই তাঁর সাধনার উপযুক্ত বলে তিনি মনে করেছিলেন; সিদ্ধান্ত নেবার পরই তিনি প্রতাপনারায়ণদের কাছ থেকে পাট্টা নিয়েছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহের, এই বিষয়ে যোগাযোগে অথবা ব্যবস্থাপনায়, একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল বলেই অনুমান করা যায়। 'শান্তিনিকেতন' আশ্রমের সাধনভূমিতে মহর্ষির আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন ছিলেন, রাযপুরের সিংহবাড়ির বংশধর, এই শ্রীকণ্ঠ সিংহ।

১৮৬৩ সালের পর থেকেই শান্তিনিকেতন আশ্রম মহর্ষির ভাবনায় বিস্তারিত হতে থাকে। এ কথাও বেশ বোঝা যায়, জীবন সাধনার এক মহতী আদর্শ, এই আশ্রমের রূপ নির্মাণে, একেবারে গোড়া থেকেই কাজ করে এসেছে। সে-কারণেই শান্তিনিকেতন-পরিবেশ নির্মাণের কথায় বারে বারে মহর্ষির সত্যব্রতের সাধনার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কারণ স্থাপত্য বিন্যাসের নির্মিত রূপেও সেই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁব রসপিপাসু, সৌন্দর্য-খোঁজা মন ও ঐকান্তিকে ইচ্ছার দ্বারা এখানকার অনুর্বর কাঁকর মাটিতেও উদ্যানের সমন্বয়ে, একটি অনুপম নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরিবেশ নির্মাণের এই প্রাথমিক উদ্যোগেই পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে, পরিবেশ সংস্কৃতির একটি ঘরানার প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। বিস্ময় জাগে, সেই সময়ে পরাধীন ভারতবর্ষে, স্থাপত্য নির্মাণে বিজ্ঞান ও দেশজ জীবনদর্শন সমন্বয়ে এমন একটি কাজের গতিপথ নির্মিত হল। মহর্ষির অন্তরের যে সাড়া ছিল, সেটাই যেন বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে লাগল ব্যবহারিক রূপের নির্মাণে। রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ সূত্রটিকেই ধরে রেখে, আরও বিস্তারিত, আরও সচলায়িত করে, বিদ্যাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাসভূমি-নির্মাণে প্রাত্যহিকী করে তুললেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, প্রকৃতি-সমন্বিত মহর্ষির এই নির্মাণ আদর্শটিকেই গ্রহণ করে, গৃহস্থাপত্য ও পরিবেশ নির্মাণে একটি দিক নির্দেশ দিয়ে গেলেন। সত্যের আলোকে জীবনবোধ থেকে নেওয়া, ঐতিহ্য পুনর্নির্মাণের, এমন একটি ভারতীয় আদর্শ প্রায় বিরল বলা যায়। উন্মুক্ত জনবিহীন, নীরব, তৃণশূন্য প্রান্তরের মাঝেই প্রথিত হয়েছিল আজকের সম্প্রসারিত সবুজ শান্তিনিকেতনের বীজ।

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকল আশ্রম। "ক্রমে ক্রমে এই জনশূন্য প্রান্তরে বহু অর্থব্যয়ে বাসোপযোগী প্রথমে একতলা পরে দোতলা পাকা ইমারত প্রস্তুত হইল, প্রয়োজনীয় গৃহোপকরণ আস্‌বাবাদি সংগৃহীত হইল, আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল, আমলকী শাল, দেবদারু, বকুল, কদম্ব প্রভৃতি বিবিধ ফলবান ও ছায়াতরু সকল রোপিত হইল, নানাজাতীয় পুষ্প সম্ভারে প্রস্ফুটিত মালতী ও মাধবীর লতাবিতানে কঙ্করময় উষরভূমি পরম শোভাময় হইয়া উঠিল। মহর্ষি এই পরম রমণীয় উদান বাটিকার নাম দিলেন 'শান্তিনিকেতন' (—অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন আশ্রম')। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনায় শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন, "... তিনি (মহর্ষি) অনেক স্থানের প্রাকৃতিক ভাব পরীক্ষা করিয়া অবশেষে মানব কোলাহল শূন্য প্রসারিত নীল আকাশব্যাপী এই উচ্চ ভূমিখণ্ডকে তদুপযোগী মনে করিয়া এখানে এই বনস্পতি লতা পুষ্প শোভিত আশ্রম প্রস্তুত করেন।... ঐ যে সপ্তপর্ণ বৃক্ষতলে শ্বেত পাথরের বেদিকা নিরীক্ষণ করিতেছ, উহাই তাঁহার যোগাসন। আর ঐ যে নির্জন রম্য উদ্যান ও দিগন্ত প্রসারী ঐ মাঠ উহাই তাঁহার প্রকৃতির সৌন্দর্যে ব্রহ্মদর্শনের ক্ষেত্র ও বিচরণ ভূমি।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮১৪শক) বাস্তুনির্মাণ ও গৃহস্থাপত্য গড়ে তোলার কাজে, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, কারিগরী বিদ্যায় যাকে বলে 'সাইট্‌ সিলেকশন'। ভূমি, জলবায়ু, আলো, বাতাস, বায়বিক গতিপথ, এবং সেখানকার চারপাশের অবস্থা ও অবস্থান (অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সমন্বিত ওরিয়েন্টেশন) এইসব জেনে বুঝে সার্থক ভাবে বাসভূমিক্ষেত্র নির্বাচনের প্রাথমিক ও মৌলিক কাজটি করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। অনেক স্থান দেখার পর, সকল প্রকৃতি ও পরিবেশ পরীক্ষাতেই তিনি এই স্থানটিকেই সব থেকে উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, 'দর্শন স্পর্শন আঘ্রাণ ও মননের সহিত, আমি যে দ্রষ্টা, স্রষ্টা, ঘ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও তো পাই' ('মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', বিশ্বভারতী, ১৩৭৪)। আপনাকে জানতে ও প্রকৃতির গভীরতাকে বুঝতে, এবং বিশ্বরহস্যের উপলব্ধিতে, অনন্তের আকাশ হতে অনন্তর পরিচয় লাভ করা। জীবন সম্বন্ধীয় এই ধরনের ব্যাপক ও গভীর চিন্তা-ভাবনা মহর্ষির ছিল। শান্তিনিকেতন পরিবেশ বিন্যাসে ও নির্মাণ শিল্পে আমরা যে এক নতুন দর্শন, স্পর্শন ও আঘ্রাণের বাতাবরণ লাভ করে থাকি, তার মূল উৎস বোধহয় মহর্ষির এই আত্মিক অনুভূতি এবং আশ্রমস্থান নির্বাচন ও বিন্যাস। মহর্ষির এই অনুভূতিটিকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করে, নিজস্বভাবে, আকারে, রূপে ও রেখায়— বিবিধ মাত্রায় পূর্ণরূপে জীবনযাত্রায় যুক্ত করলেন। এইরকম জটিল বিষয়কে স্থাপত্য শিল্পে যুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, যদি না মননে সম্যক বিজ্ঞানচেতনার আসনটি পাতা থাকে। রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতার আলোকটি অনেক স্পষ্ট ছিল। তাঁর চিন্তায় স্থাপত্য ও পরিবেশ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন ও চর্চার ইতিহাস সুবিদিত। এমন অনেক শিল্প বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে ওঁরা চর্চা করতেন বা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ওঁদের ঘরানায় বিদ্যাচর্চার সমন্বয়ের একটি বিশেষ দিক ছিল। অনেক সময়েই সেই সমন্বয়টিকে বাস্তবিক ও ব্যবহার্য রূপের বিন্যাসে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গৃহশয্যা, বাস্তুনির্মাণ, বেশভূষা, মঞ্চ স্থাপত্য, নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্র, উদ্যান বিন্যাস, শিল্পদ্রব্যের নিত্য ব্যবহার— এমনই আরও অনেক বিষয়েই তাঁদের অভিনবত্ব ছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী একবার, শান্তিনিকেতন গৃহে, মহর্ষির স্মৃতিচারণায় এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, "আমি ও আমার বন্ধু আনন্দমোহন বসু একবার শান্তিনিকেতনে মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, সে সময়ে তাঁহার বসিবার ঘরে টেবিলের উপর একখানি ভূতত্ত্ববিদ্যার বই দেখিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহার দিকে তাকাই। মহর্ষি সহাস্যে বলিলেন, সংবাদপত্রে এ বইটির প্রশংসা দেখে এ সম্পর্কে জানবার ইচ্ছে হয়, সেজনাই এটা পড়তে আরম্ভ করেছি... (বললেন) পর্বতে অবস্থানকালে দীর্ঘকাল আমি এ বিষয়ে বহু অধ্যয়ন করেছি। প্রসঙ্গক্রমে মহর্ষি বলিলেন, মানুষের জীবনতরী দ্রুতবেগে জীবনের কূল থেকে মরণের পারে অগ্রসর হচ্ছে। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে স্রষ্টার জগতের বিচিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় সেটুকু জেনে নেওয়াকে আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। তাই আমার সমগ্র জীবনে আমি প্রকৃতির বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে কোন দিনই পরাঙ্মুখ হইনি" —'মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে'— শিবনাথ শাস্ত্রী, অনুবাদিকা মায়া রায়।

মহর্ষি ভূ-প্রকৃতিবিদ্যা প্রভৃতি অধ্যয়নের অভিজ্ঞতাকে, স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দে জীবনে যোগ করেছিলেন। মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথও তাঁর অসামান্য কর্মঅভিজ্ঞতা ও চিন্তার নৈপুণ্যে বুঝেছিলেন, আধুনিক কারিগরী শিক্ষা ভারতবর্ষের নির্মাণ শিল্পে ও স্থাপত্য-বিদ্যাচর্চায় বিশেষ ভূমিকা নেবে। দ্বারকানাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঐতিহাসিক উদ্যমে তৎকালীন হিন্দুকলেজে প্রথম জরিপ (সার্ভে) বিদ্যা শিক্ষা প্রচলনের মহৎ উদ্যম নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে হিন্দু কলেজে প্রথম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসও শুরু হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে, আমাদের দেশজ ঐতিহ্যগুলোকে ফিরে দেখার একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল।

মহর্ষির নির্বাচিত দেশজ ভিত্তিভূমির উপর নির্ভব করেই বিস্তারিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনের মানব-নির্মিত পরিবেশের সঙ্গে প্রকৃতি-নির্মিত পরিবেশের, আদর্শ মেলবন্ধনের রূপ ও রেখা। ভবিষ্যতের বিশ্বভারতীর রূপকার রবীন্দ্রনাথ, কিশোর বয়সেই যখন পিতার সঙ্গে এখানে এসেছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল মহিমা, বিশ্বদেবতা রূপে তাঁর চেতনাকে উদ্‌ভাসিত করে তুলল। "শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলাম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।... প্রথমত সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছে থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম— এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল-শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না। না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্মল মহিমা" (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, প্রবন্ধ ৩)। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের এই স্বভাবজাত শ্যামলা শান্তি, বিদ্যাশিক্ষা আশ্রমের নির্মাণ-বৈচিত্র্যতে পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল। মহর্ষির উপলব্ধির, নির্মল ভূমির নিস্তব্ধতাকে কখনও কোলাহলে রূপান্তরিত হতে দেন নি। বরং বিদ্যাশ্রম জীবনে, জীবনকে মেলাতে, নৈঃশব্দের আলোকে বাস্তুনির্মাণের আদর্শটিকেই উপস্থাপিত করলেন। যেন কত সহজে, বিনা আয়াসে, সত্য উপলব্ধির নির্মল মহিমাটিকে ক্যাম্পাস নির্মাণ শিল্পের কেন্দ্রে স্থাপিত করলেন। এই বিষয়ে আমাদের আরও শিক্ষিত হবার সুযোগ করে দিলেন। আমরা ফিরে পেলাম হারিয়ে যাওয়া, সনাতন আশ্রম শৈলীর নির্মাণ রহস্য। সহজ সরল প্রকৃতি-নির্যাসিত নির্মাণ কৌশলের, বিস্তৃত ও অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষির আশ্রম সম্বন্ধীয় চিন্তা-ভাবনার, কখনও বিরুদ্ধাচরণ করেন নি, বরং সেই অভিজ্ঞতার ঐতিহ্যটিকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আরও বৃহত্তর অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আশ্রম-বিদ্যালয়ের সার্থকতা প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ বারে বারেই মহর্ষির সাধনার কথাটি স্মরণে রেখেছিলেন।

"এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কলে... সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাব এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে... একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন, সেই দিনটি আর মরল না। সেই দিনটি বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে চিরদিনের মতো আটকা পড়ে গেল। শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রঙ, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে লাগল. যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা, সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল ; তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এই যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সেকি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না" ("আশ্রম", 'শান্তিনিকেতন')। আধুনিক ভারতবর্ষের আসনতলে, সনাতন তপোবন আদর্শের পুনর্নির্মাণকেন্দ্র হয়ে উঠল শান্তিনিকেতন। মানুষের স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে রূপ দিতেই, নগরের ইঁটকাঠের বাতাবরণকে পরিহার করে, এখানকার উন্মুক্ত শ্যামল ছায়াতলে নির্মিত হল মানানসই পরিবেশ-নির্মাণ আদর্শ।

১৮৬৩ সাল থেকে বৈজ্ঞানিক প্রয়াস ও ঐকান্তিক ভাবনা-কার্য সমন্বয়ে, মানব-নির্মিত পরিবেশ রচনার সঙ্গে প্রকৃতি-নির্মিত পরিবেশ সমন্বয়ের, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল। আপাত কঠিন, শুষ্ক মরুপ্রান্তরে সবুজায়ন পরিকল্পনা ও গৃহনির্মাণের কাজ আরম্ভ হল, মহর্ষির প্রত্যক্ষ চিন্তা ভাবনা ও দিক নির্দেশের দ্বারা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহর্ষি রায়পুরের প্রতাপনারায়ণ সিংহদের কাছ থেকে কুড়ি বিঘা জমি নিয়েছিলেন। ১৮ ফাল্গুন, ১২৬৯ তারিখে সম্পাদিত সম্পত্তির দলিল, মূল পাট্টাটির, ঠিক নীচেই, অর্থাৎ দলিলের শেষছত্রে তপসিল চৌহদ্দী বিবরণে রয়েছে, "বান্ধের উত্তরাংশে 'শান্তিনিকেতন' নামক গৃহের চতুপার্শ্বের মধ্যে ২০ বিঘা।"

অর্থাৎ সম্পাদিত দলিল- মতে ১২৬৯, ১৮ ফাল্গুনের পূর্বেই শান্তিনিকেতন গৃহ নির্মিত হয়েছিল। মহর্ষি প্রথমে একখানি একতলা বাড়ি এবং উদ্যান নির্মাণ করে তাঁর সাধনার স্থল পেতে নিয়েছিলেন। এখানে তিনি মাঝে মাঝেই আশ্রয় নিতেন। প্রচলিত ধারণায় যা বলা হয়ে থাকে, যে ১২৬৯ সালের এক বছরের মধ্যেই শান্তিনিকেতন গৃহ বা মহর্ষির শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছিল, তা বোধহয় সঠিক নয়। শান্তিনিকেতন গৃহ, তখনকার ইয়োরোপীয়ান ধাঁচের কাঠের কড়িবড়গা, পেটাই ছাদ, ইঁট চুন-সুড়কির গাঁথনি দেওয়ালযুক্ত কোঠা বাড়ি। এই ধরনের গৃহস্থাপত্য কলকাতায় তখন বেশ প্রচলিত ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িও এই নির্মাণ শৈলীতেই তৈরি। এই ধাঁচের বাড়ি নির্মাণ করতে বেশ সময় লাগারই কথা। সেকালে এই স্থানে এই ধরনের বাড়ি তৈরি করার উপাদান সামগ্রী মোটেই সুলভ ছিল না। বাড়িটির গঠন ও আকৃতির বিস্তার দেখলে মনে হয়, অধিকাংশ নির্মাণ সামগ্রী কলকাতা থেকে আনানো হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির পরিচিত, কোনো নির্মাণ সংস্থা অথবা বিশিষ্ট বাস্তুবিদের তত্ত্বাবধানে বাড়ির প্ল্যানমতে গৃহটি নির্মিত হয়েছিল। বাড়ির অন্দর ও বাহিরের, উপরনীচ, আশপাশের গৃহরেখা (Building line) এবং অভ্যন্তরীণ বাসগৃহের বিন্যাস পর্যবেক্ষণ করলে, ধারণাটি আরও স্পষ্ট হয়, যে গৃহটি তৈরি হতে সময় লেগেছিল। দলিল অনুযায়ী শান্তিনিকেতন নামক বাড়িটি ১২৬৯ সালে, ২০বিঘা জমির প্রায় কেন্দ্রে ছিল। অর্থাৎ বাড়িটি নির্মাণ করে, মহর্ষি শান্তিনিকেতন স্থাপনা করার পরেই, দলিল সম্পাদিত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম আশ্রমধারী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "...ইঁহাদের (প্রতাপবাবুদের) সহিত মহর্ষির পরিচয় যে ১২৬৫ সালের অনেক পূর্বেকার ঘটনা তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই" (দ্র. চিত্তরঞ্জন দেব. "শান্তিনিকেতন জন্মবর্ষ এবং জন্মদিন প্রসঙ্গে", দেশ, ২৬/১২/৮১)

অনুমান করা যায় ১২৬৫ সালের পরেই, এবং ১২৬৯ সালের পূর্বেই হয়তো 'শান্তিনিকেতন' নির্মিত হয়েছিল। এই শান্তিনিকেতন গৃহ দিয়েই আজকের শান্তিনিকেতনের সমৃদ্ধি। এই আকাশের আলোকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের পূজায় নিঃশব্দ নিবেদনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। গভীর গাম্ভীর্যে, শান্তিনিকেতনের মূল সূত্র এই গৃহস্থাপত্যটি, প্রকৃতির মাঝে, প্রায় ১৩৫ বছরেরও অধিক কাল ধরে রয়েছে।

গৃহটিকে সময়কালসিদ্ধ স্থাপত্য বলা যেতে পারে। যদিও এই ধরনের বাড়িগুলির নিয়ত 'পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ' -এর বিশেষ প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে কড়ি, বড়গা ও দেওয়ালগুলিকে, পোকামাকড় থেকে রক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়মিত pest control-এর বিশেষ দরকার। সেইসঙ্গে বাস্তুবিজ্ঞানের প্রথমতো, কাঠামোগত এবং স্থাপত্য-মত, নিয়মকানুন মেনেও বাড়িটির প্রাচীনতার কথা ভেবে— গৃহ ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করার প্রয়োজন।

শান্তিনিকেতন গৃহে মহর্ষি থাকতেন। তাঁর অতিথিরাও এসে এখানেই থাকতেন। বহুকাল ধরে এই একমাত্র পাকা দোতলা বাড়িটি, অতিথিশালা, বাসস্থান এইসব কাছে লাগত। রবীন্দ্রনাথও এই বাড়িতে বহুবার থেকেছেন। শান্তিনিকেতনে পাকাপাকি ভাবে আসার পর পরিবারের সকলকে নিয়ে এখানেই থেকেছেন। পরে নতুন বাড়ি, দেহলি-তে চলে যান।

আগে, শান্তিনিকেতনকে বলা হত উদ্যানবাটিকা। সেইকালে ইয়োরোপীয় ধাঁচে ইঁটের সঙ্গে চুন-সুরকির গাঁথনি দিয়ে, ভারবহনকারী থাম, দেওয়াল, গৃহ আস্তরণ প্রভতি নিয়ে ঘর দোর গড়ে উঠেছিল। সঙ্গে বারান্দা, ব্যালকনি, সিঁড়ি, স্নানের লাগোয়া ঘর, চাতাল। ছাদ নির্মাণে সেগুন কাঠের বিম, পেটানো-পোড়ানো, সমান মাটির টালি, চুন-সুরকির কংক্রিট, কাঠের কড়ি-বরগার ভারসাম্যে তৈরি হয়েছিল। সেই কালের গৃহনির্মাণ

আদর্শে তৈরি এই বাড়িটি। কাঠের ভেন্টিলেটর, খড়খড়ি দেওয়া লম্বা বড়ো জানালা, কাঠের প্যানেল দরজা, এইসব নিয়ে গৃহটি নির্মিত রয়েছে। বাড়ির চারপাশ, বিস্তৃত মোরাম পথে, ঢাকা। আশেপাশে উদ্যান। সামনে ও পিছনে, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে দুটি বড়ো ফটক। থাম ও ইঁটের পাঁচিল সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ডিজাইন বিন্যাসে বিশেষত্ব রয়েছে। আশ্রমের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করা ছিল (এখনও রয়েছে) সাদা পাথরের ওপর কালো পাথরের হরফে, inlay পদ্ধতির মাধ্যমে। এই কাজের বিশেষত্ব আছে। সামনের একটি ফলকের তলায় 'Murdoch & co' নামটি আজও চোখে পড়ে।

উত্তরমুখী ফটকের মাথায় লোহার খিলান ধাঁচের স্থাপত্যে আশ্রমের মূল কথাটি স্থাপিত হয়েছে—

'আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্‌বিভাতি'

লোহার ফ্রেমে, এই কটি ইস্পাত অক্ষর দিগন্তের দিকে মাথা উঁচু করে আছে। আনন্দরূপ জগতে, নিত্য বয়ে চলা আনন্দরসের উৎসটিকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের মূল শক্তি বলা যায়।

১৮৮৮ সালের ৮ মার্চ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্ট ডীড প্রস্তুত করে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে উৎসর্গ করেন : "বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরের পত্তনির ভৌল খারিজান মৌজে ভুবননগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপশিলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংদিগরের নিকট হইতে মৌরসি পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতলা ও দোতলা ইমারত প্রস্তুত পূর্বক মৌরসিস্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকার আছি..."।

১৮৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন মন্দিরের শিলান্যাস হয়। ১৮৯১ সালের (৭ই পৌষ) শান্তিনিকেতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপাসনা মন্দির নির্মাণকার্যে তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ সিকদার কোম্পানির প্রসন্নকুমার সিকদারের প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। তিনি কলকাতা থেকে এই বিশেষ স্থাপত্য নির্মাণের তদারকির কাজে আসা-যাওয়া করতেন। তিনিই ছিলেন এই গৃহনির্মাণের ইঞ্জিনিয়ার। উপাসনা-গৃহের বিশেষত্ব এই যে, মন্দিরের সমগ্র অংশটি 'Pre-Fabrication' নির্মাণ পদ্ধতিতে, প্রথমে ঢালাই লোহার (কাস্ট আয়রন) স্ট্রাকচার নানান অংশে বিভক্ত করে নিয়ে, কলকাতার কারখানায় তৈরি করানো হয়। তাতে বহু রিভেট বন্ধনির ব্যবহার করতে হয়েছিল। তার পর শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসে মন্দিরের বিভিন্ন অংশগুলিকে, ইস্পাতের নাটবল্টুর সাহায্যে মিলিয়ে নিয়ে জোড়া লাগানো হয়। তার আগে অবশ্য শক্তপোক্ত কলামের ভিত তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। সম্পূর্ণ কাঁচের ফ্রেম যুক্ত এই রকম একটি অভিনব নির্মাণ শৈলীর গুরুত্ব বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। একশো বছর অতিক্রান্ত শান্তিনিকেতন মন্দির (উপাসনা গৃহ) নির্মাণ প্রসঙ্গে, কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার :

(ক) ঠাকুরবাড়ির হিসাব ও ক্যাশ বই থেকে জানা যায় ৩ ভাদ্র, ১২৯৭ শান্তিনিকেতনের দুই ট্রাস্টী দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে মন্দির নির্মাণের জন্যে পনেরো হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

(খ) ১০ ভাদ্র ১২৯৭, মন্দির প্রতিষ্ঠা কাজের এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করার জন্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে যাতায়াতের খরচ বাবদ দেওয়া হয়েছে একশো টাকা।

(গ) ২৫ ভাদ্র, ১২৯৭, মন্দিরের নক্শা তৈরির জন্য, 'প্রতাপবাবুর' নিকট যাতায়াতের গাড়িভাড়াও দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ উপাসনা গৃহের উপযুক্ত নক্শা তৈরি করে, তবেই নির্মাণ কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল)। এই মন্দির-নির্মাণের স্মৃতিচারণা করেছেন, প্রথমে যুগের আশ্রমধারী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র, পরবর্তীকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতনের কথা' (১৩৫৭) রচনায়। কাঁচের মন্দির নির্মাণের কারণ হিসাবে তিনি লিখছেন : "শুনেছি যে মহর্ষিদেব চেয়েছিলেন, সূর্যাস্তের সময়ে ছাতিমতলায় বেদী হতে তিনি পশ্চিমাকাশে যেমন বিচিত্র বর্ণের খেলা দেখতেন, আর এখানকার প্রান্তরে যেমন আলোককে বাধা দেবার কিছুই ছিল না, তাঁর ব্রহ্মমন্দিরেও তেমনি রঙের খেলা থাকবে এবং আলোক বাধা পাবে না। সেইজন্য নানা বর্ণের কাঁচে সাজানো, কাঁচের দেওয়াল বিশিষ্ট এখানকার ব্রহ্মমন্দির।"

এই মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছেন— "এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ সিকদার কোম্পানীর প্রসন্নকুমার সিকদার মহাশয়ের কৃতিত্ব স্মরণীয়... তিনি কাজ দেখবার জন্য প্রায়ই আসতেন... আমি বরাবরই শুনেছি, তিনি এখানকার মন্দিরের ইঞ্জিনিয়ার। কোনো বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারকে আসতে দেখি নাই।... তখনকার দিনে পাথরের কাজ প্রায়ই সব বিদেশী কোম্পানীর হাতে ছিল। মন্দিরের মার্বেল-পাথরের মেঝে ও বাইরের বালি-পাথরের পৈঠাগুলি কাদের কাজ তা আমি জানি না।... মন্দিরটি ঢালাই-লোহার তৈরী কলিকাতার নানা অংশে প্রস্তুত করে এখানে আনা হয়।" (দ্র. শান্তিনিকেতন মন্দির প্রতিষ্ঠা-উৎসবের শতবর্ষপূর্তি-স্মরণিকা, ৭ই পৌষ ১৩৯৮, বিশ্বভারতী) শান্তিনিকেতন মন্দির বা উপাসনা গৃহের অভিনব নির্মাণ বিশিষ্টতা নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। এই গৃহস্থাপত্যের নির্মাণ আদর্শের পিছনে কয়েকটি ব্যবহারিক উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ নির্মাণে প্রকাশ লাভ করেছে। বর্তমানকালের স্থাপত্য নির্মাণ কলাকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে, এই গৃহটি অনেক অভিনব ও গ্রহণযোগ্য সূত্রের সন্ধান দেয়। মন্দির গৃহ নির্মাণের কয়েকটি বিশিষ্টতার উল্লেখ করা দরকার :

(এক) শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রকৃতিবেষ্টিত নির্জন রমণীয় স্থানে এমনই একটি স্থাপত্য পরিকল্পনায় কথা ভাবা হয়েছিল, যা উপাসনার ও আরাধনার অনুকূল ভাবটিকে কার্যে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক, চিরন্তন উদ্দেশ্য রচনায়, স্থাপত্য শিল্পের বিন্যাসটিকে সঠিকরূপে মণ্ডিত করে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। মন্দির স্থাপত্য, জীবন সাধনার কাছে, যেন, হাত বাড়িয়েছে। একালের নির্মাণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে, এই কাজটিকে উদ্দেশ্যভিত্তিক স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

(দুই) মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের সময় অসীম প্রান্তরের মাঝে বিচিত্র বর্ণের আলোক প্রত্যক্ষ এবং অনুভব করে আনন্দলাভ করতেন। সেকারণেই গৃহের চার দিকের দরজা, জানালা, ঘরের সিলিংছোঁয়া দেওয়াল প্রভৃতিতে, নানান বর্ণের কাঁচের আভরণ প্রয়োগে নির্মিত করতে চেয়েছিলেন। যাতে প্রকৃতির আলো কোনোমতেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়। বরং বিভিন্ন রঙের ছটায় সজীবতার পূর্ণতা লাভ করে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আলোকের উন্মুক্ততাকে গৃহের অন্দরে নিয়ে আসার জন্য চারি দিকের সম্পূর্ণ কাঁচের দেওয়াল রচনা এবং সেই কারণে আপাত ভঙ্গুর কাঁচের বিস্তৃত অংশগুলিকে গ্রহণ করা হল, গৃহ নির্মাণের অন্যতম কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবে। সঙ্গে প্রাক্‌নির্মিত অলংকৃত ঢালাই লোহার স্ট্রাকচারের বাঁধুনিতে থাম, বিম, ছাদের ফ্রেম প্রভৃতি নির্মাণ— এক কথায় এটি একটি অনবদ্য স্থাপত্য সৃষ্টি। মহর্ষির দার্শনিক ভাবনা ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্রে রেখে স্থাপত্য নির্মাণ আদর্শের নিদর্শন এই উপাসনা গৃহ। প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ-সূত্রকে ব্যবহারিক রূপে সচলায়িত করার, সেকালের এই উদ্যোগটি, বাস্তুনির্মাণ শিল্পে, আজও একটি মাইলফলক কাজ হিসেবে গণ্য করা যায়। একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ এখানে করা যায়, ১৮৯৪ সালে, রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রাবলীতে, তাঁর পৃথিবীর একান্ত ভালোবাসাকে, ব্যক্ত করার মাঝে বলছেন, "...আমি আলো এবং আকাশ এত ভালোবাসি! বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্য। গেটে মরবার সময় বলেছিলেন : More Light! আমার যদি সে সময় কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি : More Light and more space!..." এই অসাধারণ ইচ্ছা জীবনের আকাঙ্ক্ষা, শান্তিনিকেতনের পরবর্তী পরিবেশ নির্মাণেও ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে দেখব। এই ভাবনাটির সঙ্গে মন্দির স্থাপত্যের যেন অনেক মিল। ১৮৯১ সালে, মহর্ষির যে চিন্তা বাস্তবিক নির্মাণে রূপায়িত হয়েছিল, তেমনই চিন্তা-ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত।

(তিন) প্রাক্-নির্মিত নির্মাণকৌশল (pre-fabrication engineering) -এর ব্যাপক প্রচলন আমরা পাশ্চাত্য দেশে দেখতে পাই পঞ্চাশের দশক থেকে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দ্রুত নির্মাণের কাজে, ঘর বাড়ি, সাময়িক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সেতু প্রভৃতিতে এই ধরনের নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সামাজিক, বাণিজ্যিক, উন্নতিকল্পে এই ধরনের প্রাক্-নির্মিত কৌশল, অর্থাৎ কারখানাতে বিভিন্ন অংশ ভাগে, গৃহ তৈরি করে নিয়ে, দূর দূর স্থানে সেগুলিকে আবার নিয়ে গিয়ে নাটবল্টুর সাহায্যে

জোড়া দিয়ে নির্মাণের কাজে লাগানো হত। বিশ শতকের ষাটের দশকে এই পদ্ধতিটির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। আজও তার বিস্তৃত ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। দেশের আর্থসামজিক উন্নতিকল্পে নির্মাণশিল্পের দ্রুততা এবং বৈজ্ঞানিক সঠিকতাগুলিকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে আসতে, শহর, গ্রামাঞ্চল প্রভৃতির উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে এই প্রয়োগ শৈলীর ব্যবহার আজও অব্যাহত রয়েছে। নির্মাণশিল্পের এই বিশেষ শৈলীটির প্রয়োগ, কত অনায়াসে ১৮৯০-৯১ সালে, উপাসনা মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছিল। একটি আন্তরিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাস্তু শিল্পকে সচলভাবে কাজে লাগানো হল। শতবর্ষ অতিক্রান্ত উপাসনা গৃহের এই নির্মাণ বিশিষ্টতা আজও বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য। ভারতবর্ষের গৃহ নির্মাণ শিল্প ও স্থাপত্য রচনার কাজে, বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য। আজকের দিনের বিষয়ভিত্তিক স্থাপত্য পরিকল্পনায় এই গৃহটি অনেক সমাধান সম্ভাবনাকে আমাদের কাছে হাজির করে।

প্রাসঙ্গিক সূত্র হিসাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সংকলিত শান্তিনিকেতন মন্দিরের শিলান্যাস ও প্রতিষ্ঠা উৎসবের কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করলে, শান্তিনিকেতনের নির্মাণ আদর্শটিকে আমাদের বুঝতে আরও সুবিধে হবে। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে (পৌষমাসে) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উপাসনা গৃহের ভিত্তি স্থাপন প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল : "পূজ্যপাদ শ্রী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রম অতি পবিত্র রমণীয় স্থান। সুপ্রশস্ত, সুসজ্জিত প্রাসাদ, নির্ম্মল জল, বিহঙ্গ কূজিত নানারূপ বৃক্ষরাজি, উন্মুক্ত নীলাকাশ ও শস্পাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তর, এই আশ্রমকে রমণীয় শোভায় শোভিত করিয়াছে। সংসার তাপে উত্তপ্ত ঈশ্বর-পিপাসু সাধকেরা এই আশ্রমে আগমন করিয়া নির্জনে পরমাত্মার শ্রবণ, মনন ও জ্ঞানচর্চা ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মার্থী অতিথিগণের কি শারীরিক কি আধ্যাত্মিক, সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া আশ্রমের সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখানে বাহিরের কোনো কোলাহল নাই, নির্জনে শান্তিমনে পরমেশ্বরের আরাধনার সমুদায় অনুকূল ভাব এখানে বর্তমান। এতদিন এই আশ্রমে ব্রহ্মোপাসনার জন্য পৃথক মন্দির না থাকায় প্রাসাদেই উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইত। মহর্ষি সাধকদিগের এই অসুবিধার কথা জ্ঞাত হইয়া শান্তিনিকেতনে লোহময় সুপ্রশস্ত ব্রহ্মমন্দির নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ট্রাষ্টী মহোদয়দিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। মন্দির নির্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত ২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়। অনন্ত নীলাকাশের নিম্নে আশ্রম প্রাঙ্গণে উপাসনার জন্য সকলে একত্র হইয়াছিলেন। সুরুল, রায়পুর, বোলপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী ভদ্রপল্লী হইতে ৬০/৭০ জন নানা শ্রেণীর বিশিষ্ট ভদ্রলোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করেন ; এবং অতিশ্রদ্ধেয় সুকবি ও সুগায়ক শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুরাগভরে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন...

"অনন্তর ভিত্তিমূলে যে খোদিত তাম্রফলক প্রোথিত করা হয়, সত্যেন্দ্রবাবু সর্ব্বসমক্ষে তাহা পাঠ করিলেন। তাম্রফলকে এই কয়েকটি কথা দেবনাগর অক্ষরে খোদিত আছে।

"ওঁ তৎসৎ। ঠকুর বংশাবতংসেন পরমর্ষিনা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মনা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ, অগ্রহায়ণ ২২ রবিবাসর।" পরে সকলে মন্দিরের ভিত্তিমূলে গমন করিলে তাম্রফলক, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা ও উক্ত ২২শে অগ্রহায়ণের *Statesman* পত্রিকা, এই অগ্রহায়ণ মাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" একটি আধারে আবদ্ধ করিয়া মন্দিরের ঈশান কোণে প্রোথিত করা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত দ্রব্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া স্বহস্তে কর্ণিক দ্বারা ভিত্তি প্রস্তর গাঁথিয়া দিলেন। সর্বশেষে সত্যেন্দ্রবাবু পরমেশ্বরের নিকট এই শুভকার্য্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ করিলেন।"

অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে উপাসনা গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। প্রায় এক বছরের মধ্যে এইরকম একটি জটিল স্থাপত্য নির্মাণ করা অত্যন্ত কৃতিত্বের। পূর্বে উল্লিখিত প্রাক্-নির্মাণ শৈলীর শ্রেষ্ঠ নজির, দ্রুত তালে, গৃহটির নির্মাণ। উপযোগিতার ক্ষেত্রেও এই অনুপম স্থাপত্যটি, একটি বিশেষ সৌন্দর্য মন ও প্রাণের, সৃষ্টি করেছিল। আজও এর আকর্ষণ ক্ষমতা এতটুকু কমে নি। পৌষ উৎসবে খ্রিস্ট উৎসবের সন্ধ্যায় যখন উপাসনা গৃহের অন্দর বাহির আলোকিত হয়, তখন বিষয়ভিত্তিক আলোকময় পরিবেশ, স্থাপত্যের অঙ্গে অঙ্গে

ছড়িয়ে আলো-আঁধারির ভাস্কর্যে রূপান্তরিত হয়। আধুনিক স্থাপত্য পরিবেশ রচনায় বিষয়ভিত্তিক আলোর ব্যবস্থাকে প্রায়ই ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি তৃতীয় রূপের নাগাল পেতে, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শনে বিষয়ভিত্তিক আলোর বিন্যাস আজ আর নতুন কথা নয়। শতবর্ষ অতিক্রান্ত (সঠিক হিসেবে প্রায় ১০৫ বছর) উপাসনা গৃহ বা মন্দির স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে সাধারণ কিছু আলোর বিন্যাসে যে রূপ নেয়, তার মধ্যে চেষ্টার টানাপোড়েন একেবারেই নেই— যেটা আছে তা, স্বাভাবিক নির্মাণের গতিছন্দ। এই সরল নিয়মটাই পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রসময়কালীন গৃহ স্থাপত্য ও পরিবেশ নির্মাণ পরিকল্পনায় আরও বহুমাত্রায় বিস্তৃত হয়েছে। উপাসনা মন্দির স্থাপত্যটিকে কলকাতা থেকে প্রাক্‌নির্মিত পদ্ধতিতে লোহার বিভিন্ন অংশে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই কারণেই ঢালাই লোহার তুলনামূলকভাবে হালকা পাইপের থামগুলিকে মুখ্য ভারবাহক কাঠামো রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল। নান্দনিক দিক থেকে বৃত্তাকার থামের রেখার যে মসৃণতা থাকে সেটিকেই আরও অলংকৃত করে নিয়ে অর্ধখিলানের মাত্রায় কখনো জানালা, দরজা, আবার কাঠের ফ্রেমের আবরণে নির্মিত করা হয়েছে। যদিও মন্দিরের চারপাশের দেওয়াল ব্রাকেটফ্রেম ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তাকার চক্রাকার রূপরেখায় বিন্যস্ত তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরল রেখার কৌণিক আকৃতির ফ্রেমের বাঁধনেও, রঙিন কাঁচগুলিকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছিল।

উপাসনামন্দির গৃহের আকৃতি মূলত চারচালার ঢালু ছাদের রূপ। মন্দির গৃহের মাথার কাঠামোটি লোহার truss-এর দ্বারা নির্মিত। আচ্ছাদনটি সেকালের লোহার ঢেউতোলা চাদর দিয়ে তৈরি (corrugated steel sheet)। একেবারে উপরের অংশ পোড়া মাটির ডিজাইন করা বিশিষ্ট আকৃতির টালির সমষ্টি দিয়ে তৈরি। মাথার Ridge অংশ ভাগে নকশা করা পোড়ামাটির জাফরি কাজের প্রয়োগে একটি বিশিষ্ট নান্দনিক মাত্রা আনা হয়েছে।

অলংকৃত ঢালাই লোহার সুষম ফ্রেমগুলিকে রিভেটপদ্ধতিতে কলকাতায় জোড়াও দেওয়া হয়েছিল, তার পর বিভিন্ন অংশগুলিকে, বাড়ির নক্‌শা অনুসারে মাপের উপযুক্ত নাট-বল্টুর দ্বারা উঁচু প্লিন্‌থ ও ভিতের ওপর বসানো হল। জমি থেকে তিনটি বিভিন্ন উচ্চতার প্লিন্‌থ লেভেলের উপরে মন্দিরের সাদা পাথরের মেঝে বসানো হয়। প্রায় সাড়ে তিন ফুট উঁচুতে গৃহটির সর্বশেষ হলের লেভেল হওয়ার দরুন দিগন্তকে যেন একটা উচ্চতার তল থেকে পাওয়া যায়। চার ঢালের মাথার চালায় সমভাবে বৃষ্টির জলের উপরিনালা তৈরি আছে। এই ধরনের নির্মিত লোহার ফ্রেম আজও দেখতে পাওয়া যায় পুরোনো কলকাতার অনেক গৃহকোণে, অথবা গৃহের আখ্যানভাগে যেমনটা আজও আছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি ভবনে। উপাসনামন্দিরের ভিতরে রয়েছে একটি বড়ো হলঘর। উপরিভাগে কাঠের সিলিং, আগেকার দিনের ঝোলানো সমষ্টিবাতিদান। জানালা, দরজা সব খুলে দিলেই, হলঘরটি বৃহত্তর রূপ নেয়। লাগোয়া চার পাশের ছন্দোময় বারান্দা, একটু নেমে চাতালের ছন্দোময় বিন্যাস, সব মিলিয়ে যখন মন্দিরটি দিগন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন প্রকৃতি ও পরিবেশ-মাঝে স্থাপত্যটি যে গভীরতায় কথা কয়, তাকেই বলা যায়, নৈঃশব্দের নির্মাণ। উপাসনায় যে গম্ভীর প্রণত ভাবের দিকটি আছে, সন্ধ্যায় অথবা সকালের দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মাঝে কাঁচের মন্দির, নির্মিত রূপে একটি নির্মল মহিমাকে এনে হাজির করে। এই গৃহটি যদি ইঁট চুন সুরকির দেওয়াল ছাদ প্রভৃতি নিয়ে তৈরি হত, যেমনটা শান্তিনিকেতন গৃহ, তা হলে গৃহের এই স্বচ্ছ আবরণের মাঝে অনবরুদ্ধ আকাশ ও আলোকে নির্মিত স্থাপত্যের সজীবতাকে কখনোই পাওয়া যেত না। সেইকালে এত সব লোকালয় ছিল না, অসীম প্রান্তরের মাঝে ছিল কয়েকটি গাছপালা, এদিক-ওদিকে ধূ ধূ করছে মাঠ, দিগন্তের অসীম আকাশ গিয়ে মিলত মাঠের রেখায়— তখন আমরা যদি একবারটি ভেবে দেখি, আলো-আঁধারির মাঝে ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবোধ মন্দির স্থাপত্যটিকে, কেমন রূপে, এক অত্যাশ্চর্য নতুন বোধের আলোকে উত্তীর্ণ করে তুলত। সার্থক স্থাপত্য নির্মাণ আদর্শের এই হল আকরসূত্র— বিশ্বাস, উদ্দেশ্য ও জীবনবোধগুলিকে সমন্বিত করে, সজীবতায় জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠা করা। ঠাকুরবাড়ি থেকে মহর্ষি, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে একটি অসম্ভব প্রান্তরের মাঝে, এক নতুন আহ্বান এনে হাজির করলেন, কেবল বাণীরূপে নয়, একেবারে স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ রূপে।

উপাসনা মন্দিরের একদিকে, সাবেককালের আখ্যানভাগে, ফটকের লোহার আর্চ-এর কেন্দ্রে, পেতলের ঘণ্টাটি আমাদের সনাতন ঐতিহ্যেরই প্রকাশ। যদিও চার্চেও এই ধরনের পেতলের ঘণ্টা ব্যবহার করা হয়। ঘণ্টাটি সাধারণত স্থাপিত হয় অনেক উঁচুতে।

আরও একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা দরকার। উপাসনা মন্দির চত্বরের লৌহপ্রাচীর-ফটক প্রভৃতির বিন্যাস। ঢালাই লোহার জোড় দেওয়া অলংকৃত রেলিংএর ব্যবহার করা হয়েছে। সমকোণে চারটি ফটক মঞ্চ অবস্থিত। ইঁটের ছোটো দেওয়াল দিয়ে, প্লিন্থ রেখা সংরক্ষিত। উপরিভাগে ডিজাইনকরা ঢালাই লোহার রেলিং। অসামান্য ভারসাম্যযুক্ত লোহার বেড়ায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই ঘরানারই ডিজাইন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। ফুলের পাতার দেশীয় ডিজাইনের সঙ্গে আলগা ভাবে ছোটোছোটো ক্রস চিহ্নর আদলের ব্যবহার রয়েছে। ব্যাপ্‌টিস্ট চার্চের গড়নে যেমনটা দেখা যেত। সব থেকে চমৎকৃত করেছে, ভারি দোপাল্লা ফটকের দুপাশের ভারবাহী থামগুলি। চৌকোণা, ফাঁপা বাক্সআকৃতির লোহার ডিজাইনের থাম। সমগ্র মন্দির স্থাপত্য কাঠামোতে মেদবহুলতা থেকে, যেমন অলংকৃত (চিৎকৃত নয়) পেশীর বাঁধুনিকে অনেক বেশি গুরুত্বদান করা হয়েছিল, সমমাত্রায় প্রাচীর ফটক বিন্যাসে, সেই সূত্রটিকেই যেন আরও বিস্তারিত করা হল। গৃহস্থাপত্যে, এই মিলনবদ্ধতার আদর্শরূপ সন্ধান লাভ করার যোগ্য। অনেকসময়েই হয়তো একটা ভালো গৃহ নির্মিত হয়, কিন্তু সঙ্গের প্রাচীর অথবা বাগানের গঠনে প্রায়ই একটা দায়সারা ভাব থাকে, অথবা বেমানান নির্মাণে, সমগ্র রূপটিতে সংঘাতের সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে শান্তিনিকেতনের অনেক, ভালো ঐতিহ্যস্থাপত্যের সঙ্গে আধুনিক বেমানান, লোহার জালের কথা তোলা যায়। একটি সুন্দর সম্পূর্ণ উদ্যান অথবা গৃহসমষ্টিকে, বিনষ্ট করে দেয়, দায়সারা জালের বেড়া, তারের চিৎকার অথবা লোহার বেহিসেবি খাড়াই থাম।

মন্দির গৃহস্থাপত্যে, উদ্যান, বেড়া, ফটক, সকলে মিলেমিশে একটি নির্মিত পরিবেশের ঐকতান গড়ে তুলেছে। সেটাই স্থায়ী রূপ।

অনুর্বর প্রান্তরে নির্মিত উদ্যানের কাজ শুরু হয়েছিল মহর্ষির ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রেরণায়। আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল আমলকী শাল দেবদারু বকুল কদম্ব প্রভৃতি গাছেদের সঙ্গে মাননসই মালতী ও মাধবীর লতাবিতানে উদ্যান শোভা বিস্তৃত হয়েছিল। উদ্যানের চারি দিকের সীমানায় শাল সেগুন মহুয়া কেন্দ প্রভৃতি গাছ রোপণ করা হয়। সমস্যা ছিল উপযুক্ত মাটির। সে কারণে কাঁকরমাটির উপরিভাগ তুলে ফেলে, অন্যস্থান থেকে উর্বর মাটি এনে গাছের চাষ শুরু করা হয়েছিল। দ্বিতীয় সমস্যা ছিল, উদ্যানকে রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজনীয় জল। প্রথমে একটি বড়ো জলাশয় নির্মাণ করার জন্যে খনন কাজ চালানো হয়, কিন্তু অনেক অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের পরেও উঁচু ডাঙায় জল পাওয়া যায় নি। ভুবনডাঙার বাঁধের জল এবং সুগভীর ইন্দারার উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। জলাশয় খননের মাটি ঢিবি হয়ে ছোটো পাহাড়ের আকারে পরিণত হয়েছিল। 'তিন পাহাড়' আজও বেশ একটা অন্যরূপে ভূমিমধ্যে একটা তল বিন্যাসের আকার নিয়ে রয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির সবুজের আহ্বানের যে রূপ আমরা লাভ করেছি, সেই শান্তিনিকেতনের নির্মিত পরিবেশের সূত্র কথায়, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বোধহয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতি প্রাচীন যুগল ছাতিম গাছ, মালতীলতায় আচ্ছন্ন এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না" ('আশ্রমের রূপ ও বিকাশ')। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ থেকে এখানে এসেছিলেন, তখন তিনি পেয়েছিলেন, 'দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার বাঁধা শালগাছ। মাধবীলতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পুব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও বা তাল, কোথাও বা জাম, কোথাও বা ঝাউ, ইতস্তত গুটিকয়েক নারিকেল। উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদি।... উত্তর দিকে আমলকীবনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে দোতলা কোঠা আর তারই সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদম গাছের ছায়ায়।... আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালশ্রেণী।..."

পরিবেশ নির্মাণের এরকম একটি আদর্শভূমিতে, 'বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ' তার মাঝে, "এই শান্ত জনবিরল শাল বাগানে অল্পকয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল জামগাছের তলায়" ('আশ্রমের রূপ ও বিকাশ')। ভারতীয় আদর্শের তপোবন ও আশ্রম, বিশ্ববোধের আলোকে প্রতিষ্ঠিত হল। মুক্তির লীলাক্ষেত্র, নির্মিত পরিবেশের আকৃতিপ্রকৃতি নিয়ে, বিশ্ববোধ প্রকাশের পরিপূর্ণতায় সমবেত হয়েছিল।

১৮৯০ সালে শান্তিনিকেতনের সবুজ পরিবেশ বেশ ভালোভাবেই গড়ে উঠেছিল। চার পাশের বৃক্ষতার

মাঝে, সবুজদ্বীপের রূপে পল্লবিত হয়ে উঠছিল। এর সমর্থন মিলবে, ১৮৯০ সালের ২১ মে তারিখে, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে, "এই মরুভূমির মাঝখানে আমাদের এই বাগানটি গাছে ছায়ায় ফলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে পাখির গানে মুখরিত হয়ে, তরুপল্লবের অন্তরাল হতে দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসাদের দ্বারা মুকুটিত হয়ে নিভৃতমহিমায় বিরাজ করছে। এই বোলপুরের বাগান আমাদের ভারি ভাল লাগে।..."

পরিবেশ নির্মাণের এমন একটি দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল বলা যায়।

এবার আসা যায় উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু ঐতিহাসিক তথ্যে। ১৮৯১ সালের (মাঘ মাসের) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ করা প্রয়োজন : "...শান্তিনিকেতন নূতন ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন কার্য্য গত বৎসর সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এতদিনে মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। বিগত ৭ই পৌষ ঈশ্বরের প্রসাদে ঐ মঠ প্রতিষ্ঠার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। (অর্থাৎ প্রায় তেরো মাসের মধ্যেই নির্মাণটি সম্পূর্ণ করা হয়— লেখক) এই শুভদিনে শুভক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মন্দির বিচিত্র বর্ণের কাঁচ ও লৌহ নির্ম্মিত। চারিদিকে প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী। উহার পূর্ব্বদিকে উন্নত পঞ্চচূড়া। ঐ পঞ্চচূড়ার শীর্ষদেশে "ওঁ" "তৎ" "সৎ" "ঋতং সত্যং" এই কয়েক কথা সুবর্ণাক্ষরে দীপ্তি পাইতেছে। গৃহের দ্বার লৌহময়। ফলত মন্দিরের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্য উভয়ই তুল্য রূপে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা ভিতরের সৌন্দর্য্য মনপ্রাণ সমধিক আকর্ষণ করে।... অনন্তর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্যের উপসংহার করিলেন...

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত কার্য্যে যোগদান করিয়া উপাসক মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

"উদ্যানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের তলে মর্ম্মর নির্ম্মিত এক বেদী আছে। এখানে বসিয়া মহর্ষি শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালীন ঈশ্বর মনঃসমাধান করিতেন। উপাসনান্তে সাধকবৃন্দের দৃষ্টি সেই দিকেই নিপতিত হইল। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষের স্কন্ধদেশে 'কর তাঁর নাম গান' ধাতু ফলকে লিখিত দেখিয়া তাঁহারদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। দশ পনের জন সাধক মিলিত হইয়া হৃদয় খুলিয়া 'কর তাঁর নাম গান' এই গীতটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

"বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্থানীয় অধ্যাপকগণের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলেই উপাসনার সময় মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাদিগকে যোগ্যতা অনুসারে পাথেয় ও বিদায় প্রদান করিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী ব্রহ্মোপাসনার গম্ভীর ও শান্তভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

"এদিকে দেখি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত আর দুই চারিজন বন্ধুর সহিত সপ্তচ্ছদের নিম্নে বেদীর পার্শ্বদেশে স্তিমিতলোচনে ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এই মর্ম্মর বেদী, শান্তিনিকেতন উদ্যান, এই নূতন মন্দির যে কি ভাবে কি রূপ দৃষ্টিতে জনসাধারণ ভবিষ্যতে অবলোকন করিবেন,তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। দিবা অবসান হইতে চলিল, অথচ উদ্যানের নিভৃতদেশস্থ প্রস্তরবেদী ক্ষণকালের জন্য জনশূন্য— সাধকশূন্য দেখিলাম না। মহর্ষির সাধন-স্থান বলিয়া যেন সে কি আদরের সামগ্রী, পবিত্রতার আকর, ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক। বেলা দুইটার সময় ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দশ বারজন ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত কলিকাতা হইতে সমাগত হইলেন, এবং ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে আহারাদি করিলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইল, ক্রমে উপাসনার সময় নিকটে আসিয়া পড়িল। দূরাগত সাধক সজ্জনকে মন্দিরের মধ্যে স্থান দিয়া মন্দিরের দ্বার অবারিত করা হইল। লোকাধিক্যে মন্দিরের বাহিরে তিলমাত্র স্থান অবশিষ্ট রহিল না।"

ভবিষ্যতের জনসাধারণ আজও নিমগ্ন রয়েছেন উপাসনা মন্দির স্থাপত্যের গম্ভীর ও শান্তভাবের ঐতিহ্যরূপ দর্শনে। ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নির্মিতের স্থায়িত্বে, এই গৃহ স্থাপত্যটি, সর্বকালের সার্থকতার মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। এই অনুপম ঐতিহ্যটির সংরক্ষণের আশু প্রয়োজন। শুধুমাত্র বছরান্তে একবার দায়সারাভাবে রঙ ছড়িয়ে দিলেই, এর রক্ষণার কিছুই হয় না। মূল নকশাটির (Building Plan) উদ্ধারের ব্যবস্থা করা দরকার। তা হলে আমরা বিশদভাবে জানতে পাব গৃহের থাম, ভিত, ছাদের ফ্রেম, বিম— এ-সবের বিস্তৃত তথ্য। যা থেকে গৃহটির

স্ট্রাকচারাল রক্ষা ব্যবস্থাটিকে মজবুত করা যায়। গৃহের অন্দরে শ্বেতপাথরের স্ল্যাবের ব্যবহার করা হয়েছিল। তখনকার দিনে কলকাতার Murdoch & Co. পাথর লাগানো, পাথর খোদাই করার কাজে প্রসিদ্ধ ছিল। অনুমান করা যায় মার্বেল পাথরের সেটিংগুলি তাঁদেরই করা। পূর্বে উল্লিখিত শান্তিনিকেতন গৃহের তোরণদ্বারে শ্বেতপাথরের উপর লিখনগুলির কাজ Murdoch কোম্পানিরই করা ছিল। কাঠের সিলিং, ছাদের লোহার ঢেউতোলা চাদর, তার উপরিভাগে পোড়ামাটির ডিজাইন টালির স্থাপত্য শৈলীর, প্রায় অনেকখানি বিনষ্টের মুখে। যেমনটি আছে, তারই কতক Prototype তৈরি করে নিয়ে, মাপ, ডিজাইন, পোড়ানোর তাপমাত্রা, এইসব হিসেব কষে, সংরক্ষণ কাজে আসা এখনই দরকার। মনে রাখা দরকার, মন্দির-উপাসনা গৃহটি, বিভিন্ন অংশে, সংযোজিত হয়ে, গঠিত হয়েছিল। মূল কাঠামোটি সেকালের ঢালাই লোহার বিভিন্ন আকারের ফ্রেমে নির্মিত। বয়সের ভারে, এই ধরনের মূলত একটি প্রাক্-নির্মিত লোহার স্থাপত্য, ঠিক কেমন অবস্থায় রয়েছে, সেসব সঠিকভাবে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে, পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই ধরনের নির্মাণ বয়সের ভারে, তলে তলে কোনোরকম আগাম নোটিশ না দিয়েই, কিন্তু, হঠাৎ ভেঙে পড়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং সাবধানতার যেসব নির্দিষ্ট আচরণবিধি রয়েছে, তার উপযুক্ত প্রয়োগ করা দরকার এখনই। গৃহটির আজও একটি অভিনবত্ব হল, আলোর উন্মুক্ততাকে রাঙিয়ে নিয়ে, তাকে প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা। আলো, আরও আলো, সঙ্গে মানানসই পরিসর নির্মাণ— এই যেন বাড়িটার মূল থিম। কাঁচের দেওয়াল, কাঁচে মোড়া এর চার দিক। বিভিন্ন রঙের, মাপের ও গঠনের কাঁচ, আজ, বিশেষ দরকার হয়ে পড়ছে, অতীতের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিয়ে নিয়ে গৃহের মানবিক রূপরসটিকে বজায় রাখতে।

রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্প, গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতির যেমন নিত্য প্রয়োজন, সেই রকম অতিপ্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই এইসব গৃহস্থাপত্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় চর্চা ও প্রয়োগবিধির স্থায়ী পরিকল্পনার দরকার রয়েছে। মহর্ষি এই জনহীন রুক্ষ ধূসর প্রান্তরের মাঝখানে, গৃহ স্থাপত্য ও উদ্যান সমন্বয়ে, নির্মিত পরিবেশের সূত্রপাত করেন। আপাত অসম্ভব কর্মটির রূপায়ণে আশ্রম প্রাণের সঙ্গে নির্মাণ-প্রযুক্তির বিশেষ যোগসূত্র ছিল। এই ধরনের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার, ছন্দোবদ্ধতা,পরিবেশ নির্মাণের ক্ষেত্রে সহজে মেলা কঠিন।

প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে, নির্মল পরিবেশে মহর্ষির 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি' একটি স্থায়ী, 'আহ্বান-আসন-তল'-এর সৃষ্টি করেছিল। 'শান্তিনিকেতন-স্থাপত্য রূপ' -এর এই আদি সূত্র বা কেন্দ্রীয় ভাবনাটিই, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে, বৃহত্তর পরিসরে জীবনসাধনার ক্ষেত্র রূপে প্রসারিত হল। পরবর্তী পর্যায়ে সেইটি আমরা আলোচনা করব। আনন্দময় জীবনযাত্রা, নির্মাণ-রহস্যের অভিজ্ঞতায়, প্রকৃতির সহজ সরল রূপটিকেই গ্রহণ করে গড়ে উঠেছিল। সাধনবেদিতল, শান্তিনিকেতন উদ্যান গৃহ, আলোকময় উপাসনা গৃহ এবং নির্মিত পরিবেশ— শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে 'প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তোলার আভাস'— শুরু হয়েছিল মহর্ষির সৃষ্টিশক্তি দিয়ে। সেই আশ্চর্য স্থাপত্য রহস্য, পরিবেশের সঙ্গে পরিণয়ে, দিনে দিনে, বর্ষে বর্ষে, স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল।

ব্রিটিশ শক্তির কলোনি সংস্কৃতির আক্রমণ ডিঙিয়ে, সত্যের আলোকে, ভারতীয় বিদ্যাশ্রম ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রভূমি তৈরি হল। এই ঐতিহাসিক পরিবেশ নির্মাণের আদর্শসূত্রে ভারতীয় সংস্কৃতিই সুরক্ষিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সত্যসম্মিলনের বীজবপন এইভাবেই সংগঠিত হয়েছিল। মহর্ষির সাধনার দিনটি আর মরল না। বিশ্বকর্মার নির্মাণশক্তির সৃষ্টির মধ্যেই চিরদিনের মতো দিনটি আসন পেতে রইল।

[ক্রমশ]

বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি : নয় এ মধুর খেলা

আশীষ লাহিড়ী

বিজ্ঞান যে খুব প্রয়োজনীয় জিনিস, বিংশ শতাব্দীর এই শেষ প্রান্তে এসে তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বিজ্ঞানের যে-সব বিধ্বংসী অপপ্রয়োগ ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে তার জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করার মানে হয় না— যদিও আজকাল অনেকে তা করছেন। আমরা সে বিতর্কে যাব না। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের মূল বক্তব্য এই যে নিছক ব্যবহারিক উপযোগিতা ছাড়াই সাংস্কৃতিক ও মননগত ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান আধুনিক মানুষের মহত্তম আশ্রয়। সংস্কৃতি বলতে শুধু শিল্পসাহিত্য না বুঝে যদি 'কালচার'-এর বড়ো অর্থে কথাটাকে ব্যবহার করি, তা হলে এ কথা মানতেই হবে যে বৈজ্ঞানিক কালচার আয়ত্ত বা নির্মাণ করা ছাড়া আমাদের গতি নেই। এবং এই কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার যে শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে, 'হিউম্যানিটিজ্'-এর সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির কোনো মূলগত বিরোধ তো নেই-ই, বরং এরা একে অপরের পরিপূরক। শিল্পসাহিত্য, দর্শনধর্মের তুলনায় বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি বয়সের দিক থেকে নিতান্তই নাবালক, তাই শিল্পসাহিত্যবেত্তারা অনেক সময়েই এই বালকবীরকে একটু করুণার, একটু অবহেলার, এমন-কি, কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এ কথা ঠিক, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির মধ্যে অল্পবয়সোচিত ঔদ্ধত্যের মাত্রাটা একটু বেশি। কিন্তু সেই কারণেই যে তা সংস্কৃতির প্রবীণতর আচার্যদের অবহেলায় লাঞ্ছিত হয়, তা সত্য নয় ; আসল কারণটা হল প্রবীণ সংস্কৃতিবেত্তাদের আত্মতুষ্টতা, অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হবার ভয়। কিঞ্চিৎ দ্বিধাভরে হলেও এ কথাটা বোধহয় বলে ফেলাই ভালো যে বিজ্ঞানজগতের লোকেরা সংস্কৃতির অন্যান্য মহলে যত সহজে আনাগোনা করতে পারেন, অন্য মহলের লোকেরা বিজ্ঞানজগতে তত স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে সাহস পান না। তার একটা কারণ সম্ভবত ওই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির অভাব। এই বিচ্ছেদ আমাদের মানসিক পূর্ণতা অর্জনের পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক বলে আমরা মনে করি।

বর্তমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির মূল উপাদানটি কী এবং কেন তা ঈপ্সিত ব্যাপ্তি অর্জনে সফল হতে পারছে না সে সম্পর্কে গুণীজনদের মতামত নিয়ে কিছু আলোচনা করব। এ বিষয়ে নতুন বা মৌলিক কিছু বলবার ধৃষ্টতা নিবন্ধকারের নেই।

বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ববিদ রবার্ট মের্টন 1942 সালে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজ্ঞানের চারটি 'মান্য নীতি'র কথা বলেছিলেন : এক, বিশ্বজনীনতা (universality)। দুই, সমান অধিকার (communism)– অর্থাৎ বিজ্ঞানের জ্ঞান কারও কুক্ষিগত থাকবে না, সে জ্ঞান গোপন রাখার অধিকার কারও নেই। তিন, নিষ্কাম চর্চা (disinterestedness)– অর্থাৎ ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিজ্ঞানচর্চা না করা। এবং চার, সুসংবদ্ধ সংশয়ী মনোভাব (organized scepticism)।

টমাস কুন-এর নির্মোহ বিশ্লেষণের পর অবশ্য মের্টন-এর এই চারটি নীতিকে এখন আর একযোগে 'মান্য' বলে মানতে চাইবেন না অনেকেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা বিরাট— হয়তো প্রধান অংশই যেখানে সামরিক স্বার্থে সংঘটিত হচ্ছে, যেখানে বিজ্ঞানীদের 'মন্ত্রগুপ্তি'র শপথ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, সেখানে ওই দ্বিতীয় নীতিটি– 'communism'–তো প্রায় বর্জিতই বলা যায়। আর বৈশ্য প্রলোভনের হাতছানি যেখানে নিয়তই বিজ্ঞানীদের উত্তেজিত করে রাখে, এমন-কি, জীন পেটেন্ট করে রাখার অধিকার নিয়ে যেখানে দেশে দেশে তপ্ত বাদানুবাদ চলে, যেখানে 'নিষ্কাম বিজ্ঞানচর্চা'র কথা এমন-কি হাসিরও উদ্রেক করে না। সুতরাং মের্টন-নির্দেশিত তৃতীয় নীতিটিও কার্যত অচল।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল, বিজ্ঞানের 'বিশ্বজনীনতা'র ব্যাপারটি স্বতঃসিদ্ধ, বিতর্কের ঊর্ধ্বে। কিন্তু এখন এ নিয়েও কিছু সংশয় দেখা দিচ্ছে। বিশ্বজনীনতার অর্থ যদি এই হয় যে বিজ্ঞানের সত্য স্থানকালপাত্র

নির্বিশেষে সত্য, তা হলে কোনো গণ্ডগোল নেই। অভিকর্ষের নিয়ম কেমব্রিজে যতখানি সত্য, কল্যাণীতেও ততখানিই। কিন্তু যদি বলা হয়, বিজ্ঞানচর্চার 'পদ্ধতি'ও স্থানকালপাত্র নিরপেক্ষ, তা হলে অনেক প্রশ্ন উঠে পড়ে। প্রত্যেক দেশের অন্তত প্রত্যেক অঞ্চলের স্বতন্ত্র যে-কালচার থাকে তা থেকে নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞানের চর্চা করা যায় কি ? এ নিয়ে মতভেদ আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কালচারের স্বতন্ত্রতা পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করে নেওয়ার পরেও বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ জোসেফ নীডহ্যাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'এ কথা ভুললে চলবে না যে আধুনিক বিজ্ঞানের চেহারা পৃথিবীর সর্বত্রই এক। নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুক্তি সর্বত্রই মান্য, গাণিতিক তত্ত্বপ্রকল্পগুলোর (hypotheses) প্রয়োগ সর্বত্রই মান্য, রাশিবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তাদের যাচাই করার পদ্ধতি সর্বত্রই মান্য। বিজ্ঞানের কতকগুলো মৌলিক প্রত্যয় আছে যাদের কোনোমতেই লঙ্ঘন করা যায় না।' অনেকে এই বক্তব্য পুরোপুরি মানতে রাজি নন। তাঁরা বলছেন, দার্শনিক ও যুক্তিশাস্ত্রীয় কাঠামো দেশে দেশে ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং 'আধুনিক' অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে-প্যারাডাইম আজ মান্য, তা ছাড়াও অন্য প্যারাডাইমে বিজ্ঞানচর্চা করা যেতে পারে। তা যদি হয় তা হলে অন্তত পদ্ধতিগত দিক থেকে বিজ্ঞানের 'বিশ্বজনীনতা'কে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। বিজ্ঞানের যে একটা নির্দিষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি— method আছে, এই ধারণাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন 'নৈরাজ্যবাদী' পল ফেয়ারারেন্ড। Method বলে নাকি কিছু হয় না, যে যেভাবে পারে কাজ করে, নিজের প্রবণতা অনুসারে তথ্য ও পর্যবেক্ষণ ঝাড়াইবাছাই করে এবং তা থেকে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়— তাকেই বিজ্ঞানের 'সত্য' বলে প্রচার করা হয়। বলা বাহুল্য, ফেয়ারারেন্ড-এর এই চরমপন্থী মতকে বিজ্ঞানী মহল একেবারেই গুরুত্ব দেন না। *Nature* পত্রিকায় তাঁকে 'currently the worst enemy of science' বলে ধিক্কার জানানো হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক অনুশীলনপদ্ধতির বিশ্বজনীনতা নিয়ে বার্নাল-এর বক্তব্যটির মধ্যে চরমতা-বর্জিত ভারসাম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলছেন, বিজ্ঞানচর্চা মানেই তো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়, বিজ্ঞানচর্চার অনেকটাই হল রুটিনমাফিক গতানুগতিক কাজ (কুন-এর ভাষায় 'normal science')। এবং সেইসব কাজে সুনির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্বজনীন অনুশীলনপদ্ধতি অবশ্যই অনুসরণীয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আসল যে সৃজনশীল ক্ষেত্র, যে-গুণে বিজ্ঞান মানুষের অন্য সকল কর্ম থেকে স্বতন্ত্র, সে হল নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, আর সেখানে কার্যত কোনো নিয়মকানুন খাটে না— সেটা 'lies outside scientific method proper'।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, মের্টন-নিরূপিত চারটি 'মান্য নীতি'র মধ্যে দ্বিতীয় আর তৃতীয়টি কার্যক্ষেত্রে অচল এবং প্রথমটি নিয়েও কিঞ্চিৎ সন্দেহের অবকাশ আছে। কেবল চতুর্থটি, অর্থাৎ organized scepticism নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওইটিই বিজ্ঞানের, এবং সেই সূত্রে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির নির্ণায়ক লক্ষণ।

বিষয়টা নিয়ে আর-একটু ভাবা যেতে পারে। শুধু 'সংশয়বাদ' না বলে মের্টন 'সুসংবদ্ধ' বিশেষণের গণ্ডির মধ্যে তাকে বাঁধলেন কেন ? কারণটা সহজবোধ্য। Organized বা সুসংবদ্ধ কথাটার বিপরীত যদি হয় অসংবদ্ধ বা নিয়মহীন, তা হলে সেই যদৃচ্ছ সংশয়বাদ কেবল নৈরাজ্যকেই প্রশ্রয় দেবে মাত্র। এবং সে-নৈরাজ্য অবশ্যই বিজ্ঞানবিরোধী। সংশয় প্রকাশ করা মানে খুশিমতো প্রশ্ন তোলা নয়, সে প্রশ্নেরও সুসংগঠিত দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা চাই। ডারউইনবাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার খ্রিস্টান মৌলবাদীদের নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা নিছক ধর্মীয় আপ্তবাক্যের ভিত্তিতে সে প্রশ্ন তোলেন তখনই তা বুদ্ধিবিমুখ obscurantism-এর সগোত্র হয়ে পড়ে— যা সর্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিরোধী। চেতনানিরপেক্ষ বস্তুজগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের বিতর্ক স্মরণীয় এই কারণেই। রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের বিরোধিতা করেছেন, কোনো অটল অন্ধবিশ্বাসের জায়গা থেকে নয়, যুক্তিসমর্থিত দার্শনিক প্রত্যয়ের জায়গা থেকে।

এই সদাজাগ্রত প্রশ্নসংকুল সংশয়ী মনোভাবই যে বিজ্ঞানচেতনার মূল কথা সে বিষয়ে জগদীশচন্দ্র বসুর একটি মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপর্ণ : 'বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বের মতো সমস্ত শত্রুরাজ্যের মধ্য দিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে যজ্ঞ সমাধা হয় না।' সমস্ত শত্রুরাজ্য— অর্থাৎ সমস্ত বিরোধী যুক্তি। এই বিরোধিতা শুধু অন্যের বিরোধিতা নয়, নিজের অন্তরেরই সংশয় : বিজ্ঞানীকে 'সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া

চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে-মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি একদিকের কথা কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।' এই যে নিজের মনকে নিজে ফাঁকি দেওয়া, ভাবের ঘরে চুরি করা, এরকম ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বার বার ঘটেছে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চল্লিশের দশকে বিখ্যাত শিক্ষা-মনস্তত্ত্ববিদ সিরিল বার্ট যমজ সন্তানদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে বুদ্ধিবৃত্তির শতকরা আশি ভাগই হচ্ছে বংশগত, লালন-পরিবেশের ভূমিকা সেখানে নগণ্য। ইংলন্ডে অধ্যাপক বার্ট এতই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন যে তাঁর এই 'আবিষ্কারের' ভিত্তিতে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত ঢেলে সাজানো হল। অতঃপর সত্তরের দশকে জানা গেল তিনি শুধু ভুল বলেন নি, বস্তুত মিথ্যে বলেছেন। নিজের যেটা বদ্ধমূল ধারণা, মনোগত বিশ্বাস, সেটাকেই বৈজ্ঞানিক 'সত্যের' রূপ দেওয়ার জন্যে তিনি যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই নিজের মনগড়া তথ্য ও অর্ধ-সত্য বিজ্ঞানীদের সামনে পেশ করেছিলেন। বিজ্ঞানীদের নিজের মন যে নিজেকে কীভাবে ফাঁকি দেয়, এটা তারই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র।

কিন্তু বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে ব্যক্তি-বিজ্ঞানী এই ভুলের ফাঁদে যতই পা দিন, শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান নামক প্রতিষ্ঠানটি নির্মমভাবে সে ভুল ধরে ফেলে এবং শুধরে নেয়। বস্তুত জগদীশচন্দ্র সেই সংশোধন প্রক্রিয়াকেই নিজস্ব অননুকরণীয় ভাষায় বিজ্ঞানের অশ্বমেধ যজ্ঞ আখ্যা দিয়েছেন। সুসংবদ্ধ সংশয়ী মনোভাব সেই আত্মশোধন-প্রক্রিয়ারই হাতিয়ার। সেই হাতিয়ারে কখনো মরচে পড়ে না— বলে না বলেই সিবিল বার্ট-এর মতো বিজ্ঞানীর 'ভুল' তিন দশক পরে হলেও ধরা পড়ে যায়, সংশোধিত হয় সংশয়াপন্ন অন্য বিজ্ঞানীদের গবেষণায়।

কী করলে বিজ্ঞানকে ব্যক্তি-বিজ্ঞানীদের মনের এইসব দুর্বলতার হাত থেকে পুরোপুরি উদ্ধার করে প্রকৃত অর্থে নৈর্ব্যক্তিক রূপ দেওয়া যাবে, বিজ্ঞানের দার্শনিকদের সামনে সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন। পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়, পাছে বিজ্ঞান পা পিছলে অধিবিদ্যার কবলে গিয়ে পড়ে, এই ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই কি কার্ল পপার 'falsifiability'-কেই বিজ্ঞানের নির্ণায়ক লক্ষণ বলে মেনে নিয়েছিলেন ? যাকে খণ্ডন করা যায় না, যা শাশ্বত চিরসত্যতার দাবি করে তা আর যাই হোক বিজ্ঞান নয়। মন যে-সব তত্ত্বকে— hypothesis-কে— সত্য বলে মানতে চাইছে গবেষণার কাজ হল তাকে প্রাণপণে মিথ্যা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা। সেই চেষ্টার পরেও যদি কোনো 'সত্য' টিঁকে যায় তবে তাকে আপাতত গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক 'সত্য' বলে মানা যেতে পারে। পপারের এই মত বহুজনমান্য হলেও সর্বজনমান্য নয়। কিন্তু আমরা আপাতত এইটুকু লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত হব যে অধিবিদ্যা-বিরোধিতাই পপারের মতে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। মের্টন যেটাকে 'সুসংবদ্ধ সংশয়ী মনোভাব' বলছেন তার সঙ্গে পপারের চিন্তাধারার মিল ওই অধিবিদ্যা-বিরোধিতায়।

একেবারে অন্য মেরু থেকে আর-একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। পপার ছিলেন ঘোষিতভাবে মার্ক্সবাদ-বিরোধী দার্শনিক। আর বার্নাল ছিলেন ঘোষিতভাবে মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানী। অথচ অধিবিদ্যা-বিরোধিতাকে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রধান অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করেছেন এঁরা দুজনেই। পপার যেমন falsifiability-র কথা বলেছেন, তেমনি বার্নাল বলেছেন provisionalism-এর (অ-চিরপ্রযোজ্যতা ?) কথা। তাঁর মতে এটা নিছক নেতিবাচক সংশয়বাদ নয়, এক ধরনের ইতিবাচক নিশ্চিতি— বহু পরিশ্রমে লব্ধ আজকের জ্ঞান যে কাল অপ্রতুল বলে প্রমাণিত হবেই, তারই নিশ্চিতি। বিজ্ঞানী সেটা জেনেই বিজ্ঞান চর্চা করেন। বিজ্ঞান স্থায়ী শাশ্বত সত্যের সন্ধানে সময় নষ্ট করে না, বিজ্ঞান কেবলই সংশয় জাগিয়ে তোলে, সেই নিত্য-সংশয়ের আলোই প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধিকে বাড়িয়ে তোলে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্বয়কে উত্তরোত্তর দৃঢ় করে।

হকিং যখন 'mind of God'-কে জানার কথা বলেন, ওয়াইনবার্গ যখন 'final theory'-তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেন, তখন কিন্তু তাঁরা এ কথা বলেন না যে এর দ্বারা মানুষ তার সব ধাঁধার স্থায়ী উত্তর পেয়ে যাবে। মজার ব্যাপার হল, এঁরা প্রত্যেকেই positivism -এর (প্রত্যক্ষবাদ) বিরোধী, আবার প্রত্যক্ষবাদেরও মূল কথাটা হল ওই অধিবিদ্যা-বিরোধিতা। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য ছাড়া, প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য ছাড়া আর সমস্ত কিছুকেই তাঁরা অধিবিদ্যা বলে ধিক্কার জানান। এর চরম নিদর্শন অবশ্যই বিজ্ঞানী

এর্নস্ট মাখ, যিনি প্রত্যক্ষবাদে এতদূর নিমজ্জিত ছিলেন যে পরমাণুকে বাস্তবে অস্তিত্বশীল একটি বস্তু বলে মানতে রাজি হন নি। প্রত্যক্ষবাদ সম্পর্কে মাখ-এর এই প্রায়-মৌলবাদী প্রত্যয়কে বহু বিজ্ঞানীই নিন্দিত করেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সেটা বিবেচ্য নয়। বর্তমান বিবেচ্য এইটুকুই যে অধিবিদ্যার প্রবল প্রকোপে বিজ্ঞানকে বেপথুমান হতে দেখেই প্রত্যক্ষবাদীরা ওই চরম পথ বেছে নিতে প্ররোচিত হয়েছিলেন। এখানেও আমরা সেই সুসংবদ্ধ সংশয়বাদের চিত্রটাই দেখতে পাচ্ছি।

প্রত্যক্ষবাদী নন, মার্ক্সবাদী নন, কিন্তু বিজ্ঞানের সত্যসন্ধান-প্রয়াসের সঙ্গে সমাজের অগ্রগতির ও মানুষের দুঃখমোচনের স্পষ্ট সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী, এমন দুই দিক্‌পাল বাঙালি বিজ্ঞানীর কথা আলোচনা করা যেতে পারে। অধিবিদ্যাবাদী আপ্তবাক্যের প্রতি মেঘনাদ সাহার তীব্র বিরাগ আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। পূর্ববাংলার অজ পাড়াগাঁয়ের যে-বৃদ্ধ সাহার আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনে বলেছিলেন, 'সব ব্যাদে আছে', তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করা যায়, কিন্তু অনিলবরণ রায়-এর মতো শিক্ষিত মানুষ যখন 'প্রমাণ' করতে চান, হিন্দু পুরাণের দশাবতার-কাহিনীর মধ্যে ডারউইনীয় বিবর্তন-বাদ লুকিয়ে রয়েছে তখন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সেই অভাবকে ক্ষমা করা যায় কি ? সাহা অন্তত করেন নি ; তীক্ষ্ণ শাণিত যুক্তি ও তথ্যের নখরে তিনি ছিন্নভিন্ন করেছিলেন অনিলবরণ রায়কে। সাহার দেশপ্রেম কিছু কম ছিল না, কিন্তু সেই দেশপ্রেম তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি।

অনুরূপভাবে রবীন্দ্রশতবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য সুরজিৎ লাহিড়ী যখন অভিযোগ করেন বিজ্ঞানকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে মানুষ তার 'স্রষ্টা'কে ভুলে যাচ্ছে, তখন এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে 'বৈজ্ঞানিকের সাফাই' দেন স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি পরিষ্কার বলেন, মায়াবাদের দোহাই দিয়ে আমাদের দুঃখদীর্ণ সমাজের অস্তিত্বকে যতই অস্বীকার করার চেষ্টা হোক, তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য, এবং সেই বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হলে বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই। তাই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির কোনো বিকল্প হয না, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে— যেখানে মানুষের চেতনায় বিজ্ঞান এখনো প্রক্ষিপ্ত, বহুদূরের ব্যাপার এমন একটা কিছু যাকে দূর থেকে সমীহ করা হয়, কিন্তু আপন জেনে গ্রহণ করা হয় না।

ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞানীর সংশয়বাদ

এ কথা প্রমাণ করতে খুব একটা কষ্ট হয় না যে ধর্মকে মেনে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা করেছেন, বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরাও এই সুসংবদ্ধ সংশয়বাদের ঠেলাতেই এগিয়েছেন। পশ্চিম ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটানোর পেছনে প্রোটেস্টান্ট মতবাদের বিশেষ করে পিউরিট্যান সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান আজ মোটের ওপর সকলেই স্বীকার করেন। এই অবদানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী ? প্রথমত, রোমান ক্যাথলিকরা চিরস্থায়ী, পূর্বনির্দিষ্ট স্তরে ও ক্রমে বিন্যস্ত, পরিবর্তনহীন যে-বিশ্বপ্রকৃতির কথা বলতেন, সেটিকে এঁরা অস্বীকার করেন। সেই অস্বীকৃতি কেবল বহির্বিশ্বেই নয়, মানুষের নিজের প্রতিও প্রযুক্ত হল। গ্যালেন-এর কাছ থেকে আহরিত 'লিভার-হৃৎপিণ্ড-মস্তিষ্ক' এই স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট 'ক্রমটি'কে বাতিল করে কেবল হৃৎপিণ্ড-শাসিত এক মানবশরীরতন্ত্রের ভাবনা অধিকার করে তাঁদের। দ্বিতীয়ত, বাইবেলের বাণীর আক্ষরিক অর্থকে নির্বিচারে সত্য বলে স্বীকার করার বদলে তাঁরা সেই বাণীর 'ব্যক্তিগত' ব্যাখ্যার অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। এঁরা বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে দিয়ে তাঁরা ঈশ্বরের মহিমাকেই আরও নিবিড়ভাবে আবিষ্কার করছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শাশ্বত— অন্যকথায় অনড়— অধিবিদ্যাবাদী অচলায়তনের প্রাকার এঁরা ভেঙে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে এঁরাও ওই 'organized scepticism'-কেই বরণ করে নিয়েছিলেন।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা বা অর্জন করার ব্যাপারটা নিছক ঈশ্বর মানা বা না-মানার ওপর নির্ভর করছে না। ঘোর ঈশ্বরদ্রোহীও চরম অবৈজ্ঞানিকতার পোষক হতে পারেন, আবার পরম ঈশ্বরবিশ্বাসীরও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির বাহক হতে বাধা নেই। একজন কট্টর নকশালপন্থীকে জানতাম, যিনি জনগণের সঙ্গে

একাত্ম হবার উদগ্র প্রয়াসে হাতের গোড়ায় পেনিসিলিন ট্যাবলেট থাকা সত্ত্বেও খান নি এবং পায়ে পচন ধরে প্রাণটি খোয়াতে বসেছিলেন। আর-একজন পরম আস্তিক কবিকে জানি, তিনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'বস্তুত মানুষের বিজ্ঞান সব মানুষকে এক-পাগলামিতে-পাওয়া জীব বলে প্রমাণ করছে। বলছে, সে যাকে যেরকম জানছে বলে মনে করে সেটা একেবারেই তা নয়, সম্পূর্ণই উলটো। জন্তুরা নিজেদের সম্বন্ধে এরকম লাইবেল প্রচার করে না।' এঁদের মধ্যে কোন্ জন সংশয়মথিত বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রবক্তা ও ধারক সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবু প্রশ্ন ওঠে। ঈশ্বরই ধর্মের ভিত্তি। এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল আপ্তবাক্যে পর্যবসিত হওয়া। আপ্তবাক্য-নির্ভর সেই ধর্মই যে আজ বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা, সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোনো কারণ দেখি না। আপ্তবাক্য-নির্ভর ধর্মের প্রবক্তাদের অনেকেই প্রগাঢ় বিজ্ঞতার আত্মতুষ্ট হাসি বিতরণ করে বলেন, বিজ্ঞান আর কতটুকু ব্যাখ্যা করতে পারে! কথাটা খুব সত্যি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এবং 'তাহারই মাঝখানে' প্রাণ ও মানুষ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যত বাড়ছে ততই বোঝা যাচ্ছে (বোঝাচ্ছে অবশ্য বিজ্ঞানই) না-জানার ও না-বোঝার পরিমাণটা কত বেশি। বিজ্ঞান সবিনয়ে সেই সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু তার পরেও একটা কথা বলা বাকি থাকে। বিজ্ঞান খুব সামান্যই ব্যাখ্যা করে এ কথা ঠিক, কিন্তু আর কোন্ পদ্ধতির কথা আমাদের জানা আছে যা বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা করে? ধর্ম? ধর্ম তো ব্যাখ্যা করে না, ব্যক্ত করে। তার বনেদ হচ্ছে ব্যক্তির অন্তরের উপলব্ধি— যা প্রশ্নাতীত আপ্তবাক্য রূপে স্বীকার্য। বেদ অপৌরুষেয়, কোরান আদিষ্ট রচনা, বাইবেলও তাই। বৌদ্ধধর্ম এর ব্যতিক্রম, কারণ সেখানে মানুষের সামাজিক ও ঐহিক সমস্যাই প্রধান বিবেচ্য। কোন্ অর্থে এরা বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা দেয়?

তা ছাড়া ধর্ম সবসময়ই 'শাশ্বত' সত্যের কথা বলে। ধরা যাক পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ কোনো একটা উপলব্ধিতে উপনীত হয়ে সেটাকে সত্য বলে প্রচার করল। পরবর্তী পাঁচ হাজার বছর ধরে তা অপরিবর্তিত, নিত্য বলে পূজিত হল, কারণ ধর্মের সত্য শাশ্বত সত্য, তাতে সংশয়ের স্থান নেই। ফলে পাঁচ হাজার বছরে মানুষের জ্ঞান বাড়ল না, বড়োজোর একই স্তরে সীমাবদ্ধ রইল। এটা নিছক কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। স্বয়ং বিবেকানন্দের ভাষায়, 'ধর্ম সম্বন্ধে আর নূতন কিছু জানা সম্ভব নয়; তাহার সবটুকুই জানা হইয়া গিয়াছে।' সুতরাং এখনো ধর্মকে গতির বাহন বলে ভুল করলে তা অবধারিতরূপেই obscurantism-কে প্রশ্রয় দেবে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে সরে এসে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিকে আশ্রয় না করলে মানুষের মুক্তি নেই। আজকের দিনে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের (ব্যক্তিগত ঈশ্বরবিশ্বাসের নয়) বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই কেবল বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে। এমনও বলা যেতে পারে যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতা করাই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির ধর্ম। আমাদের দেশে হয়তো নয়, কিন্তু পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানচর্চাকারীদের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক কালচারটা, সি.পি. স্নো-র ভাষায়, 'বাস্তবিকই একটা কালচার— কেবল মননগত অর্থে নয়, নৃতাত্ত্বিক অর্থেও।' বিজ্ঞানীদের মধ্যে 'অভিন্ন মনোভাব, অভিন্ন মানদণ্ড, অভিন্ন আচরণরীতির ও অনুমানসমূহের' একটা অদৃশ্য সহধর্মিতার বন্ধন রয়েছে। সে-বন্ধন 'ধর্ম, রাজনীতি বা সামাজিক শ্রেণীগত ব্যবধানকে' বহুদূরে অতিক্রম করে যায়। জে. জে. টমসন আর লিণ্ডেসান-এর মতো রক্ষণশীল মানুষ, আইনস্টাইন আর ব্ল্যাকেট-এর মতো পরিবর্তনকামী মানুষ, কম্পটন-এর মতো খাঁটি খ্রিস্টান আর বার্নাল-এর মতো নিখাদ বস্তুবাদী মানুষ, দ ব্রগ্‌লি বা রাসেল-এর মতো অভিজাত মানুষ আর ফ্যারাডের মতো সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ, টমাস মের্টন-এর মতো ধনীর দুলাল আর রাদারফোর্ড-এর মতো 'চাষার ছেলে'— এঁদের মধ্যে শতসহস্র অমিল থাকলেও কোথায় একটা ধাতের মিল রয়েছে। সেইজন্যেই এঁরা একটা অভিন্ন সংস্কৃতির অঙ্গ।

এই সংস্কৃতিটা আছে বলেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা ঘনিষ্ঠভাবে ঈশ্বর ও ধর্মীয় উপলব্ধি নিয়ে চর্চা করেন, তখনো তাঁরা বিজ্ঞানের ভূমি থেকে সরে যান না। তা নিয়ে যুক্তিতর্ক যা-কিছু চলে তা ওই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির আওতার মধ্যে থেকেই চলে। যেমন সার জন এক্‌লেস বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তির সাহায্যেই প্রমাণ করতে চাইছেন যে খ্রিস্টীয় শাস্ত্রে যাকে 'আত্মা' বলা হয় তার অস্তিত্ব সত্যিই আছে। আবার ফ্রান্সিস ক্রিক পুরোদস্তুর

বস্তুবাদী যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চাইছেন যে মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ওই তথাকথিত 'আত্মা'র যাবতীয় ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায়। দার্শনিক বিচারে দুজনে দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন, কিন্তু দুজনেই ওই একই বৈজ্ঞানিক কালচারের অঙ্গ। সার নেভিল মট পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রথম ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করেন। তিনি অ্যাংগ্লিক্যান চার্চের সদস্য হন, কিন্তু বাইবেলোক্ত অলৌকিক কাহিনীগুলোকে মেনে নিতে পারেন নি, কারণ সেগুলো তাঁর পদার্থবিজ্ঞান-আহরিত বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। জোসেফ নীড্হ্যাম বায়োকেমিস্ট, মার্ক্সবাদী এবং ইতিহাসবিদ হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু সে কোন্ খ্রিস্টধর্ম ? বেদ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথারই যেন প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছিলেন, বাইবেল হচ্ছে মহৎ কবিতা, প্রত্যাদিষ্ট রচনা নয়।

এই অর্থে বৈজ্ঞানিক কালচার (যার প্রধান অঙ্গ হল সুসংবদ্ধ সংশয়বাদ) আমাদের মধ্যে কতটা গড়ে উঠেছে জানি না ; কিন্তু এটুকু জানি, ওই কালচার গড়ে না তুললে নিস্তার নেই। বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি আমাদের নিশ্চিতি দেবে না, স্বস্তি দেবে না, বরং মুহূর্তে মুহূর্তে সংশয়ের পীড়নে ক্ষতবিক্ষত করবে। কিন্তু স্বস্তির ওই অভাবটাই, সংশয়ের ওই পীড়নটাই কি মনুষ্যত্ব নয় ? প্রশ্নহীন, নিঃসংশয় স্বস্তিই তো বুদ্ধিবিমুখ মৌলবাদের জনক।

বইপত্র

জৈন শাস্ত্রের নূতন প্রকাশ

বহুকাল বাদে পিণ্ড ও ওঘনির্যুক্তির একটি ভালো সংস্করণ প্রকাশিত হল। এর মধ্যে এই সিরিজের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি ১৯৯১, দ্বিতীয়টি ১৯৯৪ সালে। প্রথম খণ্ডে আছে পিণ্ড ও ওঘনির্যুক্তির পদসূচি ও বিপরীত পদসূচি। ১—৮৭পৃ. পর্যন্ত পদসূচি এবং ৯১—১৬০ পৃ. বিপরীত পদসূচি। প্রথম খণ্ডে বলেছেন যে দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি পিণ্ড ও ওঘনির্যুক্তির মূল গ্রন্থখানি সম্পাদনা করবেন। আসলে Adlheid Mette পিণ্ডেসণা (Mainz 1974)-নামে এক পিণ্ডনির্যুক্তির সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। Bollée প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরই কাজের অনুসরণ হিসেবে পিণ্ড ও ওঘনির্যুক্তির সম্পাদনার কাজে হাত দিয়েছেন। Mette-র পিণ্ডেসণা এবং পিণ্ড ও ওঘনির্যুক্তিতে বহু প্রকার মিল থাকায় Bollée এব্যাপারে উৎসাহী হয়েছেন। Bollée আশা করেন, অধ্যাপক বলবীর অধ্যাপিকা Mette- র আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করবেন। ভোগীলাল লেহরচাঁদ ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ ইন্ডোলজিতে প্রথম খণ্ড দেখেছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দুটি খুব ছোটো। বইয়ের সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত ভূমিকা নেই। সুতরাং লেখকের অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানার কোনো উপায় নেই।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে পিণ্ডনির্যুক্তি (পৃ. ১—৩) ও তার ভাষ্য (পৃ. ৩৮—৪০) এবং ওঘনির্যুক্তি (পৃ. ৪০—৮৬) ও তার ভাষ্য (পৃ. ৮৬—১০৪)। তার পর শব্দনিঘণ্টু (পৃ. ১০৫—৩৮৮), গ্রন্থপঞ্জি (পৃ. ৩৮৯—৩৯৬)। এসবের সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজন আর. এন. শ্রীয়ন্-এর পুষ্পদন্তের মহাপুরাণের এক অতি প্রয়োজনীয় শব্দের সূচি। এ খণ্ডে মুখ্যত মূলগ্রন্থ ও শব্দসূচি আছে। কোন্ হস্তলিখিত পুথি থেকে গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে তার কোনো বিবরণ নেই। তবে ক্ষুদ্র ভূমিকায় বলেছেন যে, Adelheid Mette -র 'পিণ্ডৈষণা' গ্রন্থখানিকেই মূলত অনুসরণ করেছেন। মূল গ্রন্থখানি রোমান হরফে, নাগরীতে নয়।

প্রাকৃতের বই রোমান হরফে মুদ্রিত হলে তাতে কিছু সুবিধে থাকে। জৈন অর্ধমাগধী বই সাধারণত য়-শ্রুতি-তে ভর্তি থাকে। রোমান হরফে মুদ্রিত করলে য়-শ্রুতি দেখানো সম্ভব হয়। পিশেল য়-শ্রুতি বোঝাবার জন্য রোমান হরফে ý চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। য বা য়-শ্রুতি এক নয়। যদিও সম্পাদক ভূমিকায় বলেছেন যে, প্রকৃত পাঠকেরা য়-শ্রুতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন। রোমান হরফে মুদ্রিত করেও সম্পাদক য-শ্রুতি দেখাতে পারেন নি।

এ-কার এবং ও-কার সংযুক্ত বর্ণের আগে থাকলে হ্রস্ব হয়। সে হ্রস্বত্ব দুভাবে দেখানো যায়। এ-কারের হ্রস্ব ই-কার এবং ও-কারের হ্রস্ব ও-কার। নাগরীতে ছাপা হলে সাধারণত হ্রস্ব এ এবং ও যথাক্রমে ই ও ও-রূপে দেখানো হয়। কিন্তু যদি নাগরীতে এ- এবং ও-কার রাখা হয়, তা হলে সেই এ- এবং ও-কারকে হ্রস্ব বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু রোমান হরফে ছাপা হলে সে হ্রস্ব এ এবং ও যদি ই বা ঔ-তে পরিণত না হয়, তা হলে সেই হ্রস্ব এ এবং ও-কারের ওপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি (◡) একটি চিহ্ন দিতে হয়, যথা ĕ এবং ŏ। ভূমিকাতে উল্লিখিত থাকা সত্ত্বেও সম্পাদনায় তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নি। যেমন ekkekkeṇaṃ (১৫০), āṇejjā (৩৩৪)। এখানে এ-কার হ্রস্ব। সুতরাং একার ĕ-কার হিসেবে লেখাই সংগত। ছন্দের জন্য এগুলো হ্রস্ব হতে পারে বটে, কিন্তু দেখালে ভালো হত।

আর-একটি নিয়ম বিসদৃশ বলে মনে হয়। সাধারণত সপ্তমীর এক বচনে ম্মি হয় : কিন্তু তা অনুস্বার ম্মি (অর্থাৎ ংমি = mṃi) হয় না। যথা majjhammi (৪৭০), Valammi (৪৭৮)। অশোকের শিলালেখে এই জাতীয় লেখন-পদ্ধতি দেখা যায় বটে, কিন্তু অর্ধমাগধীতে সে ভাবে দেখা যায় না। কী পদ্ধতিতে সম্পাদনা করা হয়েছে তার বিস্তৃত ভূমিকা না থাকায় এ-সমস্ত অসংগতি আমাদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

শব্দনিঘণ্টুটি খুবই ব্যবহারযোগ্য এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। কখনো কখনো শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ দিয়ে

ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। এতে মূল প্রাকৃতের অর্থবোধে যথেষ্ট সুবিধে হয়েছে কিন্তু কতকগুলো শব্দ আছে যেখানে ব্যুৎপত্তি না দিয়ে সংস্কৃতের টীকা অনুসারে শব্দের অর্থ দিয়েছেন। যেমন উল্ল শব্দের বেলায় আর্দ্র। এ ক্ষেত্রে উনি প্রকারান্তরে 'উদ্র' শব্দ দিতে পারতেন। কারণ অনুদ্র (অন্ + উদ্র) শব্দ বেদে আছে। আসলে আর্দ্র শব্দ প্রাকৃতে অদ্দ, উদ্দ, এবং ওদ্দ এবং অল্ল, উল্ল এবং ওল্ল হয়। আর্দ্র থেকে অদ্দ ও অল্ল (র স্থানে ল) এবং উদ্র থেকে উদ্দ, উল্ল, ওদ্দ, ওল্ল হয়। উদ্র মানে 'জল' যেমন সমুদ্র (সম্ + উদ্র)। সম্পাদিত গ্রন্থে অল্ল নেই, কিন্তু অদ্দ, উল্ল ও ওল্ল শব্দের প্রয়োগ আছে। আর-একটি শব্দ হল তক্কোয়ণ (= তক্র + ওদন)। এর অর্থ Turner- এর অনুসারে "buttermilk with a third part of water"। অর্থাৎ এখানে ওদন শব্দ জল অর্থে Turner সাহেব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অঙ্গবিদ্যা গ্রন্থে এর অর্থ দিয়েছেন "boiled rice mixed with butter milk"। এ অর্থেই ওঘনির্যুক্তিতে ৯১নং শ্লোকে ব্যবহার হয়েছে। আসলে 'উদ' শব্দের অর্থ 'জল'। এর থেকেই উদ-ক, উদ্র শব্দদুটো জল অর্থেই প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু 'ওদন' শব্দ সংস্কৃতে 'অন্ন' অর্থেই ব্যবহার হয়। 'উদ' থেকে 'ওদ' হয়ে বটে, কিন্তু তাতে ওদনে অর্থের পরিবর্তন হয়। যাহা 'উদ' সাহায্যে সম্পাদ্য, তাহাই ওদ-ন, অন্ন।

কতকগুলো সংস্কৃত শব্দকে সম্পাদক তারকাচিহ্নিত করেছেন। যার প্রয়োজন ছিল না। যেমন প্রাকৃত 'বোহিয়' শব্দের *বোধিক। বোধি শব্দের সঙ্গে স্বার্থে ক-প্রত্যয় যোগে বোধিক হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তারকাচিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই। সেরূপ প্রতিলেখ, প্রত্যবচার, প্রত্যুপকার প্রভৃতি শব্দেও তারকা চিহ্ন আছে।

জৈন আগম শাস্ত্রে ওঘ ও পিণ্ড নির্যুক্তি খুব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এরা মূল সূত্রের অন্তর্গত। 'ওঘ' শব্দের অর্থ সাধারণ বা সামান্য জ্ঞান। জৈন সাধু বা গৃহস্থের আচার, নিয়ম নিষ্ঠা সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা আছে ওঘনির্যুক্তিতে। জৈন সাধুদের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ বর্ণনা আছে। যেমন, পতিলেহা (প্রতিলেখা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা), পিণ্ড (খাদ্য)। উবহিপমাণ (কর্ম প্রমাণ), অণায়য়ণ বজ্জ (ভ্রম নিরসনের উপায়), পত্তিসেবণা (উল্লঙ্ঘন), আলোয়ণা (দোষ-স্বীকার) এবং বিসোহি (প্রায়শ্চিত্ত) প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। পিণ্ডনির্যুক্তির সঙ্গে এর অনেক মিল আছে। এর প্রথম সংস্করণ বোম্বে থেকে ১৯১৯ খ্রি. আগমোদয় সমিতি সিরিজ ১৭-সংখ্যক বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাতে দ্রোণাচার্যের টীকা এবং অজ্ঞাত কোনো লেখকের ভাষ্য আছে। দ্রোণাচার্য দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। এ বইয়ের এখনও অনেক অপ্রকাশিত টীকা, বৃত্তি ও অবচূরি আছে। বোলী কোন্ ভাষ্য প্রকাশ করেছেন, তা তার ভূমিকা থেকে বোঝার উপায় নেই। এ ছাড়া, দ্রোণের বৃত্তি (সুরাট, ১৯৫৭) এবং জ্ঞানসাগরের অবচূরি (সুরাট, ১৯৭৪) দিয়ে আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বোলী শেষোক্ত গ্রন্থদুটির উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থপঞ্জিতে।

পিণ্ডনির্যুক্তি আর-একটি মূলসূত্র। ভদ্রবাহুস্বামীকে এ দুটি নির্যুক্তির রচয়িতা বলে ধরা হয়। পিণ্ড মানে ভিক্ষা, ভিক্ষালব্ধ আহার। জৈন সাধুদের ভিক্ষালব্ধ আহার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। সাধুদের কীভাবে ভিক্ষা দিলে প্রমাদ হয় (উগ্‌গমদোস), কীভাবে সাধুরা ভিক্ষা নিলে প্রমাদ হয় (উপ্পায়ণদোস), কীভাবে ভিক্ষা চাইলে সাধুদের দোষ হয় (গহণেসণাদোস), কীভাবে বণ্টন করলে দোষ হয় (ঘাসেসণা দোস) এগুলোর পিণ্ডনির্যুক্তিতে বর্ণনা আছে। বইটিতে মূলত আটটি অধ্যায় আছে। কিন্তু বর্তমান সম্পাদিত বইটিতে সে আটটি অধ্যায় দেখানো হয় নি। সাধারণত গাথার সংখ্যা ৭০০, কিন্তু বোলীর সংস্করণে ৬৭১টি গাথা আছে। অবশ্য, ভাষ্যের শ্লোক সংখ্যা গ্রহণ করলে ৭০৮টি গাথা হয়। এর প্রথম সংস্করণ বোম্বে থেকে ১৯১৮ খ্রি. দেবচন্দ্রলাল ভাই জৈন পুস্তকোদ্ধার সিরিজের ৪৪-সংখ্যক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। এতে মলয়গিরির বৃত্তি আছে। ক্ষমারত্নের অবচূরি দিয়ে ১৯৫৮ খ্রি. আর-একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এখানে 'মূল' বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বেবর (Weber) তাঁর *Indische studien* (১৭শ খণ্ড, পৃ. ৪১) গ্রন্থে বলেছেন যে 'মূল' শব্দটি জৈনাগম সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু আচারাঙ্গ নির্যুক্তিতে (১১.৬১) মূলসূত্র গাথার উল্লেখ আছে। মূল শব্দের অর্থ হল জৈন ধর্ম পালন করতে গেলে যা অতি অবশ্যই পালন করতে হবে, তা-ই মূল (প্রকৃতি)। চারটি মূলসূত্রের যা বিষয়বস্তু, তাতে তাই মনে হয়।

ভবিষ্যতে এই গ্রন্থদ্বয়ের আরও খণ্ড প্রকাশিত হবে বলে আশা রাখি। তা না হলে এই খণ্ডদুটো ব্যবহার

করতে অনেক অসুবিধে হবে। এই সুখপাঠ্য সংস্করণটির ছাপা ভালো এবং বাঁধাই সুন্দর। সম্ভবত সংস্করণটির ইংরেজি অনুবাদ হবে। যদিও পাদটীকায় বিভিন্ন পুথির পাঠান্তর দেওয়া নেই, তবু নির্বাচিত পাঠ প্রায় সব শুদ্ধ বলেই মনে হয়। সংস্করণটিকে তাই নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে।

William B. Bollée, *Materials for an Edition and Study of the Piṇḍa And Oha-Nijjuttis of the Śvetāmbara Jain Tradition*, Franzsteiner Verlagstuttgart, vol II, Text and Glossary, 1994. pp. xiii + 418.

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন-চর্চা

কিছুদিন আগে রামমোহন রায়ের লেখা চিঠিপত্র ও আবেদনপত্রের সংগ্রহের প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে। সংকলন এবং সম্পাদনা করেছেন সুপরিচিত রামমোহন-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস। এই গ্রন্থপ্রকাশের গুরুত্ব যে কতখানি পাঠকেরা সহজেই তা বুঝতে পারবেন।

রামমোহন সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমরা যা জানি সবই তাঁর জীবনী থেকে। রামমোহনের যেসব জীবনী রচিত হয়ে এসেছে, সে সবই পত্রিকায় বা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সরকারি নথিপত্রে সংরক্ষিত তথ্য ও সংবাদের উপর নির্ভর করে। সেসব আর আজ আমাদের কাছে সহজলভ্য নয়। সরকারি নথিপত্র এবং পুরোনো পত্রিকা থেকে রামমোহন-প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের দুটি বই *Rammohan and the Progressive Movement of India* এবং *Raja Rammohan Roy and the Last Moghuls*. রমাপ্রসাদ চন্দ এবং যতীন্দ্রকুমার মজুমদার -সংকলিত *Selections from the Letters and Documents Related to the Life of Raja Rammohan Roy* বইতে সংগৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া কুমারী কলেটের *Life and Letters of Raja Rammohan Roy* গ্রন্থে রামমোহনের চিঠিপত্র এবং তাঁর জীবনীর আদি উপকরণের ব্যবহার আছে। এ ছাড়া মেরী কার্পেন্টারের *The Last Days in England of Raja Rammohan Roy* বইটিও উল্লেখযোগ্য। রামমোহনের যে তিনখানি ইংরেজি গ্রন্থাবলি আছে, তাতেও এসব আকর উপাদানের সংকলন পাওয়া যায়। এসব ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রামমোহন সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্য প্রকাশ করেছিলেন।

উল্লিখিত বইগুলিতে রামমোহনের লেখা এবং রামমোহনকে লেখা যেসব চিঠিপত্র আছে, সে সবই আমাদের আলোচ্য বইতে একত্র সংকলিত হয়েছে উপযুক্ত টীকাটিপ্পনী সহ। দিলীপকুমার বিশ্বাস মহাশয় শুধুই এগুলি একত্রিত করেন নি, তিনি নিজেও আরও বহু চিঠি আবিষ্কার করেছেন দেশ এবং বিদেশের নানা প্রত্নশালা থেকে। তাঁর অনুমান, এখনও বহু চিঠি হয়তো য়ুরোপ-আমেরিকার নানা জায়গায় আছে যার হদিশ তিনি করে উঠতে পারেন নি। যে একষট্টিখানি চিঠি এবং কোনো কোনো চিঠির প্রত্যুত্তর এবং আনুষঙ্গিক তথ্য তিনি আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে দিলেন তার জন্য আমরা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পাঠকসমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত, এইসব স্বরচিত পত্রেই রামমোহন তাঁর নিজের ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক এবং দায়ভাগ-সম্পর্কিত মতামত সোজাসুজি জানিয়েছেন। তিনি তাঁর চিন্তা বা আদর্শ ব্যাখ্যা করে কোনো বই বা আত্মজীবনী লেখেন নি। রামমোহন সম্পর্কে আজ আমাদের যে ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা তাঁর বিতর্কমূলক রচনা এবং কর্মজীবন অবলম্বন করে। তাঁর মনোজীবনের পুরো পরিচয় পেতে গেলে এই চিঠিপত্রগুলিই মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। অবশ্য এর থেকে তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার কোনো পরিবর্তন ঘটবে, এমন বলা যায় না। আমরা যা ধারণা করে রেখেছি এই চিঠি থেকে তার সমর্থনই পাওয়া যাবে। বিশেষত সম্পাদক যে-

রকম খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে এসব চিঠির পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন, পত্রোক্ত ব্যক্তি ও ঘটনার বিশ্লেষণ এবং বিবরণ দিয়েছেন, তাতে রামমোহনের পূর্ণাঙ্গ চরিত্ররূপটি স্পষ্টতর হয়েছে।

এ বইতে সংকলিত পত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। আমরা চিঠি বলতে বুঝি দুই ব্যক্তির মধ্যে লিখিত আলাপ। সেই রকম চিঠি সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে, তার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। চিঠি বলতে যেমন বুঝি নিছক সাংসারিক প্রয়োজনের প্রসঙ্গ, তেমনি সাহিত্যরসমণ্ডিত পত্রও। সে-পত্র ব্যক্তিহৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে। রামমোহনের কোনো কোনো চিঠিতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাকলেও অধিকাংশ চিঠিই সামাজিক বিষয় নিয়ে যুক্তিবদ্ধ রচনা। যেমন, ধর্ম শিক্ষা শাসনতন্ত্র সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। কোনো পত্র রাজকর্মচারীকে লেখা, কোনো পত্র খ্রিস্টীয় পাদ্রীকে লেখা, কোনো পত্র সংবাদপত্রের সম্পাদককে লেখা। কোনো পত্র জনসাধারণের পক্ষ থেকে ইংরেজ শাসকের উদ্দেশ্যে, কোনো পত্র দিল্লির বাদশাহকে। কোনো পত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যানকে, কোনো পত্রের উদ্দিষ্ট ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ। নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লেখা তাঁর কোনো চিঠি নেই। বাংলায় বা ফার্সিতে লেখা তাঁর কোনো চিঠিও পাওয়া যায় নি। এই খণ্ডে যে একষট্টিখানি চিঠি সংকলিত হয়েছে, তাদের বিষয় মোটামুটি এই রকম—

১. অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিবাদ
২. উইলসনকে লেখা শঙ্করাচার্যর কালনির্ণায়ক পত্র
৩. সতীদাহ সম্পর্কিত পত্র
৪. শিক্ষা-বিষয়ক পত্র
৫. ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্কমূলক পত্র
৬. বাকিংহামকে লেখা স্বাধীনতা-বিষয়ক পত্র
৭. প্রেস আইন সম্পর্কে পত্র
৮. ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে পত্র
৯. সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পত্র
১০. মোগল বাদশার পক্ষে আর্জি
১১. ইংলণ্ডে বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে লেখা পত্র

এদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম-বিষয়ক বিতর্কমূলক পত্রের সঙ্গে রামমোহনের প্রতিপক্ষ ডক্টর টাইটলারের একগুচ্ছ পত্রও আছে। এই বিতর্কে রামমোহন 'রামদাস' ছদ্মনাম নিয়েছেন। পত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছে 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকার পাতায়। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে মোগল বাদশার বৃত্তি বাড়ানোর ব্যাপারে দুটি মূল্যবান দলিল। এসব চিঠির মধ্যে প্রায় আঠারোখানি পত্র সম্পাদক নিজেই আবিষ্কার অথবা সংগ্রহ করেছেন। আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের বিখ্যাত শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবকে গভর্নমেন্ট কী ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সে বিষয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক দলিলও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

এইসব বিভিন্ন বিষয়ের চিঠিতে বোঝা যায়, রামমোহনের চিন্তা কত দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বাংলা গদ্যসৃষ্টিতে রামমোহনের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। অবশ্য এই পত্রসংকলনে সাহিত্য বা গদ্য সম্বন্ধে তাঁর কোনো পত্র নেই। কিন্তু শঙ্করাচার্যের সময় নিয়ে উইলসনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপে রামমোহনের গবেষণাপ্রবণতা দেখে পাঠক চমৎকৃত হবেন। চৈতন্যের দ্বৈতবাদের আদিতে যে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের যোগ ছিল রামমোহন এই অনুমান করেছিলেন। সম্পাদক দেখিয়েছেন, সুশীলকুমার দে বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস লিখতে গিয়ে যে সিদ্ধান্ত করেছেন রামমোহন একশো বছর আগেই সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বর্তমান খণ্ডে অবশ্য এধরনের গবেষণা-সংবলিত চিঠি বেশি নেই, কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে যখন ভারতের ইতিহাসের সুসংবদ্ধ রূপরেখা তৈরি হয় নি, তখনই এই চিঠিপত্রে আমাদের দেশের পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশিত হতে দেখি। আকবর বাদশার উদারতায় তিনি যেমন নিঃসন্দিগ্ধ, ঔরঙ্গজীবের শাসননীতিতে তিনি তেমনি বিরূপ। মোগলযুগের শেষ পর্যায়ে দেশে বিশৃঙখলা এবং প্রজাপীড়নের কথাও তিনি নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। তারই সঙ্গে তুলনা করে রামমোহন ইংরেজের আগমনকে বিধাতার শুভ বিধান বলেই বর্ণনা করেছেন।

রামমোহনের এই ধারণা বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'কেই মনে পড়িয়ে দেয়। অথচ দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমের যেমন ছিল, রামমোহনেরও তেমনি ছিল। বাকিংহামকে লেখা চিঠিতে এবং অন্যত্র তিনি বিশ্বের জাতির স্বাধীনতায় উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ইংরেজের প্রশংসা ছাড়া নিন্দা তিনি কোথাও করেন নি, এর কারণ ইংরেজদের সান্নিধ্যেই দেশে আধুনিক জীবনাদর্শের সূত্রপাত হয়েছে। রামমোহন মনে প্রাণে তার প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন। নিজে বেদান্তের চর্চা করেও শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি বেদান্তানুশীলনকে বাদ দিতে বলেছিলেন।

রামমোহনের আবির্ভাবকাল ছিল ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিক। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পলাশীর যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে; মোটামুটি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখনও আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের অধিকার, দায়িত্ব, বিধিবিধান অনেক কিছুই স্পষ্ট রূপ নেয় নি। গণতন্ত্র তখনও অলীক, তখনও আবেদন আর্জি দিয়েই শাসকশক্তির কাছে আনুকূল্য ভিক্ষা করতে হত। এটা ছিল মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক পদ্ধতি। দোলাচলতা ছিল ইংরেজ-পূর্ব যুগের সামাজিক ব্যবস্থা এবং ইংরেজ-প্রবর্তিত নতুন যুগের সমাজব্যবস্থার মধ্যে। রামমোহনের চিঠিপত্রের মধ্যে নতুন যুগের রীতিনীতিকে আবাহন করে নিয়ে আসার প্রয়াস। পূর্বযুগের মুসলমান শাসনের ছায়ায় তা হবার সম্ভাবনা ছিল না। এজন্যই ইংরেজ শাসন-কর্তৃপক্ষকে সম্বোধন করে লেখা আবেদন ও চিঠিপত্রে পূর্বযুগের মুসলমান শাসনের সমালোচনা ও নিন্দা উচ্চারিত হয়েছে এবং ইংরেজ প্রশস্তি অকুণ্ঠ। পরবর্তী কালের স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়ে রামমোহনের এই মনোভাবকে বোঝা যাবে না। প্রেস আইন সম্পর্কে জুরিতে দেশীয় লোকের অধিকতর স্থানের দাবি ক'রে, দেওয়ানী বিধির পরিবর্তন চেয়ে রামমোহনের দীর্ঘ আবেদনপত্রগুলি স্পষ্ট যুক্তিপূর্ণ অথচ বিনীত ভাষণে অসাধারণ বললেই হয়। রামমোহনের চিঠির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুক্তির প্রখরতা। অনুভূতি ও ভাবাবেগ প্রায় নেই। এটা ইংরেজি ভাষার জন্য— এ কথা বলা যাবে না। তখনও তারিখ মিলিয়ে ভিকটোরিয়া যুগ আরম্ভ হয় নি কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের সেই যুগে গদ্যে ভাবাবেগ আসে নি, তাও বলা যাবে না। মোগল বাদশাহের পক্ষে লেখা চিঠিতেও যুক্তি এবং তথ্যের নিপুণ সমাবেশ তাঁর বৈশিষ্ট্যবাচক।

প্রতি চিঠির শেষে টীকার মধ্যে সম্পাদকের সুবিবেচনাপ্রসূত বিন্যাস-দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। তাঁর পদ্ধতি হচ্ছে— চিঠির প্রাপ্তিস্থলের উল্লেখ, পূর্বে মুদ্রিত হয়ে থাকলে কবে এবং কোথায় হয়েছে তার উল্লেখ, তার পর চিঠি লেখার উপলক্ষ বা পশ্চাৎপটের বিবরণ, তার পর চিঠিতে উল্লিখিত মন্তব্যের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিস্তার। কতকগুলি পত্রের উদ্দিষ্ট কে জানা যায় না; আবার দু-একটি পত্র যে রামমোহনেরই লেখা সেটা সম্পাদককে অনুমান করতে হয়েছে (পৃ. ৩৫৪)। ২৪০ পৃষ্ঠার ৭ পঙ্‌ক্তিতে সম্ভবত ছাপার ভুল গুরুতর : Government would interfere with established faith of the natives of this country. মনে হয় would -এর পর not শব্দটি বাদ পড়ে গেছে। তবে ছাপার ভুল এ বইতে খুবই কম।

একটা কথা বলা বাহুল্য হলেও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো। এই বই পড়বার আগে রামমোহনের জীবনের রূপরেখা পাঠকের জানা থাকলে ভালো হয়। সেইজন্য বইয়ের ভূমিকা অংশে এরকম একটা স্কেচ থাকলে অবিশেষজ্ঞ পাঠকদের সুবিধা হত। চিঠিগুলি তারিখক্রমে সাজানো। ১৮০৯-এ লর্ড মিন্টোকে লেখা চিঠি থেকে ১৮৩১-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডেপুটি চেয়ারম্যানকে লেখা পত্র। এই সময়ের মধ্যে রামমোহনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পাঠকের জানা থাকা দরকার। তা হলে চিঠিগুলির বক্তব্য বুঝতেও সুবিধা হয়। তবে সম্পাদকের টীকাতে পটভূমি যথেষ্ট স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এবং শুধু স্পষ্ট করাই হয় নি, আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠককে নিয়েও যাওয়া হয়েছে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। তার ফলে শুধু বিশেষ চিঠি নয়, সংশ্লিষ্ট অনেক তথ্যই পাঠক জানতে পারেন। সম্পাদকের বিস্তৃত টীকায় মনীষী রামমোহন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন।

আমরা এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকলাম।

The Correspondence of Raja Rammohun Roy, **edited by Dilip Kumar Biswas, Saraswat Library. Calcutta, 1992, Price Rs. 425/-**

ভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ রামেন্দ্রসুন্দর : মতৈক্য ও মতদ্বৈধ

পত্রসাহিত্যকে বিচিত্র রূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কখনো তার মাধ্যমে শুনিয়েছেন ভ্রমণবৃত্তান্ত: প্রথম যৌবনে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' এবং শেষ বয়সে 'রাশিয়ার চিঠি'— কবিজীবনের দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত রচনা দুটির মিল এইখানে। পারস্য, জাপান, বা জাভা পরিক্রমার অভিজ্ঞতা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন চিঠির মাধ্যমে। 'পথে ও পথের প্রান্তে' বইটিও একই ধরনের। শিশুমনের সঙ্গে সহজ আত্মীয়তার প্রকাশ 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ; কবিসত্তার পরতে পরতে উন্মোচন 'ছিন্নপত্রাবলী'-তে। বস্তুত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পত্রকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম তো বটেই, ব্যক্তিগত পত্র রচনার সংখ্যা বিচারে সকলের চেয়ে এগিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় ছ দশক হতে চলল। তাঁর বিপুল পত্র ভাণ্ডার এখনো সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নি, পর্যায়ক্রমে তার প্রকাশ ঘটছে, আরও কতদিনে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে কে বলতে পারে। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির প্রতিটি স্বতন্ত্র অভিনিবেশ ও আলোচনার দাবি রাখে যেহেতু স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা এখানে আমাদের তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে এগুলির তাই বিশেষ মূল্য আছে। তারিখ মিলিয়ে পড়লে এরা কবির বিভিন্ন রচনাকর্মের সুলুকসন্ধান দেয়, আবার কবির সরস দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে ধরে। ব্যক্তিগত হয়েও এরা নৈর্ব্যক্তিক, বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করলেও গাম্ভীর্যের মুখোশ ধারণ করে না। প্রকাশভঙ্গিতে অন্তরঙ্গ হলেও এদের আবেদন ক্ষণস্থায়ী নয়। 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ভূমিকায় এই ধরনের চিঠির প্রতি তাঁর দুর্বলতার কারণ বোঝাতে কবি বলেন— "আমার যে চিঠিগুলো অনাবশ্যক একদিন ছড়িয়ে পড়ছিল সমুদ্রের ধারে রঙবেরঙের ঝিনুক শামুকের মতো, বাইরের পাঠকদের মতোই আমি তাদের কৌতূহলের চোখে দূরের থেকে দেখছি।" রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র অধিকার করে আছেন। লিপিকুশলতা বা ভাবের বাহন হিসাবে কেবল নয়, তাঁর চিন্তাচর্যার সাক্ষ্যরূপে চিঠিগুলির একটি অতিরিক্ত ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে এই মূল্য কিছু বেশি। তার প্রথম কারণ এর কালগত বিস্তার। সাল-তারিখ অনুযায়ী বিন্যস্ত করলে গ্রন্থের প্রথম চিঠি হতে পারত রবীন্দ্রনাথ যেটি রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখেছিলেন ২৬ ফাল্গুন ১৩০৬ (ইংরিজি ৯ মার্চ ১৯০০)। বিপরীতে সর্বশেষ চিঠির তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৩৪১ (ইংরিজি ২৬ এপ্রিল, ১৯৩৪)। এটিও রবীন্দ্রনাথের লেখা যদুনাথকে। সম্পাদক অবশ্য এই ক্রম অনুসরণ করেন নি। গ্রন্থ শুরু হয়েছে (পৃষ্ঠা ৯-৩৫) যদুনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি দিয়ে। এদের সংখ্যা আঠারো। এর পর এসেছে রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চল্লিশটি চিঠি* (পৃষ্ঠা ৩৫-৮২)। রবীন্দ্রনাথকে লেখা যদুনাথের যে একটিমাত্র চিঠি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তা স্থান নিয়েছে এর পরই। রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত রামেন্দ্রসুন্দরের আটটি চিঠির সন্নিবেশ ঘটেছে কিছু ব্যবধানে। মাঝের অংশ (পৃষ্ঠা ৯৬-১১০) পূরণ করেছে ইংরেজিতে যদুনাথের লেখা রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প বিষয়ে আলোচনা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সরকার-নিযুক্ত স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনের বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উক্তি। দুটি-ই সম্পাদকের সংযোজন। প্রথমটি উদ্ধার করা গেছে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একটি টাইপ কপি থেকে। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক জানাচ্ছেন "রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৪তে 'সাধনা'য় ছোটোগল্প লিখছেন সেই সময়েই সদ্য এম-এ পাস, রিপন কলেজের অধ্যাপক যদুনাথ ইডেন হস্টেলের সুহৃদ সমিতির পত্রিকা 'সুহৃদ'-এ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সম্বন্ধে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখেন "The New Leaven in Bengal"। এর সবটাই এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্যাডলার কমিশন নিয়োগের পিছনে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে যাচাই করা। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কমিশন যে রিপোর্ট প্রকাশ করে বর্তমানে তা দুষ্প্রাপ্য। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে প্রতিবেদনের যে কপি রয়েছে, সম্পাদক বর্তমান গ্রন্থে তা কাজে লাগিয়েছেন।

*এই গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা ভেবে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (পৃ. ২২০) যা প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য লাইব্রেরির তৎকালীন সম্পাদক গৌরহরি সেনকে লেখা হয়েছিল বলে সম্পাদক জানাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা বা তাঁর কাছে লেখা চিঠিগুলির বেশির ভাগ অংশই হয়তো চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর জীবনের প্রথমাংশের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান সম্পর্কে কথাটি নিশ্চয়ই আরও সত্য। যতখানি সংগ্রহে আছে তার উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং সম্ভবমতো নতুনতর প্রাপ্তির জন্য এখন আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। বিভিন্ন সূত্রে গড়ে ওঠা এই চিঠির ভাণ্ডারে প্রতিটি চিঠিই যে পূর্বাপরসম্পর্কযুক্ত হয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে তা নয়। মাঝে মাঝেই সৃষ্টি হয়েছে ফাঁক। হয়তো দেখা গেল সন তারিখ মিলিয়ে পরপর কতকগুলি চিঠির সন্ধান পেলাম, তার পরই কিছু সময় আবার কোনো চিঠির হদিশ-ই নেই, পরবর্তী চিঠি খানিক কালগত ব্যবধানে। এই অবস্থায় পত্রসংকলন কালানুসারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই রীতি অনুযায়ী-ই রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' এখন পর্যন্ত সংকলিত হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট কালের পটভূমিকায় এগুলি দেখা সম্ভব হচ্ছে। রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি কালানুক্রমে নিচের সারণিতে নির্দিষ্ট হল :

বছর	চিঠি পাঠানোর তারিখ
১৮৯৭	জুলাই ১৯ ; অক্টোবর ১৪
১৮৯৮	(বাংলা ১৩০৫) বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
১৯০৫	এপ্রিল ২০, ২৭ ; ডিসেম্বর ১২
১৯০৭	মে ২, ১৮ ; জুন ২৬ ; জুলাই ২, ২৯ ; অগাস্ট ৩
১৯০৮	জানুয়ারি ১১ ; ফেব্রুয়ারি ২৩ ; নভেম্বর ২৪ ; ডিসেম্বর ১৬
১৯০৯	মে ৯ ; জুলাই ১৪ ; সেপ্টেম্বর ১৭ ; অক্টোবর ১৩, ১৫
১৯১০	জানুয়ারি ২৫ ; সেপ্টেম্বর ১৭ ; অক্টোবর (তারিখ অনুল্লিখিত)
১৯১১	জানুয়ারি ২৯ ; ফেব্রুয়ারি ১৫ ; মে ৪, ৫, ১০
১৯১৩	নভেম্বর ১৭
১৯১৪	ডিসেম্বর ২৭
১৯১৫	জানুয়ারি ১১, ২৭
১৯১৭	মার্চ ১৮ ; এপ্রিল ২১ ; মে ১০
১৯১৯	জানুয়ারি ২৩

এই গ্রন্থে মুদ্রিত বেশির ভাগ চিঠি-ই রবীন্দ্রনাথের রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা এবং ওপরের সারণিটি থেকে স্পষ্ট হবে— এদের অধিকাংশের রচনাকাল ১৯০৫ থেকে ১৯১১ অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে কবির ইয়োরোপ যাত্রার মধ্যবর্তী সময়। এরই মধ্যে ১৯১২খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথের জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল পরিষৎ-সম্পাদক হিসাবে তাতে প্রধান দায়িত্ব পালন করেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই উপলক্ষে যে বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ-সহ সমগ্র অনুষ্ঠানটির বিশদ বিবরণ সংকলন করেছেন সম্পাদক "গ্রন্থপরিচয়" অংশে (পৃষ্ঠা ২০৮-২১৯)। সমকালীন 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকা এবং কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী -রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থ এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান নির্ভর। উক্ত ঘটনার দু-বছর পর রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর সম্মানে যে মানপত্র রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন বর্তমান গ্রন্থে তা-ও পুরোপুরি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ("সাহিত্য সাধক চরিতমালা"-য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনী অবলম্বনে)। পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করি রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র-সংখ্যা ২৯ এবং ৩০-এর প্রতি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের প্রচার কবির কীরূপ মনস্তাপের কারণ হয়েছিল তা বোঝা যায় উপর্যুপরি দু-দিন (যথাক্রমে মে ৪ এবং ৫, ১৯১১) রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রেরিত আবেদনে, সাহিত্য পরিষদকে তিনি যেন এই উদ্যোগ থেকে নিবৃত্ত করেন। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর দেশবাসীর আনন্দাতিশয্যের মধ্যে সমালোচনার সুরে বিদেশের সম্মানপ্রাপ্তির পূর্বে স্বজাতীয়রা তাঁর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন নি এমন অভিযোগ শোনা গেল, রামেন্দ্রসুন্দর ভিন্নতর যুক্তি

নিবেদন করেছিলেন কবির উদ্দেশে এক পত্রে (১৬ নভেম্বর ১৯১৩)। বিস্তৃত উদ্ধৃতি অপরিহার্য মনে হল :

"অনেকে বলিতেছেন, স্বদেশ যাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, বিদেশ তাঁহাকে চিনাইয়া দিল, ইহা স্বদেশের ধিক্কারের কথা। আমি তাহা স্বীকার করি না। স্বদেশের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহার নিজেকে চিনিবার সম্পূর্ণ শক্তি নাই ; যাহারা আপনার, তাহাদিগকে চিনিবারও শক্তি নাই : যে শক্তিটুকু আছে, তাহার সম্যক প্রকাশেরও ক্ষমতা নাই। কালি যদি আমার দেশ গলা খুলিয়া বলিতে যাইত, আমার এই ভাঙা ঘরের দেওয়ালের ভিতর এমন প্রদীপ গুপ্ত আছে, যাহা জগতে আলো দিতে পারে, তাহা হইলে আমার দেশকে কিরূপ বিদ্রূপ ও অপমান সহিতে হইত, তাহা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু আজ যখন সেই জীর্ণ প্রাচীর ভিন্ন করিয়া স্বয়ংপ্রকাশ রবিজ্যোতিঃ আপনা হইতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই আলোতে সেই ভাঙা ঘরও প্রকাশ পাইয়াছে আজ সেই কুটীরবাসীদের আনন্দপ্রকাশের অবসর উপস্থিত।... বিধাতার হাতে আপনি যন্ত্রমাত্র— আপনাকে দিয়া বিধাতা এতকালের এই অবমানিত জাতিকে জগতে প্রতিষ্ঠা দিলেন, আজি বিধাতার জয়। আপনার নিকট ঋণ প্রকাশের আজি অবসর নাই— সামাজিকতা লৌকিকতার নিয়মরক্ষার এখন সময় নাই। ভবিষ্যতের আশায় আজি প্রাণ উৎফুল্ল হইয়াছে। সেইজন্য আনন্দ করিব।"*

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক পর্যায়ের পটভূমিকায় আলোচ্য গ্রন্থের চিঠিগুলি যেমন একদিকে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে, সেরকম অন্য দিকে পত্র আদানপ্রদানকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা গ্রন্থটির অপর এক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের "চিঠিপত্র" পর্যায়ে যেসব পত্র সংকলন প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন কবির আত্মীয়-পরিজন-বন্ধু, পরবর্তী প্রজন্মের কবিসাহিত্যিক কিংবা আধ্যাত্মিক সংকট নিয়ে উপস্থিত কোনো ভক্ত। যদুনাথ কিংবা রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে কবির সম্পর্ক কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। কর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এঁদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছিলেন। বয়সে এঁদের সঙ্গে তাঁর বেশি ব্যবধান ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর এবং যদুনাথের জন্মবর্ষ যথাক্রমে ১৮৬৪ এবং ১৮৭০। শুরু থেকে উভয়েই ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির প্রাথমিক ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রামেন্দ্রসুন্দর তার ভূমিকা রচনা করেন। সম্পাদক এর উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ১৭৫) কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকা থেকে আর কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধার করা যেত। "কিছুদিন পূর্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য়" রামেন্দ্রসুন্দর লিখছেন "আমি রাসায়নিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। ক্ষিতীন্দ্রবাবু ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ ঐ প্রস্তাবের প্রতি কতকটা পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মতিক্রমে— এমন-কি, অনুরোধক্রমে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আমার রচিত কতকগুলি রসায়ন সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।" (রামেন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৮) হেমেন্দ্রনাথ তখন পরলোকগত। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাণ্ডুলিপি আকারে "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম" নামে রচনাটি প্রণয়ন করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে হেমেন্দ্রনাথ-পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ যখন পাণ্ডুলিপি প্রকাশের উদ্যোগ করেন, তখন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, প্রয়োজনে রচনাটি সংস্কারের আবেদন-সহ। এতে রামেন্দ্রসুন্দরের ওপর তাঁর আস্থা প্রকাশ পায়। রামেন্দ্রসুন্দর তখনকার রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্রের কনিষ্ঠ অধ্যাপক। এই ঘটনার এক বছর আগেই "প্রকৃতি" নামে তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে 'প্রকৃতি' নাম দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। হেমেন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে তিনি পরিবর্তন বা সম্মার্জনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রসায়নশাস্ত্রে তিনি যে

* অন্যত্র অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেন— "আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখ রক্ষা হইয়াছে।" নিন্দুকদের অপপ্রচারের জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন— রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মদিন পরিষদের আদর্শের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই পালন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের জন্যে সংবর্ধনা সমিতির সদস্যরা যে অর্থ নিজেরা এবং পরিজনদের সাহায্যে সংগ্রহ করেন অনুষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহের পরেও তা থেকে উদ্‌বৃত্ত অন্তত সাত হাজার টাকা ভবিষ্যৎ সাহিত্যকর্মের জন্য পরিষদের তহবিলে জমা পড়ে। আশুতোষ বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর-জীবনকথা' থেকে সম্পাদক এই তথ্য উদ্ধার করেছেন (পৃষ্ঠা ২১৮-১৯)।

পারিভাষিক শব্দগুলি ইতিমধ্যে প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন, ক্ষিতীন্দ্রনাথ তার প্রতি সমর্থন জানান। পরিভাষা প্রণয়নের গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যরা দীর্ঘকাল ধরেই উপলব্ধি করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সামনে রেখে কলিকাতা সারস্বত সমাজ নামে একটি সংস্থা গঠিত-ও হয়েছিল এই কাজের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পরিভাষা বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের আগ্রহ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর আর-একটি সংযোগসূত্র রচনা করে। জোড়াসাঁকোয় খামখেয়ালী সভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে ১৯ জুলাই ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে যে চিঠি দিয়েছিলেন (বর্তমান গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি) তার পিছনের ইতিহাস বর্ণনাকালে এই তথ্যগুলি স্থান পেলে সম্পাদকীয় আলোচনা আরও পূর্ণাঙ্গ হত মনে করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দরের কর্মোদ্যোগ মিলিত হয়েছিল। পরিষৎ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হবার পর নবীনচন্দ্র সেন এবং রবীন্দ্রনাথ যুগ্মভাবে সহকারী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন, সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। প্রথমে ১৩০১-১৩০৩ এবং পরে ১৩০৮ সালে ওই দায়িত্ব নির্বাহের পর ১৩১২ থেকে ১৩১৬ সাল পরিষদের ওই পদ অলংকৃত করেন রবীন্দ্রনাথ। রামেন্দ্রসুন্দর তখন পরিষৎ সম্পাদক (১৩১১-১৮)। পরিষৎ কার্যাবলী স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পরিষদকে বাঙালি সংস্কৃতির পীঠস্থল হিসাবে গ'ড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের চোখে পরিষদ ভবন ছিল 'মাতৃমন্দির'। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের গতিবেগ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পরিষদের বর্তমান ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। পরিষৎ স্থায়ী ঠিকানা লাভ করে। কিন্তু অর্থের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে যে অনর্থ উৎপাদন হয়, সাহিত্য পরিষদের ক্ষেত্রে তার দুর্লক্ষণ দেখে রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একইসঙ্গে বিচলিত না হয়ে পারেন নি। উভয়ের মতামত এই প্রসঙ্গে নিচে উদ্ধার করি :

"সাহিত্য পরিষদের যতদিন পাকা বাড়ি ও অর্থসামর্থ্য ছিল না, ততদিন কাজ করিবার লোক জুটিত না। নিষ্করুণ ভাবে অপরের অর্থ দোহন করিয়া জিনিষটা যেই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, অমনি এত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত কর্ম্মকর্ত্তা জুটিতেছেন যে, বুঝি তাঁহাদের রেষারেষিতেই পরিষৎ ভাঙিয়া পড়েন। জীবদ্দশাতেই পরিষদের সমাধি দেখিয়া যাইব কি না উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়াছে।" —রবীন্দ্রনাথকে রামেন্দ্রসুন্দর, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০

"সাহিত্য পরিষৎ ক্রমশঃ এমন সকল লোকের দ্বারা আবিষ্ট অভিভূত হয়ে পড়চে যাঁরা খুব ভাল লোক, বুদ্ধিমান লোক, কৃতী লোক এবং সামর্থ্যশালী কিন্তু তাঁরা সত্যভাবে সারস্বত নন— এতে করেই পরিষদের সাত্ত্বিকতার লাঘব হয়ে আসচে সুতরাং নিত্যতার গভীরতম মূলে আঘাত পড়চে। সাহিত্য পরিষদের পক্ষে দারিদ্র্যটা কোনোমতেই সাংঘাতিক নয় কিন্তু সরস্বতীর পদ্মবনে যখন বড় বড় লোহার চাকাওয়ালা বহু মূল্যবান দমকল বসে তখন জয়েন্টষ্টক কম্পানি খুসী হয়ে ওঠে কিন্তু দেবীর চরণরেণু প্রত্যাশী মধুকরের দল প্রমাদ গণতে থাকে।" —রামেন্দ্রসুন্দরকে রবীন্দ্রনাথ, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তখন ভাটার টান। অন্য দিকে বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের এক দশক পূর্তির পর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় শতাধিক। বিদ্যালয় এই সময় যাঁদের দানে সমৃদ্ধ হয়েছিল যদুনাথ তাঁদের অন্যতম (যদুনাথ সরকারকে লিখিত বর্তমান গ্রন্থের পত্র-সংখ্যা ২ এবং ৫— ৮মে এবং ১৬ অক্টোবর ১৯১০)। পূর্ববর্তী পর্যায়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। জাতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং সম্প্রচারের যে পরিকল্পনা তিনি নির্দেশ করেন বাস্তবে তা সম্পূর্ণ রূপায়িত করা সম্ভব না হলেও তাঁর বক্তব্য জাতির জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রথম বিস্তৃত রূপরেখা এই সময়ে প্রণীত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ এই পত্র সংকলনের শেষে পাঠকদের তথ্যসন্ধানে সাহায্য করতে একশো পৃষ্ঠার একটি "গ্রন্থপরিচয়" যুক্ত হয়েছে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৫২) যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিগুলি প্রকাশ করেন, নিজের মন্তব্য-সহ। রমাপ্রসাদ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষে (১৩৩৩-৩৪) রবীন্দ্র-রামেন্দ্র পত্রাবলী প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় পত্রপরিচিতি সহ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেগুলি পুনঃপ্রকাশ করেন। এইসবের সাহায্যে

সংকলনভুক্ত চিঠিগুলিতে যেখানে উল্লেখের ব্যাখ্যা প্রয়োজন সেখানে তা মোটামুটি বিশদভাবে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। পত্রধৃত প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের সম্পর্কের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের ছক তবু অন্যরকম হতে পারত। প্রথমত, রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি শুরুতে সন্নিবিষ্ট হলে অধিক সংগত হত। এই কারণে নয় যে, যদুনাথকে লেখা চিঠির তুলনায় সেগুলি সংখ্যায় বেশি, বা সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করে সম্বোধনে ঘনিষ্ঠতর। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার বিবর্তনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অধ্যায়ই বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা এই সময়েই আকার ধারণ করে। পরে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠানকে যদুনাথ যখন তার উপযোগিতা প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তখন তার আপত্তির কারণ প্রধানত ছিল এই যে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে বিদ্যার্থীরা স্বভাববশে চলতে চায়, কঠোর অনুশীলন ও অভিনিবেশের শৃঙ্খলায় মনোনিবেশ করে না। অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে স্বদেশী পর্ব থেকে বিভিন্ন যেসব অনুসন্ধানে তিনি উৎসাহিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেগুলির উল্লেখ করেন। বর্তমান গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে, তাঁর পত্র-বিনিময়ে এইসব অনুসন্ধানের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। রবীন্দ্র-চিন্তার পৌর্বাপর্ব নির্ণয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা চিঠিগুলি গ্রন্থের প্রারম্ভে স্থান পাওয়া উচিত ছিল।

যদুনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র-বিনিময় কি তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করার কারণেই কেবল মূল্যবান ? যেসব বিষয়ে তাঁদের চিন্তার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় এই পত্র সংকলনে তা কি এভাবে সীমিত করা যায় ? নাকি, তাঁদের চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব আরও প্রসারিত ? সঠিক অনুসন্ধান করতে তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করা দরকার। বিশ্বভারতী সূচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের মধ্যে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, স্পষ্ট ভাষায় দুজনেই তাতে নিজেদের মত ব্যক্ত করেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পিছনে কবির মনে যে চিন্তা কাজ করছিল তার বিকাশ এবং তার সঙ্গে যদুনাথের একমত না হতে পারার কারণ সম্পাদক বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাতেও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত যে সর্বত্র সমর্থিত হয়েছে এমন নয়। সম্পাদক এর দৃষ্টান্ত হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দরের "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধটি যে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের বিরোধিতা করে লেখা তা তিনি জানিয়েছেন। এরকম উদাহরণ আরও দেওয়া যেত। আলোচনার পরবর্তী অংশে আমরা তা দেখাবার চেষ্টা করব। তবে বলা দরকার, উভয়ের চিন্তায় পার্থক্য কখনোই এত ছিল না যে তা তাঁদের অভিন্ন লক্ষ্যকে আড়াল করে। বরং জাতীয় শিক্ষার মূল আদর্শ এবং তার ব্যাপক প্রচারসাধনে দুজনের সমান উৎসাহ ও উদ্যোগের পিছনে ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রায়ই আড়াল হয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ মেলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে (২ জুলাই ১৯২৭) যেখানে তিনি বলেন— "রামেন্দ্রসুন্দর মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই আমার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। অথচ তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ গুরুতর বিষয়ে আমার মতবিরোধ ছিল।" 'চিঠিপত্র' দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮)।* রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গ আলোচনায় সম্পাদক এদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেন নি। প্রসঙ্গত "গ্রন্থপরিচয়" অংশে উল্লিখিত রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাগুলির প্রথম প্রকাশের স্থান ও কাল নির্দেশ করা হলেও, গ্রন্থভুক্ত করার পর সেগুলির বর্তমান অবস্থিতি সর্বত্র জানানো হয় নি। ফলে পাঠক অসুবিধা বোধ করতে পারেন।

দু-একটি মুদ্রণ প্রমাদও চোখে পড়ল। "রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গ" আলোচনায় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়ের নাম প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে (পৃ. ১৭৫) "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলমর্ম্ম" রূপে। পরে অবশ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম্ম— যা শুদ্ধ— তা-ই ছাপা হয়েছে (পৃ. ১৮২)। অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিভ্রাট "স্বীকৃতি" অংশের একটি পঙ্‌ক্তিতে। সেখানে বলা হয়েছে, রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যেসব পত্র বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত

---

* আশুতোষ বাজপেয়ী-রচিত 'রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা'-র যে ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সম্পাদক তা উদ্ধার করেছেন। এতেও কবি একই কথা বলেছেন— "আমার সহিত তাঁহার (রামেন্দ্রসুন্দরের) সামাজিক মতের ও ব্যবহারের অনৈক্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার চিত্তকে আমার প্রতি বিমুখ করিতে পারে নাই।"

তার অনেকগুলি 'বঙ্গবাসী পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষে (১৩০০- ১৩৩৪) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।' হবে— 'বঙ্গবাণী পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষে (১৩৩০-১৩৩৪) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়'। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা (সাপ্তাহিক) প্রথম প্রকাশ করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে।

২.

বর্তমান পত্র সংকলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদুনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। উনিশ শতকে এ দেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য কেবল সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী হিসাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ইংরেজ আধিপত্য দাবি করত। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি নীতি প্রসঙ্গে মেকলে-র প্রতিবেদনে, প্রশাসন ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগরক্ষার্থে ভারতীয় সমাজে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটানোর প্রয়োজন ব্যক্ত করা হয় আচার-আচরণ এবং মানসিকতায় যারা হবে ইংরেজের অনুবর্তী। পরবর্তী কালে সমাজে এরা সেরকম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সেরকম সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশজ ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা প্রসারে সহায় হয়। ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে অতীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর স্থূল বিবরণ-সহ যে ব্যাখ্যা দেওয়া হতে থাকে তাতে ভারতীয় সমাজ পুরোহিত-তন্ত্র, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অধীন এরূপ বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করে। দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনাই ছিল সেকালে বুদ্ধিজীবীদের প্রধান সমস্যা।

আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু সমাজের দোষ-গুণ সম্পর্কে প্রথম সহানুভূতিসূচক আলোচনা করতে অগ্রসর হন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিশেষত তাঁর "সামাজিক" এবং "পারিবারিক" প্রবন্ধে। 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৫) গ্রন্থে বঙ্কিমের আগে তিনি দেশকে মাতৃরূপে কেবল সম্বোধন করেন নি, ওই গ্রন্থের শুরুতে জার্মান মনীষী গ্যয়টের একটি উক্তি উদ্ধার করে ইতিহাস রচনায় নতুনতর আদর্শের সন্ধান দেন। গ্যয়টে বলেছিলেন : "ordinary history is traditional, higher history mythical and highest mythical"। দীর্ঘকাল বিস্মৃতির পর ভূদেবের অবদান সম্পর্কে পণ্ডিতরা নতুনভাবে সচেতন হয়েছেন। শুরু থেকে শিক্ষিত মহলে বঙ্কিমের অভিঘাত ছিল আরও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার তিনি দেশপ্রেমের অন্যতম অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করেন। বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। "বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে ? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।" ("বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা") বঙ্কিমের এই সমস্ত উক্তি পরবর্তী জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদদের দায়িত্ব ও কর্মপন্থার নির্ভুল নির্দেশ দেয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমের স্বপ্ন সফল করতে এগিয়ে আসেন। পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দুবছর কবি নবীনচন্দ্র সেন এবং রবীন্দ্রনাথ যুগ্মভাবে প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন (১৩০১-০৩)। ১৩০৮ এবং পরে ১৩১২-১৬ পর্যায়ে এককভাবে এই দায়িত্ব নির্বাহের ভার পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের ওপর। অন্য দিকে ১৩১১-১৮ পর্যন্ত পরিষদ-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পরিষদ কেন্দ্র ক'রে উভয়ের পরিকল্পনা অনিবার্যভাবেই তাঁদের পত্র-বিনিময়ে অগ্রাধিকার লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পরিষদের কাজকর্মের সঙ্গে ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে যুক্ত করতে। পরিষদ-কর্তৃক আহূত একটি ছাত্রসভায় (মার্চ ১৯০৫) বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন : "বাংলাদেশে এমন কোনো জেলা নাই যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহে ইহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্য পরিষৎ সার্থকতা লাভ করিবেন।" (দ্র. 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" নামক প্রবন্ধ।) পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে কেবল কবি এই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করেন নি, মেদিনীপুর থেকে জনৈক শিক্ষার্থী পরিষদের কাজে যুক্ত হবার আগ্রহ জানালে বিশেষ উৎসাহ সহকারে তার সমর্থনে পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরকে (আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৩৮ দ্রষ্টব্য) চিঠি দেন। ১৯১৭ সালের ১০ মে রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা ব্যক্তিগত অপর একটি পত্রে (বর্তমান গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) কবি বলছেন : "পঞ্চাশের উপরেও যাহাদের বয়স তাহাদেরও যদি recruit করিতে

বসেন তাহা হইলে বুঝিব আপনাদের হারের পালা। আপনি সারথি, আপনার প্রবীণতা অশোভন নয় কিন্তু রথীগুলি নবীন দেখিয়াই বাছিতে হইবে।" পাশাপাশি শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পরিষদকে কলকাতায় সীমিত না রেখে বাংলাদেশের সর্বত্র শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে। পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন যাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে তিনি মত সংগঠন করেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা একটি চিঠিতে (২৬ জুন, ১৯০৭) প্রসঙ্গক্রমে তাঁর মন্তব্য: "মফস্বলের লোকদিগকে একবার ধরাইয়া দিলেই অতি সহজেই আপনারা সফলকাম হইবেন। দেরি করিবেন না" (পৃষ্ঠা ৪৫)। বাংলাভাষার বৈচিত্র্য বোঝাতে বিভিন্ন বাগ্‌বিধি-সংবলিত একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার পরিকল্পনাও এইজন্যে গৃহীত হয়।

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর সর্বত্র রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নি। রাজনৈতিক ইতিহাসের যতখানি তখন পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছিল তাতে শ্লাঘার বিশেষ কারণ ছিল না। রাষ্ট্র নয়, এ দেশে সমাজ-ই ইতিহাসের চালিকা শক্তি— "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্ত করেন। রাষ্ট্র পরিচালনভার যখন বিদেশীর হাতে, তখন সমাজব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমেই আমরা পরনির্ভরশীলতার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি, আত্মশক্তি উদ্‌বোধনের সেটাই পথ। স্বদেশী যুগে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বাণী। ভারতবাসী এক জাতি কিনা— এই সিদ্ধান্তের পেছনে সে-প্রশ্নের উত্তর খোঁজার তাগিদ-ও ছিল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এই দেশের এক স্থানের সঙ্গে অন্য স্থানের ভাষা ধর্ম আচার-আচরণগত প্রভেদ এতই বেশি যে, সকল ভারতবাসী মিলে অখণ্ড জাতিসত্তায় পরিণত হতে পারে, সাম্রাজ্যবাদীরা তেমন কোনো সম্ভাবনা স্বীকার করতেন না। তাঁদের যুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা না গেলেও ভারতবর্ষের ভাবগত ঐক্য যে যুগে-যুগে তার ইতিহাস প্রভাবিত করেছে, সেই সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফরাসি ঐতিহাসিক গিজো এই সিদ্ধান্ত প্রণয়নে তাঁর সহায় হন (দ্রষ্টব্য "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ)। প্রত্যেক সভ্যতার মূলে একটি কেন্দ্রীয় ভাব আছে, গিজো প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসারে—

"পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি ; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।"—"ভারতবর্ষের ইতিহাস"

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতীতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ ঘটনাপ্রবাহের উপরস্থ বিলোড়ন হিসাবে গণ্য করেন, দেশের মূল প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে তার যোগ নেই। রাজায় প্রজায় এই বিচ্ছেদ রামেন্দ্রসুন্দরের মতে এ দেশের পরাধীনতার অন্যতম কারণ— "শান্তিরক্ষা ও শত্রুর সহিত লড়াই ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত কাজই প্রজারা আপনা আপনি আপনাদের মধ্যেই গোছাইয়া লইত।" রাজশক্তির কাছ থেকে চাপ দিয়ে দাবি আদায় বা রাজার বিপদে উদ্ধারের দায়িত্ব ভারতবর্ষের প্রজা কখনো গ্রহণ করে নি। রাজশক্তির প্রতি এই উদাসীনতাবশত ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে প্রজাদের মধ্যে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নি। (দ্রষ্টব্য, "রামেন্দ্র-রচনাবলী", চতুর্থ খণ্ড, "পরাধীনতা" শীর্ষক প্রবন্ধ।) কিন্তু এ কারণে ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাষ্ট্রের প্রভাব একেবারে অনুল্লেখ্য বলে রবীন্দ্রনাথের মতো রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেন না। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে তিনি বলেন : "রাজা সর্ব্বদা উদ্যতদণ্ড হইয়া ধর্ম্মকে রক্ষা না করিলে ধর্ম্ম পলায়ন করেন, ইহা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, অতএব রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।" (পূর্বোক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৯)। সরকারকে বিবেচনায় না এনে সমাজে সকলের সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োজন নির্বাহ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বাস্তবে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, রামেন্দ্রসুন্দর তারও নির্দেশ করেন। "চীৎকার না করিয়া কাজ করা উচিত, ইহা ঠিক কথা ;" তিনি বলেন, "কিন্তু কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে কি ? এবং এখনও যাহা আছে, কালে সকল অবস্থাতেই তাহা থাকিবে কি ?" (পূর্বোক্ত, "ব্যাধি ও প্রতিকার", পৃ. ১৭৬) জাতীয় আন্দোলনের ফলে ইংরেজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যে অনিবার্য, দেশবাসীকে সে-সম্পর্কে তিনি সতর্ক করেন। কিন্তু সে আশঙ্কায় নিষ্ক্রিয় থাকার উপদেশ তিনি দেন নি। বরং অবসাদ ছিন্ন করে

জাতির মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য স্ফুরণ হওয়ায় স্বদেশী আন্দোলনে তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। এতে রবীন্দ্রনাথের অবদান পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন :

"ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন স্বয়ং বৈদ্যুতিক ব্যাটারি হাতে লইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, তখন আমরা একেবারে ভরসা হারাই নাই। উত্তেজনাবলে রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক আক্ষেপ দেখিয়া ডাক্তার যদি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া থাকেন, আমরা বরং পক্ষাঘাত নাশের লক্ষণ দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি।"

এই শেষ উক্তিতে প্রতিফলিত শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বহু নিদর্শন বর্তমান পত্র সংকলনে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর পরস্পরের কাছে রচনা প্রার্থনা করেছেন। জোড়াসাঁকোর খামখেয়ালি সভার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। জোড়াসাঁকোর পরিবার-সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত সংগীত সভায় রামেন্দ্রসুন্দর 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম অভিনয় প্রত্যক্ষ করেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪) বাংলাভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনাপাঠে অনুপ্রাণিত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর উক্ত পত্রিকার ১৩১৪ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় "ধ্বনিবিচার" নামে একটি আলোচনা প্রকাশ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর 'শব্দকথা' নামক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এই ঋণ স্বীকৃত। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ লেখাটির প্রশংসায় জানান : "আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আমি কেবল একটা আভাসমাত্র দিতে পারিতাম। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম।" অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বাংলা লৌকিক ছড়া সংগ্রহে প্রথম উৎসাহ প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। পরিষৎ পত্রিকার প্রথম বর্ষেই মুদ্রিত হয় তাঁর "ছেলেভুলানো ছড়া" প্রবন্ধটি। পরে যখন ১৩০৬ সালে 'খুকুমণির ছড়া' নামক সংকলন প্রকাশিত হয়, রামেন্দ্রসুন্দর তার পর্যালোচনা করেন। রচনার শুরুতেই এই ধরনের সংকলনের পিছনে রবীন্দ্রনাথের অবদান বর্ণনা করে তিনি বলেন সকল দেশে প্রচলিত ছড়ার মধ্যে একটি গভীর সাদৃশ্য বর্তমান। প্রকৃতির মূলে যে ঐক্য তা তাঁর মতে এর মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে। রামেন্দ্রসুন্দরের মনোভাব এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। আর্য জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে রক্ষণশীল মহলে এখনো যখন এত স্পর্শকাতরতা তখন প্রায় একশো বছর পূর্বে এবিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না :

"বয়স্ক বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড শ্বেতাঙ্গের বোঝা বহিতে একেবারেই অসমর্থ ; কিন্তু মানবশিক্ষা যখন সূতিকাগার হইতে প্রথম বাহির হইয়া সংসারের সহিত পরিচয় আরম্ভ করে, তখন সাদা চামড়া ও কাল চামড়া, উভয়েরই অভ্যন্তরে ঠিক একজাতীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি বর্তমান থাকে।... এই সৌসাদৃশ্য সর্ব্বত্র বুঝাইবার জন্য উভয় শিশুর পূর্ব্বপিতামহের কাস্পীয়-সাগর-তটে বাস কল্পনা না করিলেও চলিতে পারে ; কেন না, এই সৌসাদৃশ্য আর্য্য-ভূমির সম্পূর্ণ বাহিরে ষোল-আনা-অনার্য্য শিশুর শৈশবলীলা অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইবে। কেবল শিশু-প্রকৃতি কেন, বয়স্ক মনুষ্যের প্রকৃতিতেও যে অংশটুকু মানব-জাতি-সাধারণ, তাহারও পরিচয় এই বিভিন্ন দেশের ছড়া-সাহিত্যে সুস্পষ্ট পাওয়া যাইবে।"

এই উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গ্রহণের ফলেই রবীন্দ্রনাথের মতো রামেন্দ্রসুন্দরও এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের স্থায়ী ঐক্য কামনা করেছিলেন। আলোচনা অতিমাত্রায় দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় এখানে বিষয়টির অবতারণা সম্ভব হল না। তবে এটুকু বলতেই হবে, কী বাংলা ব্যাকরণ কী জড়বিজ্ঞান, রাষ্ট্র অথবা সমাজ— রামেন্দ্রসুন্দরের যে-কোনো রচনা পিছনেই রয়েছে সুগভীর তথ্যনিষ্ঠা। উপরোল্লিখিত অংশের কিছু পূর্বে ওই একই প্রবন্ধে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সমীকরণ তিনি এইভাবে করেন— "ইতিহাস মনুষ্য-জীবনের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে : বিজ্ঞান সমগ্র জগতের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে ; সুতরাং ইতিহাস বিজ্ঞানেরই একটা শাখা।"

নিষ্ঠাবান হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিস্ময়করভাবে ঐহিক। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর কন্যাবিয়োগ ঘটে। ঐ সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন (৭ জানুয়ারি, ১৯১৯) বর্তমান গ্রন্থে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে তিনি বলেন (পৃ. ১২৫) : "চলিত ভাষায় আমি নাস্তিক।... আপনি নিজে দারুণ দুঃখভোগ করিয়াছেন— জগৎবিধানের অত্যাচারে বিশ্ব ব্যাপিয়া যে করুণ রোদন উঠিতেছে, আপনার হৃদয়ের তার তাহাতে যেমন ঝঙ্কার দিয়াছে আর কাহারও সামর্থ্যে তাহা সম্ভব হয় নাই। নরদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার

সমবেদনায় কখনও আমার বিশ্বাস নাই— বাল্যকালে যেদিন হইতে আপনার কবিতার আস্বাদন পাইয়াছি, আপনাতে নরদেবতার আবির্ভাব দেখিয়া নির্বাকভাবে আপনাকে পূজা করিয়া আসিতেছি। অপিচ আমার ভাগ্য যে আমি আপনাকে জানি— এবং আপনিও হয়ত আমাকে জানেন। অতএব নিঃসঙ্কোচে আপনাকে এই ব্যথা জানাইলাম। আপনি একটা উষ্ণ শ্বাস ফেলিবেন— তাহাতেই আমার পক্ষে যতটা সম্ভব শান্তি লাভ ঘটিবে।"

রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে আরও একটি যোগ ছিল। সম্পাদক তা উল্লেখ না করলেও আলোচ্য গ্রন্থের সতর্ক পাঠকমাত্র লক্ষ্য করবেন, উভয়ের সকৌতুক জীবনবোধ। নিজেদের দেহে ব্যাধি প্রসঙ্গেও পরিহাস করতে তাঁরা ইতস্তত করেন নি। দুটি দৃষ্টান্ত দিই : প্রথমটি রবীন্দ্রনাথ থেকে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন উপলক্ষে একটি সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করবেন স্থির হলেও শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার দরুন যোগদান করতে পারেন নি। এই উপলক্ষে তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে একটি চিঠিতে লেখেন (২০ এপ্রিল ১৯০৫)— "বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অর্শ রোগ প্রেরণ করিয়াছেন— এবার দেশের জন্য কিছু করা হইল না, ঘরে বসিয়াই প্রচুর রক্তপাত করিতেছি।" এর কয়েক বছর পরে রামেন্দ্রসুন্দর ডায়াবিটিস রোগে আক্রান্ত হবার সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০)— "দেহযন্ত্রকে চিনির কারখানায় পরিণত করিয়াছি— প্রতি আউন্স জলে ১৫ গ্রেন চিনি মিশাইতে সমর্থ হইয়াছি।"

৩.

যদুনাথ সরকারের প্রধান পরিচয় ঐতিহাসিক হিসাবে। কিন্তু সেকালে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির্বলয়ের বাইরে কেউ ছিলেন না। যদুনাথ এর ব্যতিক্রম নন। পতিসরে দেবেন্দ্রনাথের জমিদারির পাশে করচমাড়িয়া গ্রামে তাঁর পৈতৃক ভিটা। রাজশাহী ব্রাহ্মসভার অন্যতম ট্রাস্টি হিসাবে তাঁর পিতা রাজকুমারকে নিয়োগ করেন দেবেন্দ্রনাথ। বালক বয়সে যদুনাথ একবার বাবার সঙ্গে মহর্ষির দর্শন পেতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তখন তাঁর দেখার সুযোগ হয়েছিল কিনা জানা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থের রবীন্দ্র-যদুনাথ প্রসঙ্গ শুরু করেছেন সম্পাদক এই তথ্য দিয়ে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে যদুনাথ শীর্ষস্থান অধিকার করেন। মোট নম্বর তিনি এই পরীক্ষায় যা পেয়েছিলেন (৯০%-এর অধিক) একটি রেকর্ড। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে যদুনাথের কর্মজীবনের সূচনা। এর এক বছর আগে ওই কলেজেই অধ্যাপনায় যোগ দেন রামেন্দ্রসুন্দর। রিপন কলেজ তখন কলকাতার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে পড়ানোর সময়েই The New heaven in Bengal নামে রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প প্রসঙ্গে ইংরেজিতে যদুনাথের যে নিবন্ধের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তা ছাপা হয়।

যদুনাথের রবীন্দ্রানুরাগ প্রধানত তিন ভাবে প্রকাশ লাভ করে :— প্রথম, রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। দ্বিতীয়, শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্যায়ে সক্রিয় সাহায্য ; এবং তৃতীয়, ইংরেজিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা সাহিত্যে নতুন পথের প্রবর্তক, 'প্রবাসী' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩১৪) প্রকাশিত "দুই রকম কবি : হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" নামক আলোচনায় যদুনাথ তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এর আগে "সোনার তরী" কবিতার ভাবার্থ নিয়ে বিতর্কের সময়ে ওই একই পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩১৩) রচনাটির সার্থকতা তিনি পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই দুটি রচনা সম্পূর্ণ কেন, বিস্তৃতভাবেও এখানে উল্লিখিত হয় নি। 'কথা' ও 'কাহিনী' পৃথক পৃথক গ্রন্থ হিসাবে বর্তমান শতকের সূচনায় (১৯০০- ১৯০১) প্রকাশিত হলে রামেন্দ্রসুন্দর কবিকে অভিনন্দন জানান (৩ এপ্রিল ১৯০০)— "আমাদের পুরাতন মহাকাব্যের জীবন্ত রক্তমাংসময় চরিত্রগুলিকে আরও সতেজ ও আরও জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর।" এই ধরনের কবিতার উপাদান যাতে আরও কবির দৃষ্টিগোচব হয় সেজন্য যদুনাথ তাঁকে ফর্বস-অনূদিত গুজরাট ইতিহাসের আকর গ্রন্থ 'রাসমালা' প্রেরণ করেন। ততদিনে 'গীতাঞ্জলি'-র ভাবধারা কবির হৃদয় অধিকার করেছে। যদুনাথের অনুরোধ অনুযায়ী ইতিহাস-আশ্রয়ী কবিতা রচনা তাঁর পক্ষে তাই আর সম্ভব হয় নি (যদুনাথকে পত্র, ৮ মে ১৯১০)।

যদুনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পর্কের যে দিকটি বর্তমান পত্রগুচ্ছে সবচেয়ে বেশি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা বিশ্বভারতীর আদি ইতিহাস সংক্রান্ত। বিভিন্ন জনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি বা তাঁর কাছে লেখা চিঠিগুলি অনবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া না যাওয়ায় তথ্যগত সম্পূরণের দায়িত্ব পাঠককেই বহন করতে হয়। অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য চিঠিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়া দরকার। যদুনাথকে লেখা পত্রগুলির তাৎপর্য উদ্ধারে এই পরামর্শ মনে রাখা উচিত— বিশেষত শান্তিনিকেতনে বিদ্যাবিতরণ যেখানে আলোচনার বিষয়। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা-উদ্‌বেগের সূচনা স্বদেশী আন্দোলনের বহু আগে থেকে। বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৮৯০-৯২) স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ সেকালের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতির নতুন রূপদানের কর্মযজ্ঞে গত শতকের শেষ থেকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা ইতিপূর্বেই এখানে আলোচিত হয়েছে। কাগজে কলমে বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাচিন্তা প্রয়োগের সুযোগ স্বদেশী যুগেই রবীন্দ্রনাথের সামনে প্রথম এসেছিল। জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন—" 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবেই চালিত হইতেছে তাহাকেই 'জাতীয়' বলিতে পারি" (দ্রষ্টব্য, "শিক্ষাবিধি" প্রবন্ধ)। নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য মেনে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক রক্ষা করে শিক্ষার যে আদর্শে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করেন, বাস্তবে তাকে সম্ভব করার পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়। এই সমস্ত বাধাবিঘ্নের উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা তাঁর প্রবন্ধে পেয়েছি। আলোচ্য পত্রগুচ্ছ পাঠে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের কথাই ধরা যাক। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গঠন প্রণালীর খসড়া তৈরি করার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয় তিনি তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি যেসব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তার মধ্যে "তপোবন" প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি চোখে পড়ে :

"ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটে হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা।"

এই উক্তির পিছনে যে ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা একটি চিঠিতে তার প্রকাশ। কবি বলছেন (২২ ডিসেম্বর ১৯০৫)— "ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন— যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনকে এই স্পর্দ্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলসাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্ত্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্ত্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা।"

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কতখানি বাস্তবসম্মত শুরুতে সে সম্পর্কে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। এমনকি, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্ব যিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধের বক্তব্যে উৎসাহী হয়েছিলেন, আশ্রমে শিক্ষাদানের প্রয়োজন কবি যতটা কল্পনা করছেন বাস্তবে ততটা নয় বলে মন্তব্য করেন ("আশ্রমের রূপ ও বিকাশ," তৃতীয় পরিচ্ছেদ, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', একাদশ খণ্ড, পৃ. ৭৩৭) শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতি যদুনাথের সমর্থন কিন্তু ছিল নিঃসংশয়। তাঁর এই সমর্থন জ্ঞাপনে ব্যক্তিগত ঝুঁকি ছিল কারণ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে কর্মজীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সরকারি চাকুরে— বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে নিযুক্ত। অন্য দিকে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিপ্লবীদের গোপন কেন্দ্র কিনা, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ দীর্ঘকাল সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে (৯ নভেম্বর ১৯১১) কবি তার উল্লেখ করেন— "বেশ বুঝা যাইতেছে আমাদের রাজকীয় শনির সন্দেহদৃষ্টি ইতিমধ্যে আমার প্রতি

তীক্ষ্মভাবে পড়িতেছে। চাণক্য রাজাকে বিশ্বাস করিতে বারণ করিয়াছেন। বেশ দেখা যাইতেছে রাজায় প্রজায় বিশ্বাসের সম্বন্ধটা রাখিবার আশা করাই দুরাশা।" রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী মনোভাব এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমে দেশপ্রেমিকদের উপস্থিতিতে সরকারের এরকম সন্দেহ পোষণের কারণ বোঝা যায়। যদুনাথ নিজেও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, তাঁর "ইন্ডিয়া থ্রু দ্য এজেস" (১৯২৮) ভাষণমালায় এর পরিচয় আছে। ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন তোলেন— "If it was really necessary to shadow the Nobel Laureate as an enemy of the British Raj, I cannot imagine what can be a greater condemnation of British rule in India. If it was not necessary, what are we to think of the British Governor of Bengal?"

সরকারের অসন্তোষ এবং দেশবাসীর একাংশের কুটিল সমালোচনা অগ্রাহ্য করে ১৯১০ থেকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের বেশ-কিছু প্রবন্ধ, গল্প এবং 'কথা' কাব্যগ্রন্থ থেকে দুটি কবিতা ("পূজারিনী" এবং "পণরক্ষা") 'মডার্ন রিভিউ'পত্রিকার পৃষ্ঠায় অনুবাদ করেন। ভাষান্তর মাধ্যম বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্য পৌঁছে দেবার দায়িত্ব প্রথম যাঁরা গ্রহণ করেন নিবেদিতা ও যদুনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যদুনাথের এই সমস্ত অনুবাদ সম্ভব হলে দু-একটি সংযোজন সমেত— একত্রে সংকলিত করে বিলিতি পাঠকদের চাহিদা মনে রেখে ম্যাকমিলানকে প্রকাশের অনুরোধ জানাবেন বলে স্বেচ্ছায় প্রস্তাব দেন অ্যান্ডরুজ। রবীন্দ্রনাথের এতে পূর্ণ সম্মতি ছিল। কিন্তু পত্রাকারে অ্যান্ডরুজের অনুরোধ (১২ এপ্রিল ১৯১৯) পাওয়া সত্ত্বেও সাংসারিক জটিলতার কারণে যদুনাথের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। অনুবাদগুলি এখনো পুরোনো পত্রিকার পৃষ্ঠায় গ্রন্থাকারে স্থায়িত্ব লাভের অপেক্ষায় দিন গুনছে। বর্তমান গ্রন্থ-সম্পাদক রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে যদুনাথের সম্পূর্ণ অনুবাদ তালিকা এবং সেইসঙ্গে অ্যান্ডরুজের চিঠি পুনর্মুদ্রিত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অতিরিক্ত একটি তথ্যের প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের "জয় পরাজয়" গল্পটির The Victorians in Defeat নামে অনুবাদ করেন যদুনাথ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' দ্বাদশখণ্ডে রামানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে (৯ নভেম্বর ১৯১১) আমরা কবিকে বলতে শুনি, "জয়-পরাজয়ের তর্জ্জমাটি আমার ভাল লাগিল।" তাঁর "শকুন্তলা" প্রবন্ধের যে অনুবাদ যদুনাথ করেন, তা-ও যে কবির সমান প্রশংসা লাভ করেছিল বর্তমান গ্রন্থে তার প্রমাণ রয়েছে (যদুনাথকে রবীন্দ্রনাথ, ৪ অক্টোবর ১৯১০)— "আপনি যেভাবে তর্জ্জমা করিয়াছেন ইহাই আমার কাছে ভাল বোধ হইল। বাংলায় যে সকল অলংকার শোভা পায় ইংরাজিতে তাহা কোনোমতেই উপাদেয় হয় না এইজন্য বাংলা মূলের অনেকটা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। ইংরাজিতে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত বক্তব্য বিষয়টির অনুসরণ করিলেই ভাল হয়।"

রবীন্দ্রনাথের রচনা-অনুবাদের কারণে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক মহলে যদুনাথ এই সময়ে সর্বজনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' পুস্তক রচনা করলে (১৯১২) তিনি তার ভূমিকা লিখে দেন। একই সময়ে সেখানকার বার্ষিক উৎসব সভার (৭ই পৌষের পরদিন) তাঁকে পৌরোহিত্য করতে দেখা যায়। 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে প্রভাতকুমারের সূত্রে (পৃ. ৮৫ এবং ১১১) এই তথ্য লাভ করেছি। বর্তমান গ্রন্থ-সম্পাদক অবশ্য এই বইটির সাহায্য নেন নি। বরং প্রভাতকুমার-প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে অন্যত্র তাঁর বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। যদুনাথ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯২৬-২৮) তখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষায় অধ্যাপকের পদে রুশ পণ্ডিত বগ্ডানভের নাম সুপারিশ করেন রবীন্দ্রনাথ। সম্পাদকীয় নিবেদন (পৃ. ১৬৮-৬৯) অনুযায়ী, "১৯২৯ সালের জুলাই মাসে (L. Bogdanov) বিশ্বভারতীতে পারসিয়ান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালের জুন মাসে অর্থকৃচ্ছ্রতা ও অন্যান্য কারণে তিনি কর্মচ্যুত হন। যদুনাথকে লেখা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, বিশ্বভারতীতে যোগ দেবার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরিচিত ও তাঁর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হন।" সম্পাদক তাঁর তথ্যসূত্র নির্দেশ করেন নি। কিন্তু প্রভাতকুমার তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে জানাচ্ছেন (পৃ. ২১০)— "১৯২৩ সনে পঠন-পাঠনের মধ্যে বিদ্যাভবনে নূতন ধারা শুরু হইল— বোগদানোফ্ নামে এক রুশীয় পণ্ডিতের আগমন হইতে। বোগ্দানোফ্ পারসিভাষায় সুপণ্ডিত, ফরাসী ভাষা ও ইংরেজি ভাষা খুবই ভালো জানিতেন— তাছাড়া আরবীও। রুশের বিপ্লব আরম্ভ হইলে তিনি পারস্যের পথে দেশত্যাগ করেন ও বোম্বাইএ আশ্রয় লন। ইনি কট্টর জারপন্থী

ও অতি গোঁড়া গ্রীক্ চার্চের খৃষ্টান। তিনি বিশ্বভারতীতে যোগদান করিলে ইস্‌লামিক সংস্কৃতি আলোচনার ব্যবস্থা হইল। জিয়াউদ্দীন, মুজতবা আলী প্রভৃতি হইলেন তাঁহার ছাত্র। এতদিনে বিশ্বভারতী সত্যই জাতীয় তথা বিশ্বমানবীয় প্রতিষ্ঠান হইল, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ লইতেছে।"

প্রভাতকুমারের বিবরণ প্রকৃত ঘটনার অনুসারী মনে করার কারণ যদুনাথকে লেখা এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতেই (৩০ নভেম্বর ১৯২৭) রয়েছে। বগ্‌দানফের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় নির্ণয় করতে গিয়ে কবি বলেন— "অনেকদিন আশ্রমে ছিলেন বলে এঁকে ভালো রকমই জানি— যদি সাধ্য থাকত তাহলে এঁকে আশ্রমেই রাখতুম।" প্রভাতকুমারের কথামতো ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বগ্‌দানফ্ বিশ্বভারতীতে যোগ দিলেই এ কথার অর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে সুপারিশ করার কিছুকাল আগে তিনি বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার দায়িত্ব ত্যাগ করে আফগানিস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

কঠোর জ্ঞানতপস্যার মধ্যে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের প্রতি যদুনাথ সস্নেহ দৃষ্টি রেখেছেন। তাঁর বন্ধু একালের অন্যতম মারাঠি ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই মনে হয় তাঁর প্রভাবেই পুত্র শ্যামকান্তকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যালাভ করতে পাঠান এবং সেখান থেকেই শ্যামকান্ত তিন বছর পর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অকালে তাঁর দেহাবসান ঘটে। আট বছর বাদে তাঁর চিঠিপত্র সংকলনের ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে যদুনাথের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠান— শ্যামকান্ত যখন আশ্রমে প্রবেশ করে "তখন আমাদের বিদ্যালয়ে অন্য প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিল না। কিন্তু সে যেমন সকল দিক থেকে আমাদের আশ্রমের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল এমন অন্য কোনো ছাত্র আমরা দেখি নি।" শ্যামকান্ত স্মরণিকার শুরুতেই এই বক্তব্য ও তার মারাঠি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থে যদুনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছে কবি সরদেশাই পরিবারকে মূলে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা স্থান পেয়েছে (পত্রসংখ্যা ১৮)।

বৈষয়িক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথের পরামর্শকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। আশ্রমের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যথাসময়ে তিনি তাঁর কাছে প্রেরণ করতেন। এইভাবেই আমরা পড়ি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে কলেজ স্তরে উন্নীত করার জন্য তাঁর প্রাথমিক প্রচেষ্টা— ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যা সার্থক হয় নি। সাম্প্রতিকতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফসল বাংলা ভাষায় সাধারণের উপযোগী ক'রে পুস্তকাকারে পর্যায়ক্রমে প্রকাশের পরিকল্পনা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করেন ১৯১৭ সালে। রবীন্দ্রনাথের পরম উৎসাহ যোগ হয়েছিল তাতে। স্থির হয়, পরিকল্পিত গ্রন্থমালার নাম হবে "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ"। সাধারণ সম্পাদক যদুনাথ মনোনীত হন। 'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২৪ সংখ্যায় তাঁর স্বাক্ষর-সংবলিত একটি বিজ্ঞপ্তিও এই মর্মে প্রকাশিত হয়। বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করে ক্ষেত্র অনুযায়ী তাঁদের ওপর একেকটি বিষয় সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাধারণ সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হওয়া ছাড়াও ইতিহাস, ভূগোল এবং অর্থনীতি বিষয়ে সম্পাদনার ভার যদুনাথের ওপর পড়ে। ইতিমধ্যে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে লিংকন শহরের অধিবাসীদের কাছ থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্যবহারের জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহারস্বরূপ লাভ করেন। সেটির লাভজনক পরিচালন এবং পরিকল্পিত গ্রন্থমালার বিক্রয়-ব্যবস্থার উপায়ে পরামর্শ চেয়ে যদুনাথকে কবি পত্র দেন ৬ ডিসেম্বর ১৯১৭। মুদ্রাযন্ত্রটি কেন্দ্র করে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের উৎপত্তি হলেও "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ" গ্রন্থমালা পরিকল্পনাটি মুলতবি রইল। ১৩৫০ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথেরই 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থটি দিয়ে এর প্রকাশ আরম্ভ হয়। তাঁর শেষ জীবনে একই ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে "লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা" প্রকাশিত হয় (১৩৪৬ সাল থেকে)।

স্যাডলার কমিশনের সামনে বিশ্বভারতীর বক্তব্য রাখার জন্যও রবীন্দ্রনাথ যদুনাথের পরামর্শ চাইছিলেন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ ঐকান্তিকভাবেই যদুনাথের সাহায্য কামনা করেছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অগাস্ট যদুনাথকে তিনি লেখেন— "যদি ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে আপনার আসবার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে তাহলে সময় পেলে আমি কটকে গিয়ে দেখা করতে চাই। অনেকদিন আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলুম বলে শীঘ্র সময় পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা করবার ছিল্ল।"

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বভারতীয় গভর্নিং বডিতে সদস্য

মনোনয়নের অধিকার রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়। কবি যদুনাথকে সেই মর্মে সদস্য হবার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু যদুনাথের উত্তরে তাঁকে স্তম্ভিত হতে হয়। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম মানুষ গড়ার আদর্শ ক্ষেত্র হলেও কলেজী শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সেখানে গড়ে ওঠে নি বলে যদুনাথ মনে করতেন। উচ্চতর শিক্ষার সূচনা এ দেশে কলেজ স্তর থেকে। ধরাবাঁধা পথে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তার আবশ্যকতা আছে। "বোলপুরে এরূপ চেষ্টা সম্ভব নহে।" যদুনাথ বলেন, "সেখানে যে বায়ু সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এই scientific method এবং exact knowledge-এর বিরোধী। যেমন বৈষ্ণবেরা ভক্তিবিগলিত অশ্রু হইয়া সব জিনিষ অস্পষ্ট দেখে, তেমনি বোলপুরের ছাত্রগণ শেখে ভাবের (emotion) বাষ্পের আবরণ দিয়া জগতের দিকে তাকাইতে।" ওরিয়েন্টাল আর্টের নিকৃষ্ট নিদর্শন দেখে যদুনাথের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্প-প্রকরণ যথার্থ অনুশীলনের অভাবে এগুলির মধ্যে যে ত্রুটি দেখা যায়, বিশ্বভারতীর ছাত্ররাও তার দ্বারা আক্রান্ত বলে তিনি মনে করেন। সামান্যীকরণের ঝোঁকে তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন বোধ করে না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে academic grind। সাধারণ কলেজের ছাত্রদের তার মধ্যে দিয়ে যেতে হলেও বিশ্বভারতীর ছাত্ররা তা থেকে দূরে থাকে। এইজন্যে বিশ্বভারতীর পরিচালক মণ্ডলীর সঙ্গে যদুনাথ নিজের নাম যুক্ত করতে রাজি হন নি। তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীরা এখানে যেভাবে সমবেত হচ্ছিলেন তাতে কালে এখানে স্নাতকোত্তর বা গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। "বড়দিনের সময় ৩/৪টা বক্তৃতা বা ইতিহাসের রিসার্চ স্টুডেন্টদিগকে উপদেশ দিবার জন্য বোলপুরে যাইতে পারি"— যদুনাথ এমন আশ্বাসও দেন।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র দেন (২ জুন ১৯২২) তাতে বিশ্বভারতীতে কেবল তাঁর আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে, এ কথা তিনি অস্বীকার করেন। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২১) আশ্রমকে যুক্ত করা অথবা রাজনৈতিক সংস্রব থেকে দূরত্ব বজায় রাখার প্রশ্নে আশ্রমবাসীদের মধ্যে যে বিতর্ক চলেছিল তাতে এই মন্তব্য সমর্থন করার মতো কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে যদিও বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের আদর্শই শান্তিনিকেতনের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়েছিল। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা বড়ো বেশি ভাবালু— এই অভিযোগ খণ্ডন করতে দু-ধরনের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, জগদীশচন্দ্র বসু এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর গবেষণা পদ্ধতির প্রতি কবি তাঁর উৎসাহ ও সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয়ত, শ্রীনিকেতনে কৃষি ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ভাবুকতাও যে হেলাফেলার নয় কবি তা বোঝাতে গিয়ে বলেন— "বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি মানি। আমাদের আশ্রমের বায়ুতে সেই ভাবুকতার উপাদান যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্তবিকাশের পক্ষে হানিকর?" তাঁর জীবনসংগ্রামের দৃষ্টান্ত ছাত্রদের উদবুদ্ধ করবে এমনও আশা কবি করেছিলেন—

"আমার প্রভাব কি আমার ছাত্রদিগকে কেবল ভাবাবেগের জড়তায় আচ্ছন্ন করিবে, আর যে-ক্ষেত্রে আমি অর্থাভাব এবং দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সহকারিতার অভাবের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া একটা জিনিষকে গড়িয়া তুলিলাম সেই ক্ষেত্রটি ছেলেদের চোখেই পড়িবে না, আর সেই কঠোর সাধনার কোন প্রভাবই তাহাদের উপর কাজ করিবে না?"

বিস্তারিত মতপার্থক্য প্রকাশের মুহূর্তে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ পরস্পরের প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তাতে বোঝা যায় স্বার্থশূন্য নিষ্কলুষ সত্যসন্ধানই উভয়ের একমাত্র লক্ষ্য। সমালোচনার শরনিক্ষেপ কালেও যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে বলেন— "আপনি যখন পদ্যে ধর্ম্মব্যাখ্যানে বা গল্পে বেদান্তের নির্যাস দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে। আমি তাহা পূর্ণসত্য বলিয়া মানিয়া লই। কারণ আপনার যুক্তি দ্বারা আমার মস্তিষ্কের নিকট ভাবের দ্বারা আমার হৃদয়ের নিকট তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়; আর আমি জানি যে আপনি নিজ জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তবে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন।" অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে আমরা পড়ি— "আমাদের দেশের সাবেক পণ্ডিত, এমন কি, হাল আমলের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও প্রামাণিক পদ্ধতির চর্চ্চা নাই বলিয়া আমি আক্ষেপ করি। আপনার [যদুনাথের] প্রতি চিরদিন যে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাহার প্রধান কারণ আপনি ব্যক্তিগত অন্ধসংস্কার বা মিথ্যা ভাবুকতার

মোহে আকৃষ্ট হইয়া সত্যসন্ধানের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। আমাদের দেশের অনেকে যাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য তাঁহাদের সাধনা এরূপ বিশুদ্ধ নহে। আপনার প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই এখানকার কাজে আপনার সহায়তা পাইবার জন্য এমন আগ্রহের সহিত বারম্বার ইচ্ছা করিয়াছি।" অন্যত্র একই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিধিবদ্ধ শিক্ষা প্রণালীর অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে না থাকায় যদুনাথের সাহায্য ও সহযোগিতা তিনি আরও বেশি কামনা করেছিলেন। "আমি আমার সামর্থ্যের অসম্পূর্ণতা জানি বলিয়াই আপনাদের মত জ্ঞানের সাধকদিগকে চাহিয়াছিলাম। যদি পাইতাম তবে সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের পরিচালনাপ্রণালী শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম।" যদুনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের শেষাংশের আবেদন যেমন মর্যাদাবান তেমন মর্ম্মস্পর্শী : "বিশ্বভারতীর সংকল্প মাথায় লইয়া ভারতবর্ষে যখন ফিরিলাম তখন সহায়তার জন্য সর্ব্বপ্রথমে আপনাকেই সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা প্রত্যাহরণ করিব ; তৎসত্ত্বেও ভাবুক বলিয়া আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সত্যসাধক বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করিব।"

রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক প্রকৃতি— শিক্ষাক্ষেত্রেও যা প্রতিফলিত হয়েছিল— যদুনাথের ধ্রুপদী মনোবিন্যাসের থেকে ভিন্ন সুরে বাঁধা। বিশ্বভারতী তাঁর মানস-সন্তান। সন্তানের সমালোচনা পিতার বুকে বাজে। কিন্তু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে কি কেবল যদুনাথের মনে বিরূদ্ধ ভাব উদয় হয়েছিল ? "Andrews কবিকে লিখিলেন Oxford-এর All Souls College -এর মতো গবেষণার জন্য বিশ্বভারতীকে গঠন করিতে পারিলে ভাল হয়— 'a college purely for research and where the conventional student who wishes to take degree etc. is not encouraged' (8 Dec. 1920)।" প্রভাতকুমার এই মন্তব্যের সমর্থনে বলেন— "কিন্তু ম্যাট্রিক ও গবেষণা কার্যের মধ্যে যে প্রস্তুতি পর্ব আছে সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না" ('শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৮৪)। বস্তুত ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিশ্বভারতীতে কলেজীয় শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তিত হয় নি।

কবির প্রতি শ্রদ্ধা যদুনাথের কারও চেয়ে কম ছিল না। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরের পূর্বে যে সংবর্ধনা জানানো হয় তাতে যদুনাথ "কবিকে পূর্বতন ঋষিদের স্থানাভিষিক্ত অধুনা-জীবিত একমাত্র ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করেন।" (দ্রষ্টব্য, সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সাময়িকপত্রে-রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : প্রবাসী', পৃ. ১৪৪।) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাঠি ভাষায় অধ্যাপকের পদে যদুনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে বগ্‌দানফ-এর নাম সুপারিশ (১৯২৭) কিংবা শ্যামকান্ত সরদেশাই সম্পর্কে দু-ছত্র লিখে দিতে রবীন্দ্রনাথকে যদুনাথের অনুরোধ (১৯৩৩) এই পটভূমিকায় স্বাভাবিক মনে হয়। 'ইন্ডিয়া থ্রু দ্য এজেস' গ্রন্থে বিশ্বভারতী সম্পর্কে যদুনাথের একটি মন্তব্যে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিচলিত বোধ করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একপত্রে তার প্রকাশও ঘটে। কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকায় রামানন্দ তা ছাপতে দ্বিধা করেন। কবিও ওই পত্র প্রকাশে আর ইচ্ছুক না হওয়ায় ইতিহাসে তা স্থান পায় নি। (দ্রষ্টব্য, 'চিঠিপত্র', দ্বাদশ খণ্ড)

রবীন্দ্রনাথের যে আত্মসমাহিত ভাবমূর্তি আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত এখানে আমরা তার বিশেষ পরিচয় পাই না। বরং কর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এখানে বেশি করে পরিস্ফুট— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সূচনাপর্বের সেবক, পরে বিশ্বভারতীর কাণ্ডারী। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সেসব ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কালের অনিবার্য নিয়মে তার অনেকটাই আবার বিস্মৃত। ইতিহাস-সাধক যদুনাথ সরকারের রচনাগুলি একালের পণ্ডিতরা উল্টে দেখেন রেফারেন্স্ হিসাবে ; ইতিহাস বাদে তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির (যেমন ধরা যাক শিক্ষা-বিষয়ক) খোঁজই রাখেন না প্রায় কেউ। রামেন্দ্রসুন্দরের সন্ধান-ই-বা আর ক'জন করেন ? বর্তমান গ্রন্থ যদি এঁদের চিন্তা সম্পর্কে কৌতূহল পুনরায় জাগ্রত করেন তো মস্ত লাভ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র', পঞ্চদশ খণ্ড। সম্পাদনা ভবতোষ দত্ত (বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৯৫), পৃষ্ঠা ২৪৫, ৬৫ টাকা।

নিখিলেশ গুহ

স্বরলিপি

কোন্ খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই—
তোমার আপন খেলার সাথি করো, তা হলে আর ভাবনা তো নাই ॥
শিশির-ভেজা সকালবেলা আজ কি তোমার ছুটির খেলা—
বর্ষণহীন মেঘের মেলা তার সনে মোর মনকে ভাসাই ॥
তোমার নিঠুর খেলা খেলবে যে দিন বাজবে সে দিন ভীষণ ভেরী—
ঘনাবে মেঘ, আঁধার হবে, কাঁদবে হাওয়া আকাশ ঘেরি।
সেদিন যেন তোমার ডাকে ঘরের বাঁধন আর না থাকে—
অকাতরে পরানটাকে প্রলয়দোলায় দোলাতে চাই ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীসুভায চৌধুরী

II{ পা -র্সা ণা। ধা পা -া I পা -া পা। পা পা -া I -া -া পা। ধা পমা গা I
কো ন্ খে লা যে ০ খে ল্ ব ক খ ন্ ০ ০ ভা বি ব০ সে

I মা -া ধা। পা ধা -ণা} I পা -র্সা ণা। ধা পা -া I পা -া পা। পা পা -া I
সে ই ক থা টা ই কো ন্ খে লা যে ০ খে ল ব ক খ ন

I -া -া -া। -া না না I{ না না -া। না না -া I না র্সা -া। ধা র্সা -নর্সা I
০ ০ ০ ০ তো মার্ আ প ন্ খে লা র্ সা থি ০ ক র ০

[-ণা]
I ধা -র্সা ণা। ধা পমা -গা I মা -া ধা। পা ধা -না} II
তা ০ হ লে আ০ র্ ভা ব্ না তো না ই

II পা পা -া। -া পা পা I ধা র্সা -া। র্রা র্রা -া I র্রা -া র্মর্পর্মা। র্গা র্রগর্রা -া I
শি শি র্ ০ ভে জা স কা ল্ বে লা ০ আ জ্ কি০০ তো মা০০ র্

I র্সা র্সর্রা -র্সা। ণধা পা -া I{ না -া না। না না -া I না র্সা -া। না র্সা -নর্সা I
ছু টি র্ খে০ লা ০ ব র্ ষ ণ হী ন্ মে ঘে র মে লা ০

[-ণা]
I ধা -র্সা ণা। ধা পমা -গা I মা -া ধা। পা ধা -না। II
তা র্ স নে মো০ র্ ম ন্ কে ভা সা ই

-া -া -া। -া মা মা II{ মা পা -া। -া পা পা I পা -ধা র্সণা। ধা পা -া I
০ ০ ০ ০ তো মার্ নি ঠু র্ ০ খে লা খে ল্ বে০ যে দি ন্

I মা -পা পা। -া পা ধা I পা ধণা -র্সা। ণা ধা -া I ধা র্সা -া। না র্সা -া I
বা জ্ বে ০ সে দিন্ ভী ষ০ ণ ভে রী ০ ঘ না ০ বে মে ঘ্

I র্সা নর্সা-র্গা। র্রা র্সা -া I ধা -র্সা ণা। ধা পমা -গা I ধা পমা -গা। মা ধা -া I
আঁ ধা০ ০র্ হ বে ০ কাঁ দ্ বে হাও য়া০ ০ আ কা০ শ্ ঘে রি ০

I -া -া -া। -া (মা মা) I -া -া I{ পা পা -া। -া পা পা I ধা র্সা -া। র্রা র্রা -া I
০ ০ ০ ০ তোমার্ ০ ০ সে দি ০ ন্ যে ন তো মা র্ ডা কে ০

I র্রা র্মা -া। র্মর্গা র্রা -া I র্সা -র্রা র্সা। ণধা পা -া } I{ না না -া। না না -া I
ঘ রে র্ বাঁ ধ ন্ আ র্ না থা০ কে ০ অ কা ০ ত রে ০

[-ণা]
I না র্সা -া। না র্রর্সা ণর্সা I ধা র্সা -ণা। ধা পমা -গা I মা ধা -া। পা ধা -না} II II
প রা ন্ টা কে ০ প্র ল য়্ দো লা০ য়্ দো লা ০ তে চা ই

'কোন্ খেলা যে খেলব কখন' গানটি রচিত হয় ৫ ভাদ্র ১৩২৯ [২২ অগস্ট ১৯২২] শান্তিনিকেতনে। ১৩২৯-এর ভাদ্রে শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব অভিনয়কালে গানটির প্রথম চার পঙ্‌ক্তি গীত হয়। ১৩২৯ আশ্বিনে বিজলী পত্রিকায় এবং কার্তিকে প্রবাসী পত্রিকায় গানটি মুদ্রিত হয়। গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণে (আষাঢ় ১৩৩৯)-র পরিশিষ্ট (ক)অংশে গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়।
বর্তমান স্বরলিপি C. B. S. রেকর্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রচারিত শ্রীশান্তিদেব ঘোষ-গীত ক্যাসেটের (BMX 6520) সুর অনুসরণে লিখিত ও তাঁর অনুমোদনক্রমে মুদ্রিত হল।
গীতবিতান প্রথম সংস্করণে গানের শেষ ছত্রে 'অকাতরে পরানটারে' রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় 'অকাতরে পরানটাকে'। পরবর্তীকালে সেই পাঠই অনুসৃত হয়েছে।

গানটির প্রথম চার ছত্রের স্বরলিপি প্রকাশিত হয় গীতবিতান পত্রিকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যায় ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮। স্বরলিপি প্রস্তুত করেন অনাদিকুমার দস্তিদার। তাঁরই সৌজন্যে গানটির প্রথম চার ছত্রের মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিও মুদ্রিত হয়। অনুমান করা যায় শারদোৎসব অভিনয়ে গীত গানটির চার ছত্রের সুর তাঁর জানা ছিল। এইসঙ্গে অনাদিকুমার দস্তিদার-কৃত স্বরলিপিটি মুদ্রিত হল :

কোন্ খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই—
তোমার আপন খেলার সাথি করো, তা হলে আর ভাবনা তো নাই ॥
শিশির-ভেজা সকালবেলা আজ কি তোমার ছুটির খেলা—
বর্ষণহীন মেঘের মেলা তার সনে মোর মনকে ভাসাই ॥

II পা -র্সা ণা। ধা র্পা -া I পা -া পা। পা পা -া I
কো ন্ খে লা যে ০ খে ল্ ব ক খ ০

I -া -া পা। ধা পা মগা I মা -া ধা। পা ধা -া I
০ ন্ ভা বি ব সে০ সে ই ক থা টা ই

I -া -া -া। -া না: না I না না -া। না না -া I
০ ০ ০ ০ তো মার্ আ প ন্ খে লা র্

I না র্সা -া। না র্র্সা -া I ধা -র্সা ণা। ধা পমা -গা I
সা থি ০ ক র ০ তা ০ হ লে আ০ র্

I মা -া ধা। পা ধা -ণা II
ভা ব্ না তো না ই

-া -া। -া -া -া II{ পা পা -া। পা পা -া I ধর্সা র্সা -া। র্রা র্রা -া I
০ ০ ০ ০ ০ন্ শি শি র্ ভে জা ০ স০ কা ল্ বে লা ০

I র্রা -র্পা র্মা। র্গা র্রা -া I র্সা র্সর্রা -র্সা। ণধা পা -া } I
আ জ্ কি তো মা র্ ছু টি০ র্ খে০ লা ০

I না -া না। না না -া I না র্সা -া। না র্র্সা -া I
ব র্ ষ ণ হী ন্ মে ঘে র্ মে লা ০

I ধা -র্সা ণা। ধা পা -মগা I মা -া ধা। পণা ধা -ণা II II
তা র্ স নে মো ০র্ ম ন্ কে ভা০ সা ই

—'গীতবিতান পত্রিকা'.
রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা
২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮

সম্পাদকের কথা

নবপর্যায়ে বিশ্বভারতী পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৪০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা হিসেবে। তার পর অনিবার্য কারণে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ ছিল। এই পঞ্চম সংখ্যাটি ১৪০৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যারূপে প্রকাশিত হল। পত্রিকাটি আশ্বিন মাসের মধ্যেই প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণেই দেরি হয়ে গেল। ভবিষ্যতে নিয়মিত প্রকাশ করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

শ্রাবণ মাস রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণকাল বলে সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত রচনা বেশি থাকবে এমনই ভাবা হয়েছিল। সেইজন্যেই এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখাই বেশি। ভবিষ্যতে নানা বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে। এ সংখ্যায় সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং স্থাপত্য নিয়ে লেখাদুটি দিয়ে তারই সূচনা। যদিও স্থাপত্যের আলোচনায়, শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যই মূল বিষয়। নবপর্যায়ের চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত 'সংলাপ' ও 'আলেখ্য' নামে দুটি বিভাগ ছিল। পরবর্তী কোনো সংখ্যা থেকে এই বিভাগ দুটির পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করা হবে।

অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি এবং শান্তিনিকেতন ছাতিমতলা ও মন্দিরের ছবি পাওয়া গেছে রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশ স্থান : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭

২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক

৩. মুদ্রক : শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় (ভারতীয়) ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

৪. প্রকাশক : শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় (ভারতীয়) ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

৫. সম্পাদক : শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার (ভারতীয়) ১৭১/১এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৯

৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ শান্তিনিকেতন। বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ

আমি শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

স্বাঃ শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়

JULY-OCTOBER 1996 Regd. No. R. N. 2700/57
Registered with the Registrar of Newspapers
মূল্য ২০ টাকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রক্তকরবী

পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ

সম্পাদনা : শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু

সম্প্রতি প্রকাশিত

যোগাযোগ

নাটক

সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

•

রবীন্দ্র-রচনাবলী ॥ অষ্টাবিংশ খণ্ড

•

মুকুল দে

আমার কথা

•

শিতোকু হোরির দিনপঞ্জি

অনুবাদ : কাজুও আজুমা

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম বিদেশী ছাত্রের লেখা দিনপঞ্জিতে সেকালের শান্তিনিকেতন-চিত্র। ৪০.০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭ -কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টাইপসেটিং : পেজমেকারস্, ২৩বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৬।
মুদ্রক : পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬।